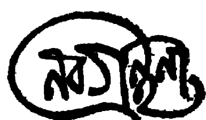
রাজভূমি রাজস্থান

রাজভূমি-রাজস্থান



৮, কৈলাস বসু স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রথম প্রকাশ : মাঘ ১৩৬৭

স্বত্ব : মণিদীপা সৈয়েদা

প্রচ্ছদ : অপরূপ উকিল

মুদ্রাকর :

শতদল গোস্বামী

নবগ্রন্থনা

৮, কৈলাস বসু স্ট্রীট

কলিকাতা-৬

এই লেখকের কয়েকখানি অন্যান্য বই

এক ফরাসী নগরে
যদি গৌর না হ'ত
মধু-বৃন্দাবনে (ব্রজপর্ব, বনপর্ব ও মহাবন পর্ব)
অমরতীর্থ-অমরনাথ
অলকাপুরী আসাম
হিমতীর্থ-হিমাচল
লীলাভূমি-লাহুল
গঙ্গা-যমুনার দেশে
ভাঙা দেউলের দেবতা
দ্বারকা ও প্রভাসে
[illegible] পারে পারে
কুম্ভমেলায়
বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা
লাদাখের পথে
বৈষ্ণোদেবীর দরবারে
কাশীখণ্ড
গঙ্গাসাগর
জয়ন্তী জুরিখ
বেলজিয়াম থেকে বাভেরিয়া
উর্বসী এথেন্স
রমণীয়া এথেন্স
রমণীয়া রোম
আসাম-মেঘালয় (অখণ্ড)
[illegible]-আসাম
তমসার তীরে তীরে
পঞ্চ প্রয়াগ
চিত্রকূট
রূপতীর্থ-খাজুরাহো
এবং
গজমতি গোয়া
হিমালয় (১ম ২য় ও ৩য় পর্ব)

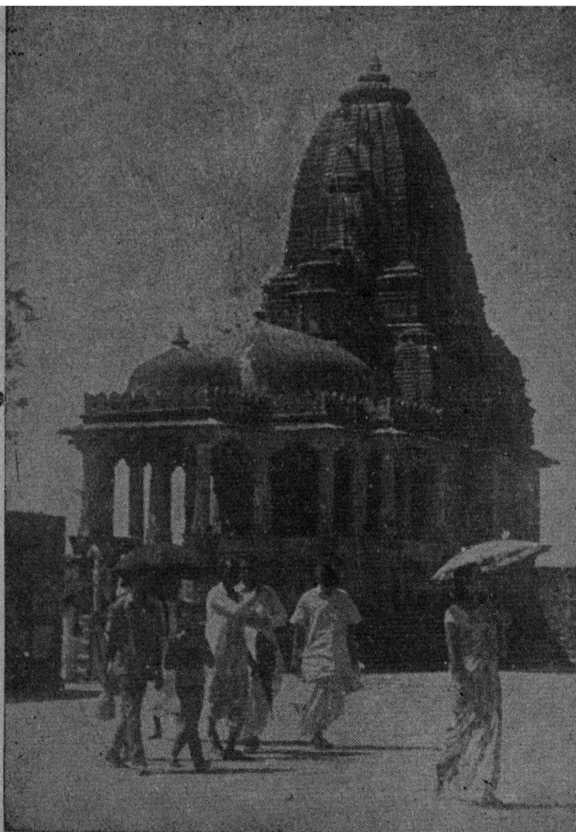
"There is not a petty state in Rajasthan that has not had its Thermopylea, and scarcely a city that has not produced its Leonidas...Rajasthan exhibits the sole example in the history of mankind..."

—Col. James Tod.

বাঁদিকে-
দরগা,
আজমীর।

নিচে-
পুষ্কর
হ্রদ।

ডাইনে—
মীরাবাঈ
মন্দির,
চিতোরগড়।



নিচে—
ব্রহ্মার
মন্দির,
পুষ্কর।

বাঁদিকে-শ্রীনাথজী মন্দিরের সামনে, নাথদ্বার।

নিচে-একলিঙ্গজী মন্দিরের সামনে।

ডাইনে—
চেটকের
সমাধি,
হলদিঘাট।

নিচে—
দিলওয়ারা
মন্দিরে একটি
শ্বেতপাথরের
সিলিং,
মাউন্ট আবু।

রাজা নেই তবু রাজার দেশ রাজস্থান। রাজস্থানীরা যে চিরকালের রাজপুত— রাজপুত্র। রাজত্ব গিয়েছে কিন্তু যায়নি তাঁদের রাজকীয় আভিজাত্য আর উদারতা, সাহস ও সহিষ্ণুতা। তাঁদের দেশপ্রেম এবং ধর্মাচরণ আজও সারা ভারতের আদর্শ হয়ে উঠতে পারে।

আমি তাঁদের দেখেছি। দেখেছি হিমালয়ের দুর্গম তীর্থপথের বাঁকে বাঁকে। দেখেছি নাসিক প্রয়াগ আর হরিদ্বারে, বারাণসী গয়া ও গঙ্গাসাগরে। ভারতের অন্য কোন রাজ্যের অধিবাসীরা এত দুঃখ-কষ্ট সয়ে তীর্থদর্শন করেন বলে জানা নেই আমার। আমি তাই তীর্থময় ভারতের বিভিন্ন মন্দিরদ্বারে দাঁড়িয়ে সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে রাজস্থানীদের দেখেছি।

কিন্তু আমি কখনও দেখি নি রাজস্থান। আমি দেখি নি আরাবল্লীর দুর্ভেদ্য গিরি-প্রাচীর। দেখি নি অম্বরের রাজপ্রাসাদ অথবা চিতোরের বিজয়স্তম্ভ, আজমীরের দরগা কিংবা দিলওয়ারার মন্দির, পুষ্করের জল ও হলদিঘাটের মাটি।

তাই তো আমার এই রেলযাত্রা—রাজভূমি-রাজস্থানের নগরে নগরে পথ-পরিক্রমা।

কিন্তু সে পরিক্রমার কাহিনী শুরু করার সময় হয় নি এখনো। সবে তো আগ্রাফোর্ট স্টেশন থেকে আমাদের গাড়ি ছাড়ল। শেষ রাতে পৌঁছব জয়পুর। আগামীকাল সকালে সেখানে থেকেই শুরু হবে আমাদের রাজস্থান পরিক্রমা। কাজেই রাজভূমি-রাজস্থানের কথা এখন থাক। তার চেয়ে এইমাত্র আগ্রাফোর্ট স্টেশনে আমার জীবন-নাট্যের যে অন্তিম দৃশ্যটি অভিনীত হয়ে গেল, সেটির কথা বলা যাক্।

বলা বাহুল্য সে দৃশ্যের নায়িকা মানসী—আমার 'মানালীর মালঞ্চে', 'লীলাভূমি-লাহুল' এবং 'মধু-বৃন্দাবনে'-র মানসী। যার সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় মানালীতে, দ্বিতীয় দেখা বৃন্দাবনে আর তৃতীয় বিদায় এই রাজভূমি রাজস্থান পরিক্রমার পূর্বক্ষণে।

কিন্তু মানসীর কথা বলতে হলে যে নিজের কিছু কথাও বলে নিতে হবে—আমার এই যাত্রার কথা। কলকাতার পর্যটন সংস্থা 'কুণ্ডু স্পেশাল' 'রিজার্ভড রেলওয়ে কোচ্'-এ এই যাত্রার আয়োজন করেছেন। চারদিন আগে হাওড়া থেকে রওনা হয়ে দিল্লী ঘুরে পরশু রাতে আমরা মথুরা এসেছি। গতকাল ও আজ আমাদের মথুরা-বৃন্দাবন এবং আগ্রা দর্শনের জন্য নির্দিষ্ট ছিল।

বহুবার দেখা জায়গা আবার দেখে কি হবে? আমি তাই ঠিক করে রেখেছিলাম, সহযাত্রীদের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে এই দুটি দিন বৃন্দাবনে মানসীর বাসায় বাস করে আসব। তাঁদের সঙ্গে গতকাল রাতে মথুরা থেকে আগ্রায় না এসে আজ বিকেলে বৃন্দাবন থেকে সোজা আগ্রাফোর্ট স্টেশনে এসে গাড়ি ধরব। মানসী কিছুদিন ধরে কেবলি বৃন্দাবন আসতে লিখছে, এই সুযোগে তাকে বাধিত করা যাবে। কিন্তু কথাটা আমি আগের থেকে জানাই নি তাকে। ভেবেছিলাম হঠাৎ হাজির হয়ে খুব একচোট চমকে দেব ওকে। আমার সে আশা পূর্ণ হয় নি। শেষ পর্যন্ত আমাকেই চমকে উঠতে হয়েছে।

গতকাল সকালে সহযাত্রীরা একখানি বাস ভাড়া করে মথুরা স্টেশন থেকে দর্শনে বের হলেন আর আমি একটি সাইকেল-রিক্সায় চেপে বৃন্দাবনের পথে রওনা হলাম। মানসীর বাসার সামনে যখন পৌঁছলাম তখন সকাল সওয়া আটটা। কড়া নাড়তেই মানসীর পালিতা কন্যা সপ্তদশী খুকু এসে দরজা খুলে দিল। আমাকে দেখেই খুশিতে উচ্ছল হয়ে ওঠে সে। চীৎকার করে বলে—মা, দেখে যাও কে এসেছেন! তোমার স্বপ্ন অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল!

আমি চমকে উঠি! কি বলছে খুকু? মানসী স্বপ্ন দেখেছে—আমি আজ আসছি! কিন্তু আমি তো তোকে এই যাত্রার কথা কিছুই জানাই নি!

ভেতরে ঢুকি। দোর দিয়ে খুকু প্রণাম করে আমাকে। মানসী ঠিকই লিখেছিল, মেয়েটা সত্যি বড় হয়ে গেছে। ভারি মিষ্টি হয়েছে চেহারাটি। লেখা-পড়ায়ও মন্দ নয়, গতবছর স্কুল ফাইন্যাল পাশ করেছে। কিন্তু মানসী তাকে কলেজে ভর্তি করায় নি। সম্ভবত কলেজের আঙ্গিনায় তার নিজের অভিশপ্ত জীবনের ভিত্তি রচিত হয়েছিল বলেই মানসী খুকুকে কলেজে যেতে দেয় নি। সে তার বিয়ের চেষ্টা করছে। একটা ভাল সম্বন্ধও নাকি এসেছে। আর তাই সে কয়েকদিন আগেও আমাকে একবার বৃন্দাবন আসতে লিখেছে। কিন্তু আমি ইচ্ছে করেই সে চিঠির উত্তর দিই নি। ভেবেছি অতর্কিতে সশরীরে হাজির হয়ে ওকে খুব একচোট চমকে দেব।

খুকুর ডাক শুনে মানসী ঘর থেকে বেরিয়ে আসে। তার পরনে লালপেড়ে গরদ। বোধহয় পুজোয় বসেছিল। প্রতিদিন ভোরে সে কেশীঘাট থেকে স্নান করে এসে রাধাগোবিন্দর পুজোয় বসে!

আমার দিকে তাকায় মানসী। একবার চোখা-চোখি হয় আমাদের। না, তার চোখে বিস্ময়ের কোনো চিহ্ন নেই।

চোখ নামিয়ে নেয় সে। শান্তস্বরে আমাকে বলে— ঘরে গিয়ে ব'সো।

এমন শীতল অভ্যর্থনার জন্য মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। তাহলেও নিঃশব্দে দাওয়া পেরিয়ে ঘরের দিকে এগিয়ে চলি।

মানসী খুকুকে বলছে—যা তো মা, চট করে একবার পাঁড়েজীর দোকান থেকে গোটাকয়েক সিঙ্গাড়া আর একগ্লাস চা নিয়ে আয়। তারপরে উনুনটা ধরিয়ে দে।

আমি ঘরে আসি—মানসীর ঘর। ব্রজ-পরিক্রমার পরে স্বাস্থ্যের কারণে যে ঘরে আমি পনেরোটি দিন কাটিয়ে গিয়েছি। ঠিক তেমনি রয়েছে এই আলো আঁধারী মাঝারি ঘরখানি। সেই খাট আলনা আয়না বাক্স আর বই। সেই ঠাকুর-আসন আর রাধাগোবিন্দজীর দণ্ডায়মান যুগলমূর্তি। আমি প্রণাম করে খাটে এসে বসি।

মানসী ঘরে আসে। ঘরখানির মতো তার চেহারাটিও একই রকম রয়ে গেছে। যে বয়সে

মেয়েদের যুবতী বলা হয়, সে বয়সটা যে ওর বেশ কয়েক বছর আগেই অতিক্রান্ত হয়েছে, তা ওকে দেখে বোঝার উপায় নেই। আমি মুগ্ধ নয়নে তাকিয়ে থাকি তার দিকে।

মানসী কিন্তু নিঃশব্দে নিজের কাজ করতে থাকে। পুজোর উপকরণ গুছিয়ে রেখে কাপড় পালটে তবে সে আমার কাছে আসে। নত হয়ে প্রণাম করে আমাকে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে দু'হাতে ওকে কাছে টেনে নিই। আনন্দ ও উত্তেজনায় চোখ বোজে মানসী। সে আমার বুকে মুখ লুকোয়।

নীরব কিছুক্ষণ। তারপরে মুখ তোলে মানসী। আস্তে আস্তে আমার বাহুবন্ধন থেকে ছাড়িয়ে নেয় নিজেকে। বলে—তুমি ব'সো, খুকু চা নিয়ে আসছে। আমি ওদিকে যাই, সব কাজ পড়ে আছে।

—তার আগে একটা কথা বলে যাও। আমি বাধা দিই ওকে।

—কি কথা?

—কাল রাতে আমাকে নিয়ে কি স্বপ্ন দেখেছো?

—কি আবার দেখব! তুমি এসেছো এখানে।

—হঠাৎ আমাকে স্বপ্ন দেখার কারণ?

মানসী মৃদু হাসে। তারপরে বলে—স্বপ্নের আবার কোন কারণ থাকে নাকি?

—থাকে এবং এক্ষেত্রে নিশ্চয়ই আছে।

একটুকাল চুপ করে থাকে মানসী। তারপরে কোমল কণ্ঠে বলে—কি জানি, হয়তো বা আছে। তবে ক'দিন ধরেই ক্রমাগত ঠাকুরকে ডেকেছি আর বলেছি, ঠাকুর তুমি ওকে একবারটি বৃন্দাবনে নিয়ে এসো। তাই হয়তো কাল শেষরাতে স্বপ্ন দেখলাম, তুমি এসে দরজায় কড়া নাড়ছো। আর আজ সকালে সত্যি সত্যি তুমি সশরীরে এসে হাজির হলে। ঠাকুর আমাকে আশাতীত করুণা করলেন। দু'হাত কপালে ঠেকিয়ে মানসী তার ঠাকুরকে প্রণাম করে।

বাধা দিই না ওকে। কি হবে ওর বিশ্বাসে আঘাত করে? তাছাড়া আমিই বা ওর বক্তব্য অবিশ্বাস করি কেমন করে? সে যে আমাকে স্বপ্ন দেখেছে, সে কথা তো খুকুও বলেছে।

অতএব প্রসঙ্গ পরিবর্তন করি—তা আমাকে একবারটি বৃন্দাবন নিয়ে আসার জন্য তোমার ঠাকুরকে অনুরোধ করার কারণ?

—আজ যে ওঁরা আসছেন?

—কারা?

—বারে! তোমাকে লিখেছিলাম না, খুকুর সেই সম্বন্ধটার জন্য তোমার একবার এখানে আসা দরকার। ছেলের বাবা তোমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চান। তিনি আজ বিকেলে আসছেন।

—আজ! আমি বিস্মিত।

—হ্যাঁ। আমি আপত্তি করেছিলাম কিন্তু তিনি শোনেন নি। তিনি বোধহয় আজই একটা 'ডিসিশন' নেবেন। আর আজ তুমি এখানে না এলে হয়তো সে সিদ্ধান্ত আমার অনুকূলে যেতো না।

ব্যাপারটা বিস্ময়কর। পাত্রের পিতা আমার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে চান। মানসীর আপত্তি অগ্রাহ্য করে তিনি আজ বিকেলে এখানে আসছেন। আর আমি আজই এখানে এসে গিয়েছি। অথচ আজ আমার এখানে থাকার কথা নয়। কারণ আমরা নির্দিষ্ট দিনের তিন দিন পরে কলকাতা থেকে রওনা হয়েছি। রেলকর্তৃপক্ষের গাফেলতির জন্য শেষমুহূর্তে যাত্রার দিন

পেছোতে হয়েছে। তাছাড়া কয়লার অভাবে নির্দিষ্ট ট্রেনটি বাতিল হয়ে যাওয়ায় দিল্লীতেও একদিন বেশি থাকতে হয়েছে। নইলে যাত্রাসূচী অনুযায়ী আজ আমার আজমীরে থাকার কথা। এই বিস্ময়কর যোগাযোগ কি কেবলই কাকতালীয়, না মানসীর দুষ্টু ঠাকুরের খেলা!

মানসী কিন্তু মোটেই বিস্মিত হয় নি। সে স্বাভাবিক স্বরে বলে—আমি জানতাম সখা, ঠাকুর আমার প্রার্থনা অপূর্ণ রাখতে পারবেন না। তুমি আজ আসবেই আমার কাছে।

এবারেও কোন প্রতিবাদ করতে পারি না।

খুকু চা ও সিঙ্গাড়া নিয়ে এল। মানসী ডিস্ এনে খাবার দেয় আমাকে। বলা বাহুল্য নিজেদের জন্য কিছুই রাখে না। কেনই বা রাখবে? ওরা যে চা এবং দোকানের খাবার খায় না। মানসী বড়লোক বাবার সুন্দরী ও শিক্ষিতা মেয়ে হতে পারে, ব্যারিস্টারের বউ হতে পারে কিন্তু সে এখন বৃন্দাবনে বৈষ্ণবীর জীবন যাপন করছে। ওর কাছে চা এবং সিঙ্গাড়া দুটোই বিষবৎ।

কথায় কথায় মানসীকে আমার আকস্মিক আগমনের কারণ বলতে হয়। মাত্র দু'টি দিন থাকব শুনে মর্মাহতা হয় সে কিন্তু বাধা দেয় না। শুধু বলে—ধরে রাখার যখন উপায় নেই, তখন বৃথা বাধা দিয়ে তোমার অমঙ্গল ডেকে আনব না। শুধু আমার দু'টি অনুরোধ তোমাকে রাখতে হবে।

—কি, প্রত্যেক জায়গা থেকে তোমাকে একখানি করে চিঠি লিখতে হবে, এই তো? বেশ লিখব। এবারে দ্বিতীয় আদেশটা শুনি?

—কাল আমি স্টেশনে গিয়ে তোমাকে গাড়িতে তুলে দিয়ে আসব।

—কিন্তু আমি যে আগ্রা থেকে গাড়ি ধরছি।

—আগ্রা তো বৃন্দাবন থেকে বহুদূরে নয় সখা!

—তাছাড়া আমার গাড়ি ছাড়বে সন্ধ্যার পরে। এই শীতের রাতে তোমাদের ফিরে আসতে হবে।

—তুমি আমার জন্য কলকাতা থেকে বৃন্দাবনে আসতে পারলে আর আমি তোমার জন্য সামান্য একটু শীত সইতে পারব না?

—না, মানে রাতে এতটা পথ আসা..

একটু হেসে মানসী আমাকে শেষ করতে দেয় না। বলে—সখা, তুমি বৃথাই ভয় পাচ্ছ। তোমার মানসীর 'কিড্ন্যাপ্ড' হবার বয়স পেরিয়ে গেছে।

বাধ্য হয়ে বলি—তোমার যখন ইচ্ছে হয়েছে, যেও। কিন্তু কেন তুমি কাল আমার সঙ্গে যেতে চাইছ?

—কেন আবার, গতবারের কথা এরই মধ্যে ভুলে গেলে? কি সাংঘাতিক অসুখ বাধিয়ে বসেছিলে! ভাগিস ঐ জানকী মেয়েটা সঙ্গে গিয়েছিল, নইলে আমার অদৃষ্টে কি ছিল একমাত্র বৃন্দাবনচন্দ্রই বলতে পারেন।

—কিন্তু এবারে তো তেমন অসুস্থ হয়ে পড়ার কোনো সম্ভাবনা নেই।

—এ আত্মপ্রত্যয়ের কারণ?

—প্রথমত, এবারে রেল বাস ও টাঙ্গায় ঘুরে বেড়াবো। দ্বিতীয়ত, কুণ্ডু স্পেশাল ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'ট্যুর কন্ডাক্টার'। তাঁদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা খুবই ভাল।

—জানি। মানসী ঘাড় নাড়ে। গম্ভীর স্বরে বলে—আমি তাঁদের গাড়িতে কেদার-বদ্রী গিয়েছি।

সহাস্যে প্রশ্ন করি—তাহলে?

—তাহলেও তোমার সঙ্গে কাল বিকেলে আমি আগ্রা যাচ্ছি।

—তুমি কি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না? আমি উত্তেজিত কণ্ঠে প্রশ্ন করি।

—না। মানসী শান্ত স্বরে উত্তর দেয়। —নিজের শরীরের দিকে নজর দেওয়া তোমার কুষ্ঠিতে লেখা নেই। কাজেই আমাকে গিয়ে নিজের চোখে দেখে-শুনে ম্যানেজারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে সব ব্যবস্থা করে দিয়ে আসতে হবে।

তাই করেছে মানসী। তবে ভরসার কথা গাড়িতে আমার জায়গা দেখে, এধং ম্যানেজার ও সহযাত্রীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিশ্চিন্ত মনে বৃন্দাবনে ফিরে গিয়েছে সে। কিন্তু এ ঘটনা আজকের। আজকের কথা পরে হবে, আগে গতকালের কথা বলে নিই।

গতকাল বিকেলে যথাসময়ে জনৈক বন্ধুকে সঙ্গে করে খুকুর ভাবী শ্বশুর মহাশয় মানসীর বাসায় পদধূলি দিয়েছিলেন। আমাকেই কথাবার্তা বলতে হয়েছে তাঁদের সঙ্গে। এবং তাঁরা তাতে খুশিই হয়েছেন। আমিও খুশি হয়েছি—ছেলেটি ভালই। অনার্স গ্রাজুয়েট। মথুরার এল. আই. সি. অফিসে স্থায়ী চাকুরে। পাত্রই বাপ-মায়ের বড় ছেলে। দু'টি ছোট ভাই-বোন স্কুলে পড়ে। বাবা রাজ্য সরকারের কর্মচারী। অবসর নিতে এখনও কয়েক বছর বাকি আছে।

তবে হ্যাঁ, তাঁর সঙ্গে কথা বলেই বুঝতে পেরেছি, কেন মানসী আমাকে নিয়ে আসার জন্য তার ঠাকুরকে এত ডাকাডাকি করেছে। খুকুকে তাঁদের অনেক আগেই পছন্দ হয়েছিল। দেনা-পাওনা নিয়েও তেমন কোন গোলমাল নেই। জিনিসপত্র মানসী ভালই দিচ্ছে। খুকু যে মানসীর পালিতা কন্যা, এটাও অজানা নয় তাঁদের। সমস্যাটা দেখা দিয়েছিল মানসীকে নিয়েই।

মানসী স্বামী পরিত্যক্তা এবং নষ্টচরিত্রা এমন একটা সংবাদ পাত্রপক্ষের কানে গিয়েছিল। পাত্রের পিতা সেই সংবাদের সত্যতা যাচাই করবার জন্যই গতকাল মানসীর বাসায় এসেছিলেন। আমার উপস্থিতি এবং মানসীর অভিনয়ে ভদ্রলোক নিঃসন্দেহ হয়ে সংবাদদাতাদের গালাগালি দিয়েছেন। পাঁজি দেখে খুকুর আশীর্বাদ ও বিয়ের তারিখ স্থির করে খুশি মনে মথুরা রওনা হয়ে গিয়েছেন।

মানসী স্বস্তির নিশ্বাস ছেড়ে বলেছে—চলো, চট করে একবার ঘুরে আসা যাক্।

—কোথায় যাবে? জিজ্ঞেস করি।

মানসী উত্তর দেয়—গোবিন্দ মন্দিরে।

সহাস্যে বলি—মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে মানত করেছিলে বুঝি?

—শুধু মেয়ের বিয়ের ব্যাপারে নয়, সেই সঙ্গে মনের মানুষকে ঘরে আনার জন্যও বটে।

খুকুকে বাসায় রেখে আমরা দুজনে বেরিয়ে পড়ি পথে—বৃন্দাবনের পথে। মানসী একখানি রিক্সা ডাকে। বলি—রিক্সার কি দরকার? কতটুকুই বা পথ, হেঁটেই তো যাওয়া যেত।

—না। রাত আটটা বাজে, ন'টায় মন্দির বন্ধ হয়ে যায়।

আর আপত্তি না করে রিক্সায় উঠে বসি। পাশে বসে মানসী আলতো ভাবে আমার কাঁধে একখানি হাত রাখে। রিক্সা এগিয়ে চলে মন-বৃন্দাবনের পথে—যে পথ একদা রাধা-কৃষ্ণের পদধ্বনিতে অনুরণিত হয়েছে।

গোবিন্দ মন্দিরের সামনে এসে রিক্সা থামে। পথ থেকে অনেকটা উঁচুতে মন্দির। আমরা সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি ওপরে। বাঁদিকে বৃন্দাদেবীর ছোট মন্দির। রাধারাণীর সখী ও

গোবিন্দজীর সবচেয়ে অনুগতা সেবিকা বৃন্দাদেবীর নাম থেকেই রাধাকৃষ্ণের এই অপার্থিব লীলাভূমির নাম হয়েছে বৃন্দাবন।

কিন্তু তাঁর মূল-বিগ্রহ নেই এখানে। রয়েছেন রাজস্থানের কামা শহরে। মধু-বৃন্দাবন পরিক্রমার সময়ে আমি সেই অপরূপা মূর্তি দর্শন করেছি।

সিঁড়ি বেয়ে প্রাচীন গোবিন্দমন্দিরের সামনে উঠে আসি—লাল পাথরের সুবিশাল মন্দির। বিশেষজ্ঞদের মতে এটি উত্তর-ভারতে হিন্দু শিল্প-সমৃদ্ধির সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। গুরুদেব রূপ ও সনাতন গোস্বামীর আদেশে এবং সম্রাট আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় মহারাজা মানসিংহ ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির নির্মাণ করান। তখন ছিল নয় চূড়াযুক্ত সাততলা মন্দির। সে আমলেই কেবল মজুরী বাবদ মানসিংহ তেরো লক্ষ টাকা শ্রমিক ও শিল্পীদের দিয়েছিলেন।

দুর্ভাগ্যের কথা মহানুভব আকবরের ধর্মান্ধ প্রপৌত্র আওরঙ্গজেব মথুরা বৃন্দাবনের অন্যান্য মন্দিরের সঙ্গে এই মন্দিরের ওপরের দিকটাও সম্পূর্ণ ধ্বংস করে ফেলেন। তবে আওরঙ্গজেবের সৈন্যরা বিগ্রহকে কলঙ্কিত করতে পারে নি। তারা বৃন্দাবনে পৌঁছবার আগেই জয়পুরের মহারাজা জয় সিংহ গোবিন্দজীকে জয়পুরে নিয়ে যান। সেই আদিবিগ্রহ এখনও জয়পুরেই রয়েছে। তারপর থেকে বৃন্দাবনের গোবিন্দমন্দির বহুকাল ধ্বংসস্তূপের মতো পড়ে ছিল। মথুরার মহানুভব ব্রিটিশ কালেক্টর এফ. এস. গ্রাউস ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সেই ভগ্ন মন্দিরের সংস্কারকার্য শুরু করেন। তৎকালীন জয়পুরের মহারাজা দ্বিতীয় রাম সিংহ সেই মহতী প্রচেষ্টায় তাঁকে উল্লেখযোগ্য অর্থ সাহায্য করেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সংস্কারকার্য শেষ হয়।

আমরা কিন্তু প্রাচীন মন্দিরে প্রবেশ করি না। কারণ গোবিন্দজী এখন এ মন্দিরে নেই। তিনি রয়েছেন নতুন মন্দিরে—প্রাচীন মন্দিরের পেছনে। চব্বিশ পরগনার বহড়ু গ্রামের জমিদার নন্দকুমার বসু ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে নির্মাণ করেছেন এই নতুন মন্দির। সেই থেকে শ্রীরাধাগোবিন্দদেব নতুন মন্দিরেই পূজিত হচ্ছেন। পুরনো মন্দিরে এখন শ্রীনিতাই-গৌর রয়েছেন আর রয়েছে যোগপীঠ। যেখানে রাধাগোবিন্দ প্রকট হয়েছিলেন, সেখানে যোগমায়ার মূর্তি রয়েছে।

প্রাচীন মন্দিরের পাশ দিয়ে পাথর বাঁধানো আঙ্গিনা পেরিয়ে আমরা দু'জনে নতুন মন্দিরে আসি। শ্রীরাধাগোবিন্দকে প্রণাম করি। মনে মনে বলি—ঠাকুর তুমি মানসীর সকল কামনা পূর্ণ কর। আর ভাবি—এতকাল তোমার প্রতিনিধি বিগ্রহ দর্শন করেই নয়ন-মন সার্থক করেছি। পরশু সকালে জয়পুরে তোমার আদি-বিগ্রহ দর্শন করে ধন্য হব। তুমি আমাকে আশীর্বাদ কর ঠাকুর, রাজস্থান ও গুজরাত পরিক্রমা পূর্ণ করে আমি যেন আবার নির্বিঘ্নে ফিরে আসতে পারি তোমার মধু-বৃন্দাবনে, আমার মানসীর কাছে।

দর্শন শেষে মানসীর সঙ্গে আবার নেমে এলাম পথে—বৃন্দাবনের পথে। আর সেখানেই দেখা হয়ে গেল সহযাত্রীদের সঙ্গে। তাঁরা তখন বৃন্দাবন দর্শন সেরে রঙ্গজী মন্দিরের সামনে অপেক্ষমান বাসে ফিরে যাচ্ছেন।

অঘটন এমনি ঘটে—'যেখানে বাঘের ভয়, সেখানেই সন্ধে হয়।' নইলে আমরা যদি মাত্র মিনিট পাঁচেক পরে গোবিন্দমন্দির থেকে পথে নামতাম, কিংবা ওঁরা আর পাঁচ মিনিট আগে ফিরতেন, তাহলেই আর দেখা হত না ওঁদের সঙ্গে। বলাবাহুল্য মানসীর মতো জনৈকা যুবতীর সঙ্গে আমাকে বৃন্দাবনের পথে পায়চারি করতে দেখবার জন্য প্রস্তুত ছিলেন না আমার সহযাত্রীরা। দু'দিনের জন্য কেন আমি তাঁদের সঙ্গ ত্যাগ করেছি, তা বুঝতে আর বাকি রইল

না ওঁদের।

কিন্তু মুখে তাঁরা কেউই কোন প্রশ্ন করলেন না। কুশল বিনিময়ের পরে আমরা তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে রিক্সায় উঠে বসি।

রিক্সা এগিয়ে চলেছে মানসীর বাসার দিকে আর আমি আপনমনে ভেবে চলেছি সহযাত্রীদের সঙ্গে এই আকস্মিক সাক্ষাতের কথা। ভাবছি—ভালই হল। জিদ যখন ধরেছে, তখন মানসী কাল বিকেলে আমাকে গাড়িতে তুলে দিতে আগ্রা যাবেই। তখন আর সহযাত্রীরা তাকে দেখে কিছু মনে করবেন না। তার আগেই তাঁরা মানসী ও আমার সম্পর্ক নিয়ে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছে যাবেন।

মানসী কিন্তু আমার সহযাত্রীদের কথা মোটেই ভাবছে না। সে ভাবছে---খুকুর ভাবী শ্বশুরের কথা। তাই সে সহসা বলে ওঠে—সখা, তুমি আমাকে আজ এক দুঃসহ অপমানের হাত থেকে রক্ষা করেছো। তোমার এ ঋণ আমি কোনদিন শোধ দিতে পারব না।

—অপমানের হাত থেকে রক্ষা করেছি কি আরও বড় অপমানের দিকে ঠেলে দিয়েছি, আমি জানি না মানসী! তবে এটা জানি, তোমার কাছে আমার যে ঋণ রয়ে গেছে, আজ তার এক শতাংশও শোধ হয় নি।

মানসী নীরব থাকে। সে কি ভাবছে বলতে পারব না। তবে আমি ভাবছি তার সেই নিষ্ঠুর বৃন্দাবনচন্দ্রের কথা, যে করুণা করে আজ আমাকে মানসীর কাছে নিয়ে এসেছে। আমার কিন্তু তাকে এখন জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করছে---হে মানুষের ভগবান! কেন তোমার এই অকারণ অবিচার? কেন আজ মানসীকে বৃন্দাবনে বৈষ্ণবীর জীবন যাপন করতে হচ্ছে? কেন আমার মতো একজন চাল-চুলোহীন ছন্নছাড়া ভবঘুরের পরিচয়ে তাঁকে পরিচিতা হতে হচ্ছে?

গোবিন্দমন্দির দর্শন করে রাত প্রায় দশটা নাগাদ আমরা দু'জনে বাসায় ফিরে এসেছি। হাত-মুখ ধোবার পরে খুকু খেতে দিয়েছে আমাকে। মানসী একবার এসে আমার পাশে বসেছে। তারপরে উঠে গিয়ে বাক্স থেকে নতুন চাদর বের করে ওর নিজের বিছানায় আমার শোবার ব্যবস্থা করে দিয়েছে। সেবারে ব্রজ-পরিক্রমার পরে মানসী যখন আমাকে পনেরো দিন তার বাসায় বন্দী করে রেখেছিল, তখনও আমাকে এই বিছানাতেই শুতে হয়েছিল।*

খাওয়া-দাওয়ার পাট চুকলে খুকু ঘর পরিষ্কার করেছে। মানসী মেঝেতে নিজেদের বিছানা পেতেছে। আমি খাটে উঠে শুয়ে পড়েছি। শুয়ে পড়েছে খুকু। মানসী ঠাকুর-আসনের সামনে গিয়ে বসেছে। কিছুক্ষণ চোখ বুজে চুপ করে রয়েছে। বোধহয় তার ঠাকুরের কাছে খুকুর সুখ ও শান্তি প্রার্থনা করেছে কিংবা আমার নির্বিঘ্ন রাজস্থান-ভ্রমণ কামনা করেছে। তারপরে ঠাকুরকে শুইয়ে বাতিটা নিবু-নিবু করে সে আমার বিছানার কাছে এসেছে। মশারী সরিয়ে খাটে উঠে আমার পায়ের কাছে বসেছে।

একখানি হাত ধরে আমি ওকে টেনে এনেছি কাছে। আমার মাথার চুলে আঙ্গুল বোলাতে শুরু করেছে সে। নীরব কিছুক্ষণ। তারপরে মানসী বলেছে.—যাচ্ছ যাও, কিন্তু সর্বদা শরীরের দিকে নজর রেখো।

—নিশ্চয়ই রাখব। আমি ওকে আশ্বস্ত করতে চাই।

* লেখকের 'মধু বৃন্দাবনে' দ্রষ্টব্য।

সে আবার বলে—সামান্য শরীর খারাপ হলেও আমাকে খবর দেবে, গতবারের মতো গোপন করবার চেষ্টা করবে না।

—আচ্ছা।

আরেকটা কথা—কাল সারাদিন তোমার বৃন্দাবনে কোথাও যাওয়া চলবে না, একেবারে বিকেলে আগ্রা রওনা হবে।

এবারে আর আপত্তি না করে পারি না। বলি—তুমি তো জানো, বৃন্দাবনে আমার কিছু পরিচিত লোক আছেন। কাল সকালে তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে একটু দেখা করব ভেবেছি।

—না। মানসী গম্ভীর স্বরে আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলে—কাল তুমি এ বাড়ির বাইরে বেরুতে পারবে না।

—কেন বল তো?

—কেন আবার। আমার ইচ্ছে।

তার ইচ্ছাকে অবহেলা করার সাধ্যি আমার নেই। তবু ঢোক গিলে, কোন মতে বলি—তা না হয় বুঝলাম, কিন্তু সেই ইচ্ছের পেছনে একটা কারণ আছে বোধ করি।

—নিশ্চয়ই।

—সেটা জানতে পারলে একটু সুবিধে হত, এই আর কি?

সহসা সে এক কাণ্ড করে বসে। খুকু জেগে রয়েছে জেনেও সে আমার বুকে মুখ রেখে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে আমাকে। তারপরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে।

কেটে যায় কিছুক্ষণ। তারপরে ওর মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলি—আমি কাল সকালে তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না মানসী! তুমি নিশ্চিন্ত থাকো।

একটু বাদে মানসী কান্না মেশানো স্বরেই বলে—যেও না সখা! তুমি কতদিন বাদে এলে আমার কাছে! কতক্ষণই বা থাকবে? তাই বলছিলাম, যতক্ষণ এখানে আছো, আমার কাছে থেকো, কোথাও যেও না।

—বেশ তাই হবে। আমি সন্ধি করি।

একটু বাদে মানসী চোখ মোছে, উঠে বসে। আমি আবহাওয়াটাকে হালকা করে তুলতে আবার বলি—এতই যখন আমাকে কাছে রাখার ইচ্ছে, তখন চলো না, আমার সঙ্গে রাজস্থান বেড়িয়ে আসবে। আমি ম্যানেজারকে বলে তোমাদের জন্য দুটো বার্থের ব্যবস্থা করব।

—সত্যি? মানসী যেন বিষাদ কাটিয়ে উঠেছে। তার স্বরে এখন দুষ্টুমির ছোঁয়া।

—হ্যাঁ। আমি উত্তর দিই।

—তোমার সহযাত্রীদের কাছে আমার কি পরিচয় দেবে?

—তোমার যা সত্যিকারের পরিচয়। বলব, আমার মানসী।

একটু চুপ করে থাকে সে, কি যেন ভাবে। তারপরে বলে—খুকুর বিয়েটা ভালোয় ভালোয় চুকে যাক্, আর তোমাকে আমি এমন একা একা ছেড়ে দেব না। একবার থেমে আবার বলে—তোমাকে কিন্তু বিয়ের অন্তত সাতদিন আগে বৃন্দাবন আসতে হবে, তা আগেই বলে রাখছি।

—তোমার দাদা-বৌদি আসছেন না?

—আসবেন বৈকি। কিন্তু আমি তো বিয়ের জন্য একটা বড় বাড়ি ভাড়া নিচ্ছি। তোমাদের

কোন অসুবিধে হবে না।

—আমি সে অসুবিধের কথা বলছি না।

—তাহলে?

একটু দ্বিধা করে শেষ পর্যন্ত বলে ফেলি কথাটা—মানে, তোমার দাদারা যখন আসছেন, তখন আমার আসা উচিত হবে কি?

—তুমি তো জানো, আমার দাদারা তেমন মানুষ নন, তাঁরা কিছুই মনে করবেন না।

—আমি তাঁদের কথা ভাবছি না, ভাবছি তোমার কথা। তুমি তাঁদের কাছে আমার কি পরিচয় দেবে?

অকম্পিত কণ্ঠে মানসী উত্তর দেয়—তোমার যা সত্যিকারের পরিচয়। বলব—আমার সখা, জন্ম-জন্মান্তরের সখা।

।। দুই।।

শেষ পর্যন্ত মানসী তার জেদ বজায় রেখেছে। খুকুকে নিয়ে আমার সঙ্গে আগ্রা ফোর্ট স্টেশনে এসেছে।

তখনও সন্ধে হতে দেরি ছিল, সহযাত্রীরা আগ্রা দেখে গাড়িতে ফিরে আসে নি। মানসীর সুবিধাই হয়েছে, ফাঁকা গাড়িতে সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব ব্যবস্থা দেখেছে। কুণ্ডু স্পেশালের কর্মচারীদের কাছে থেকে খাওয়া-দাওয়ার খোঁজ-খবর নিয়েছে। খুশিই হয়েছে সে। আমিও হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছি।

ওর ধারণা শরীরে প্রতি নজর না দেবার জন্যই সেবারে ব্রজ-পরিক্রমার শেষে গোকুল-মহাবনে পৌঁছে আমি অমন অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম। ভাগ্যিস আমার সহযাত্রিণী জানকী তাকে খবর পাঠিয়েছিল, সে যথাসময়ে বৃন্দাবন থেকে মহাবনে ছুটে যেতে পেরেছিল। তিনদিন পরে সে আমাকে নিয়ে এসেছিল বৃন্দাবনে, পনেরো দিন তার বাসায় বন্দী করে রেখেছিল। তারপরে সজল চোখে আমাকে বিদায় দিয়েছিল মথুরায়। আজও সে আমাকে বিদায় দিতেই এসেছে। আজও তার চোখ দু'টি তেমনি অশ্রুসিক্ত।

পাছে রাজস্থান পরিক্রমার পরে আবার আমি তেমন অসুস্থ হয়ে পড়ি, তাই মানসী আজ সব ব্যবস্থা সরজমিনে তদন্ত করতে এসেছে। এসেছে কুণ্ডু স্পেশালের কর্মচারী ও সহযাত্রীদের আমার ক্ষীণ স্বাস্থ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করতে।

কিছুক্ষণ পরেই সহযাত্রীরা ফিরে এলেন গাড়িতে। তাঁরা মানসীকে দেখে বিস্মিত হলেন কিন্তু কোন বিরূপ মন্তব্য প্রকাশ করলেন না। বরং মেয়েরা তার সঙ্গে আলাপ করে খুশি হলেন।

মানসীও খুশি হল। কারণ কয়েকজন সহযাত্রিণী তাকে কথা দিয়েছেন—তাঁরা আমার দিকে নজর রাখবেন। এবং আমার বিন্দুমাত্র স্বাস্থ্যাবনতি ঘটলেই তাঁরা মানসীকে টেলিগ্রাম করবেন।

অবশেষে আমার জীবন-নাট্যের সেই অন্তিম দৃশ্যটি অভিনীত হয়েছে, সজল চোখে মানসী বিদায় নিয়েছে আমার কাছ থেকে। আর দেরি করলে ওরা যে বৃন্দাবনে যাবার শেষ বাসটি ধরতে পারত না।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে আমার কয়েকজন নারী-পুরুষ সহযাত্রীর সঙ্গে গল্পে মশগুল হয়ে পড়েছিল সে। বাধ্য হয়ে সময়টা স্মরণ করিয়ে দিতে হল তাকে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে চমকে

উঠল সে। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এলো আমার সামনে। আমি কিছু বুঝে উঠতে পারার আগেই সহসা সে নত হয়ে প্রণাম করল আমাকে।

নিজেই অলক্ষ্যেই আমি একখানি হাত ওর মাথায় রেখেছি। তারপরেই খেয়াল হয়েছে খুকু এবং উপস্থিত সহযাত্রীরা সবাই তাকিয়ে রয়েছে আমাদের দিকে। তাড়াতাড়ি হাতখানি সরিয়ে নিয়েছি। মানসী উঠে দাঁড়িয়ে আঁচলে চোখ মুছেছে।

খুকুও প্রণাম করেছে আমাকে। মানসী আবার তাকিয়েছে আমার দিকে। ক্ষণেকের জন্য চোখাচোখি হয়েছে আমাদের। তারপরে মানসী আবার আঁচলে মুখ লুকিয়েছে। খুকু মানসীর একখানি হাত ধরেছে।

খুকুর হাত ধরে ধীর পদক্ষেপে মানসী এগিয়ে গিয়েছে গেটের দিকে। আমি সেখানেই দাঁড়িয়ে রয়েছি। মানসী গেট পেরিয়েছে। আমি নিঃশব্দে তাকিয়ে রয়েছি তার অপসৃয়মানা দেহটির দিকে। একটু বাদেই অগণিত মানুষের মাঝে আমার মানসী গিয়েছে হারিয়ে।

ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ফিরে এসেছি গাড়িতে—নতুন গাড়িতে। আমরা যে ট্যুরিস্ট কোচ্-এ চড়ে কলকাতা থেকে দিল্লী ও মথুরা হয়ে এখানে এসেছি, তাকে আপাতত ছেড়ে দিতে হল এখানে। কারণ সেটি 'ব্রড গেজ কোচ্', এখান থেকে আমাদের 'মিটার গেজ' লাইনে যাত্রা শুরু হল।

খালি কোচ্টি এখান থেকে চলে যাবে আমেদাবাদ। আমরা রাজস্থান ও গুজরাতের একাংশ ঘুরে আমেদাবাদে গিয়ে আবার সেই গাড়ির সওয়ার হব। সহযাত্রীরা সেই গাড়িতে করেই নাসিক ও অজন্তা হয়ে কলকাতায় ফিরে যাবেন। আমি আমেদাবাদ থেকে ফিরে আসব বৃন্দাবনে—আমার মানসীর কাছে।

কিন্তু ফেরার কথা এখন নয়, সে কথা নিহিত থাক্ ভবিষ্যতের গর্ভে। তার চেয়ে ছেড়ে আসা ট্যুরিস্ট কোচ্টির কথা বলা যাক্। ঐ কোচ্গুলি পর্যটকদের জন্য বিশেষভাবে তৈরি। দু'টি বড় কম্পার্টমেন্ট, একটি কেবিন, রান্না ও ভাঁড়ার ঘর এবং সাতটি বাথরুম নিয়ে ট্যুরিস্ট কোচ্ এক কামরা থেকে অপর কামরায় যাবার জন্য সরু প্যাসেজ। কামরাগুলির চারিদিকে শুধু একসারি বাঙ্ক ও বেঞ্চ, ভেতরটা ফাঁকা। কুণ্ডু স্পেশাল নিজেদের স্টিল বেঞ্চ্ দিয়ে সুবিধা মতো যাত্রীদের জায়গায় ব্যবস্থা করে দেন।

কিন্তু মিটার গেজ-এর এই বগিটি একটি সাধারণ টু-টায়ার্স কোচ্। শুধু প্রতিটি খোপে স্টিল বেঞ্চি বসিয়ে একটি করে বাড়তি লোয়ার বার্থ তৈরি করা হয়েছে। আলাদা জায়গা নেই বলে একটি খোপকেই রান্না ও ভাঁড়ার ঘর করা হয়েছে।

অন্য কোন অসুবিধে হবে বলে মনে হচ্ছে না, শুধু মুশকিলে পড়তে হবে বাথরুম নিয়ে, এ গাড়িতে মাত্র তিনটি বাথরুম। যাত্রী ও কুণ্ডু স্পেশালের কর্মিবৃন্দ মিলে আমরা প্রায় পঞ্চাশজন—সকালে খুবই অসুবিধে হবে। কি আর করব, শেষরাতে উঠে প্রাতঃকৃত্য সেরে রাখতে হবে। ভারতীয় রেলের কৃপায় বহুকাল আগেই আমার এ অভ্যেসটি রপ্ত হয়ে গিয়েছে।

এ গাড়িতেও দাদা এবং আমাকে একই খোপে জায়গা দেওয়া হয়েছে। আমার লোয়ার এবং দাদার আপার বার্থ। আমার সামনে কুণ্ডু স্পেশালের স্টিল বেঞ্চ্ এবং রেল কোম্পানির লোয়ার বার্থটি পেয়েছেন মিস্টার ও মিসেস ভৌমিক। ওপাশের আপার বার্থটি পেয়েছেন সাহাবাবু।

দাদা মানে সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা শ্রীভূপেশচন্দ্র দত্ত। বরিশালের মানুষ, এখন বাঘা যতীন কলোনির বাসিন্দা। দেশপ্রিয় পার্কের কাছে একটি পেট্রোল পাম্পের মালিক। তাঁর বড় ছেলে হিরণ্ময় আমার সহপাঠী। এখন বিলেত ফেরত ইঞ্জিনিয়ার, বড় চাকরি করে। অন্যান্য ছেলেরাও সকলেই কৃতী। মেয়েদের ভাল বিয়ে হয়েছে। বছর দু'য়েক হল হিরণ্ময়ের মা দেহরক্ষা করেছেন। আর তার পর থেকেই তীর্থদর্শনের একটা প্রবল বাসনা দেখা দিয়েছে দাদার মনে। ঘুরে বেড়াবার নেশা যেন বসেছে তাঁকে। গতবছর গিয়েছিলেন কেদার-বদ্রী ও গঙ্গোত্রী-যমুনোত্রী। এই যাত্রা থেকে কলকাতায় ফিরেই কয়েকদিনের মধ্যে পাড়ি জমাবেন নেপালে, তারপরে অরমন্থ দর্শনে।

দাদা সারাজীবন ব্যবসা করেছেন কিন্তু সেই সঙ্গে পড়াশুনাও করেছেন। তিনি ধার্মিক মানুষ। সবচেয়ে বড় কথা দাদা সব বয়সের এবং সব রকমের মানুষের সঙ্গে সমান ভাবে মেলামেশা করতে পারেন। এমন চালাক-চতুর হাসি-খুশি মজার মানুষকে সঙ্গী পাওয়া ভাগ্যের কথা।

মিস্টার ও মিসেস ভৌমিক কলকাতার বনেদী পরিবারের মানুষ। চেহারা, চাল-চলন ও কথাবার্তা থেকে সে বনেদীয়ানা সুস্পষ্ট। কিন্তু তাঁরা বড় শান্ত, বড়ই অমায়িক। আভিজাত্যের উগ্রতা তাঁদের ব্যবহারে একেবারেই অনুপস্থিত।

মিস্টারের বয়স ষাটের ঘরে পৌঁচেছে কি না সন্দেহ কিন্তু ডাইবেটিজের আক্রমণে ভদ্রলোকের শরীরে জরা নেমে এসেছে। তার ওপরে ভারী দেহ, চলা-ফেরা করতে একটু বেশি সময় লাগে।

মিসেসও রোগা নন, বরং তাঁকে মিস্টারের চেয়ে মোটা বলেই মনে হয়। তবে তিনি স্বামীর মতো অচল নন, বেশ চটপটে। সর্বদাই স্বামীকে সামলে রাখেন।

ভগবান ভৌমিকবাবুকে অগাধ ঐশ্বর্য দিয়েছেন, কিন্তু সন্তান দেন নি। আর তাই হয়তো তিনি এমন তীর্থ-পাগল। গতকাল মথুরা-বৃন্দাবনে বড় বেশি ঘোরাঘুরি করেছেন। ফলে আজ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। গায়ে হাত দিয়ে বুঝতে পারছি জ্বর নেহাত কম নয়।

মুশকিলে পড়া গেল। হিমালয়ের যাত্রা ছাড়া কুণ্ডু স্পেশালের গাড়িতে সাধারণত ডাক্তার থাকেন না। কিছু ওষুধপত্র অবশ্য রয়েছে ম্যানেজারের কাছে। কিন্তু মিসেস বলেছেন, "উনি ডাইবেটিজের রোগী, ভাল ডাক্তার না দেখিয়ে ওঁকে ওষুধ খাওয়ানো উচিত হবে না।"

অথচ জ্বরের ঘোরে ভদ্রলোক ক্রমেই কাহিল হয়ে পড়ছেন। সারারাত বিনা ওষুধে রাখা উচিত হবে না। তাহলেও উপায় নেই। আজ তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা সম্ভব নয়। যা করার কাল জয়পুরে গিয়েই করতে হবে। জয়পুর বড় জায়গা। সেখানে ভালো ডাক্তার পেতে অসুবিধে হবে না কোন।

"মামুগো, ও মামু!" পাশের খোপ থেকে শ্রীর কণ্ঠস্বর ভেসে আসে।

তাড়াতাড়ি সাড়া দিই, "কি বলছ মা?"

"একবার এদিকে এসো না গো!"

আমি কিছু বলতে পারার আগেই দাদা বলেন, "শিগ্‌গির যাও, দু'দিন কেবল তোমার কথা বলেছে।"

"আসছি মা!" চটিটা পায়ে দিয়ে উঠে আসি পাশের খোপে।

পূর্ণিমা একটু সরে বসে বলে, "আসুন, ঘোষদা!"

মায়ের পাশে বসতেই মেয়ে আমার কোলের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। দু'হাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে।

আমি ওর ঝাঁকড়া চুলের ভেতর আঙ্গুল চালাতে চালাতে বলি, "কিরে মথুরা-বৃন্দাবন আর আগ্রা কেমন লাগল?"

হঠাৎ স্থির হয়ে গেল শ্রী। আমার কোল থেকে নেমে মায়ের পাশে চলে যায় সে। তারপর গম্ভীর স্বরে উত্তর দেয়, "খুব খারাপ।"

"সেকি!" আমি সবিস্ময়ে বলে উঠি, "এত ভাল জায়গা!"

"আমার ভাল লাগে নি।" সে তেমনি গম্ভীর স্বরে আবার বলে।

"কেন বল দেখি?"

"তুমি সঙ্গে ছিলে না যে।"

না, এখনও আমার অবাক হবার পালা শেষ হয় নি। আমি ওকে একখানি হাত দিয়ে কাছে টেনে নিতে চাইতেই, সে ছিটকে দুরে সরে যায়। ঠোঁট ফুলিয়ে বলে ওঠে, "তুমি ছোঁবে না আমাকে, আমি আর কথা বলব না তোমার সঙ্গে।"

অভিমানিনী মেয়ে মায়ের কোলে লুকিয়ে কান্নার ফুলে ফুলে উঠতে থাকে।

আমি অপ্রস্তুত। অপ্রস্তুত ওর মা, দিদিমা, মেসো ও মাসিরা। অপ্রস্তুত বিউটি।

আমি অসহায় ভাবে ওর মায়ের দিকে তাকাই। পূর্ণিমা ইসারায় আমাকে একটু চুপ করে থাকতে বলে। আমি নীরব থাকি। নীরবে ভাবতে থাকি আমার এই সহযাত্রী পরিবারটির কথা।

এক পরিবারভুক্ত না হলেও ওরা সাতজনই নিকট আত্মীয়। দলনেতা ও একমাত্র পুরুষ সদস্য গোরাচাঁদ সাহা চার্টার্ড ব্যাঙ্কের কর্মচারী। তিনি সস্ত্রীক তাঁর ষোড়শী ভাইঝি বিউটিকে নিয়ে রাজস্থান দর্শনে বেরিয়েছেন। মিসেস সাহার মা এবং দুই বোন, পূর্ণিমা ও শঙ্করী তাঁদের সঙ্গী হয়েছে। শঙ্করী সবে কলেজের পাট শেষ করেছে, এখনও বিয়ে হয় নি। বেড়াতে বড়ই ভালোবাসে। পূর্ণিমাও ভ্রমণবিলাসিনী কারণ ভ্রমণের নেশা রয়েছে তার রক্তে। ওদের স্বর্গীয় পিতৃদেব যে অতিশয় ভ্রমণপ্রিয় ছিলেন।

পূর্ণিমার স্বামী অরুণ নায়ক একটি বৃহৎ ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে অন্যতম পরিচালক। স্ত্রী এবং একমাত্র সন্তান শ্রীকে রেলে তুলে দিয়ে অরুণবাবুর বাড়ি ফিরে যাবার কারণ ভ্রমণে অরুচি নয়, স্বাধীন ব্যবসা করার মতো পরাধীনতা যে আর নেই আর নেই এ জগতে।

কিন্তু অরুণবাবুর কথা নয়, তার মেয়ের কথাই হোক্। সাত বছরের টুকটুকে মেয়ে শ্রী। বয়সের তুলনায় একটু বেশি লম্বা ও রোগা, তাহলেও দেখতে ভারি মিষ্টি। টানা টানা দু'টি চোখ আর উঁচু নাক। মাথায় এক ঝাঁক কালো চুল আর মুখে একরাশ মমতা।

কান্নার শব্দটা আর পাওয়া যাচ্ছে না দেখেই বোধহয় বোধহয় পূর্ণিমা আমার দিকে তাকায়। ইসারায় সে আমাকে কাছে এগোতে বলে। এ অবস্থায় মেয়ের মান ভাঙাবার একটাই উপায় আছে।

দু'হাতে তাকে কোলে তুলে নিই, অনুতপ্ত কণ্ঠে বলি, "আর কখনও আমি তোমাকে ছেড়ে কোথাও যাবো না মা!"

"সত্যি বলছ?" মেয়ে মুখ তোলে।

"হ্যাঁ।"

"আমাকে ছুঁয়ে তিন সত্যি কারো।"

"আমি তো তোমাকে ছুঁয়েই আছি—এই এক সত্যি, দু সত্যি, তিন সত্যি—আর তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যাবো না।"

"ঠিক আছে।" মেয়ে উঠে বসে দু'হাতে চোখ মোছে। তারপরে গম্ভীর স্বরে বলে, "এবারে তাহলে একটা গল্প বলো।"

ওর মা দিদি দিদিমা মেসো ও মাসিমা সমস্বরে হেসে ওঠে।

শ্রী একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। পাছে সে আবার অভিমান করে বসে তাই তাড়াতাড়ি বলি, "হ্যাঁ, গল্প বলব বৈকি! তবে এখন তো গল্প বলা যাবে না।"

"কেন?"

"গাড়ি না ছাড়লে কি গল্প জমে। গাড়ি চলবে ঝিক্‌ঝিক্ করে, তেপান্তরের মাঠের ভেতর দিয়ে, তবেই তো রাজপুত্র আর তার তিন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হবে।"

"তারা টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে আসবে, তাই না মামু?"

"হ্যাঁ।"

"তারপরে রাজপুত্রের বন্ধুদের রাক্ষসী খেয়ে ফেলবে আর রাজপুত্র হাসন চাঁপা নাটন কাটী ও বারো হাত কাঁকুড়ের তেরো হাত বিচির খোঁজে বেরিয়ে পড়বে?"

"হ্যাঁ। কিন্তু সেকথা এখন নয়।"

"এখন তাহলে আমরা কি করব মামু?"

"এখন আমরা বেড়াতে বেরুবো।"

"কোথায়?"

"গাড়িতে। ঘুরে ঘুরে সবার খোঁজ নিতে হবে না? নতুন গাড়িতে কে কেমন জায়গা পেলেন, কার কি সুবিধে-অসুবিধে হচ্ছে?"

শ্রী বিজ্ঞের মতো মাথা নেড়ে আমার প্রস্তাব অনুমোদন করে।

পূর্ণিমা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। বলে, "ঘোষদা, ধন্যি আপনি! এত সহজে যে আমার মেয়ের মান ভাঙানো যায়, তা আমারও জানা ছিল না।"

"সত্যি।" শঙ্করী মন্তব্য করে।

আমি কিন্তু মা ও মাসির মন্তব্যকে কোন গুরুত্বে না দিয়ে মেয়েকে বলি, "চলো তাহলে বেরিয়ে পড়া যাক্।"

"চলো।" শ্রী বেঞ্চি থেকে নিচে নামে।

আমি উঠে দাঁড়াই। মেয়ের হাত ধরে বলি, "আমরা কি দুজনেই যাবো, না বিউদিদিও আমাদের সঙ্গে যাবে?"

সঙ্গে সঙ্গে শ্রী বিউটিকে জিজ্ঞেস করে, "তুমি আমাদের সঙ্গে যাবে বিউদিদি?"

"হু!" বিউটি মাথা নাড়ে।

"তাহলে চলো।"

পায়ে চটি গলিয়ে বিউটি আমাদের সঙ্গী হয়। ছোটখাটো শ্যামবর্ণা সুশ্রী তরুণী বিউটি। গতবছর হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে কলেজে পড়ছে। মানকুণ্ডু থাকে। তার বাবা অর্থাৎ

গোরাচাঁদবাবুর ছোটভাই শুকদেববাবু একজন গুণী লোক। ব্যবহারিক জীবনে একটি মার্কেন্টাইল অফিসের কর্মচারী কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি একজন জাতশিল্পী। বিউটির মা মানকুণ্ডুর বিখ্যাত খাঁ পরিবারের মেয়ে। বিউটিরা দু' ভাই এক বোন। বিউটি মেজো। ওর দাদাও কলেজে পড়ে, ছোট ভাইটি স্কুলের ছাত্র।

গোরাচাঁদবাবুর কোন ছেলে-মেয়ে নেই। বিউটি তাঁর কাছেই বড় হয়েছে। তাই সে জেঠীকে মা ডাকে আর জ্যাঠাকে বলে ছেলে। গোরাচাঁদবাবুও বিউটিকে মা বলেই ডাকেন।

বিউটিও আমাকে মামু বলে। তবে এই মামু ডাকটির উৎস কিন্তু শ্রী। ওরা দলে সাতজন, তাই কলকাতা থেকে রওনা হবার সময় ট্যুরিস্ট কোচের কেবিনটি পেয়েছিল।

প্রথম রাতে ওরা বড় একটা কেবিনের বাইরে বের হয় নি, নিজেরাই নিজেদের নিয়ে ব্যস্ত ছিল।

পরদিন সকালে ব্রেক-ফাস্টের পরে প্রথম দেখতে পেলাম শ্রী এবং বিউটিকে। ওরা হাত ধরাধরি করে বেরিয়ে এলো কেবিন থেকে। প্যাসেজে দাঁড়িয়ে চলমান গাড়ি থেকে বিহারের বনভূমির সৌন্দর্য দর্শন করতে থাকল।

আমার বার্থটি ছিল বড় কামরার একপ্রান্তে, কেবিনের পাশে, দরজার ধারে। আমি নীরবে ওদের দু'জনকে দেখছিলাম, বড় ভাল লাগছিল। আমার কামরায় সকলেই বয়সে আমার চেয়ে বড়। তাঁদের প্রায় প্রত্যেককেই প্রবীণ বলা যেতে পারে।

এমনটি যে হবে, তা আমি আগেই অনুমান করেছিলাম। কারণ কুণ্ডু স্পেশাল প্রধানত অপটু ও অশক্ত যাত্রীদের জন্য। যাঁদের তীর্থদর্শন কিংবা দেশভ্রমণের বাসনা আছে অথচ অভিজ্ঞতা কিংবা দৈহিক শক্তি নেই, তাঁরা নিশ্চিন্ত মনে হওড়ায় এসে এঁদের গাড়িতে চেপে বসেন। নির্ঝঞ্ঝাটে ভ্রমণ সাঙ্গ করে হাওড়ায় ফিরে যান।

স্বভাবতই সাত ও ষোল বছরের দু'টি মেয়েকে সহযাত্রী পাবার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। ওদের দেখে তাই আমার বড় ভাল লেগেছিল। উঠে বসেছিলাম নিজের বার্থে, বসে বসে দেখছিলাম দু'জনকে। সহসা শ্রী তাকায় আমার দিকে। আমি ইসারায় কাছে ডাকি তাকে। সে বিউটির দিকে তাকায়। বিউটি বোধহয় তাকে আমার কাছে আসার অনুমতি দেয়। তবে সে নিজে সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে।

শ্রী গুটিগুটি পা ফেলে এগিয়ে আসে আমার কাছে। আমি তার একখানি হাত ধরে জিজ্ঞেস করি—তোমার নাম কি?

সে সপ্রতিভ স্বরে উত্তর দেয়—বাড়ির নাম শ্রী আর স্কুলের নাম পাপড়ি।

—ও তুমি বুঝি স্কুলে পড়?

—হ্যাঁ, ক্লাস টু।

—তাই বল। তুমি খুব ভাল মেয়ে। তা তুমি তো আমার নাম জিজ্ঞেস করলে না?

গম্ভীর স্বরে মন্তব্য করে—তুমি বড্ড বোকা।

—কেন?

—তোমার নাম আবার জিজ্ঞেস করতে হয় নাকি? তুমি তো মামু।

আমি সত্যি বোকা। নিজের বোকামির খেসারত দিতে তাড়াতাড়ি শ্রীকে কোলে তুলে নিই।

সেই থেকে শ্রী আমার ভাগনী। এবং ভাগনীর সূত্রে সেদিনই তার দিদি দিদিমা মা মেসো ও মাসিদের সঙ্গে আলাপ হয়েছে আমার।

এই গাড়িতে শ্রীরা রয়েছে এপাশের শেষ খোপটিতে। তারপরের খোপটিতে আমরা। আমাদের পরেরটিতে মা সত্যেনদা সুরমাদি ও সস্ত্রীক সরকারদা। তারপরে অমিয়বাবু উমাদি এবং সস্ত্রীক উকিলবাবু।

চারটি খোপের পরে দরজা ও বাথরুম, তারপরে প্যাসেজ পেরিয়ে আবার চারটি খোপ। তার প্রথমটিতে রয়েছেন ঠাকুরমারা। তাঁদের পরের খোপে মশলা মার্চেন্ট শ্রীসামন্ত। তিনি স্ত্রী, দু'টি ছেলে এ একজন কর্মচারীকে নিয়ে যাত্রায় এসেছেন। ছেলে দু'টির বয়স দশ ও চোদ্দ বছর। পরেরটিতে নিউআলিপুর, কালিঘাট ও কেষ্টনগরের যাত্রীরা। আর শেষের খোপটিতে স্বয়ং ম্যানেজার পাঁচুবাবু। সেটিতেই রান্নার ব্যবস্থা করা হয়েছে।

সত্যেনদার মাকে আমিও মা বলে ডাকছি। এমন মাতৃমমতা মাখানো মুখ যে বড় একটা দেখা যায় না। তিনিও পুত্রস্নেহে আমাকে তাঁর অফুরন্ত বাৎসল্য বিতরণ করে চলেছেন।

সত্যেনদা মানে সত্যেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বয়সে প্রৌঢ়। সহজ সরল ও সাদাসিধে মানুষ। বরানগরে বাড়ি ও ব্যবসা। যৌথ পরিবার। বড় মেয়ে কলেজে পড়ে। বড় ছেলেটি এবারে হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিত। চমৎকার স্বাস্থ্য ছিল তার, খুব ভাল সাঁতার জানত। অথচ নিয়তির কি নির্মম পরিহাস? সেই সাঁতার কাটতে গিয়েই দুর্ঘটনাটা ঘটল। ভগবান তাজা ছেলেটাকে অসময়ে তাঁর কাছে টেনে নিলেন। কেন, তা আজও বুঝে উঠতে পারেন না সত্যেনদা। তাহলেও ভক্ত সত্যেনদা তাঁর ভগবানের এই অবিচারকে শান্তচিত্তে গ্রহণ করেছেন। মাকে নিয়ে তীর্থদর্শনে বেরিয়েছেন।

সরকারদা মানে মোহিতকুমার সরকার চক্রবেড়িয়া লেনের বাসিন্দা। ব্যবহারিক জীবনে একটি প্রেসের মালিক। বয়সে আমার চেয়ে সামান্য কিছু বড় হতে পারেন কিন্তু স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ। ভদ্রলোক বন্ধুবৎসল ও সদালাপী, ভক্ত-বৈষ্ণব ও কাঠিয়াবাবার শিষ্য। নিয়মিত সন্ধ্যা আহ্নিক ও তিলকসেবা করেন। স্ত্রী শ্যামলীবৌদিও সুশ্রী স্বাস্থ্যবতী এবং পতিপরায়ণা।

সত্যেনদার মা ও শ্যামলীবৌদির পাশেই জায়গা পেয়েছেন সুরমাদি—সুরমা কুণ্ডু। সুরমাদি নিঃসন্তান। জামাইবাবুর অকালমৃত্যুর পর থেকেই তিনি জাস্টিস চন্দ্রমাধব রোডে ভাইদের সংসারে আছেন। বছর বারো বয়সের ভাইপোটি তাঁর বর্তমান জীবনের প্রধান অবলম্বন। তীর্থদর্শন ছাড়া তিনি তাকে ফেলে কোথাও যান না। তীর্থ দর্শনের আগেই তার জন্য কেনাকাটা সেরে নিতে হয় দিদিকে।

হ্যাঁ, দিদি বলেই ডাকছি আমি তাঁকে। তিনিও আমাকে ভাই বলে সম্বোধন করছেন। আশ্চর্য-সুন্দর সরল ও স্নেহশীলা মহিলা।

তাঁর সামনে এসে দাঁড়াতেই দিদি একটু সরে গিয়ে বলেন, "ভাই, বোসো।"

ভাগনীদের নিয়ে আমি তাঁর বিছানায় বসি।

দিদি তাঁর হাতব্যাগ খুলে কি যেন খুঁজছেন। টাকা-পয়সা দেবেন নাকি আবার!

না, টাকা নয়, কৌটো। দিদি সেটি আমার হাতে দিয়ে বলেন, "এই নাও।"

শ্রী জিজ্ঞেস করে, "ওটা কি মামু!"

"কৌটো, নস্যির কৌটো।" দিদি উত্তর দেন। "সেদিন দিল্লীতে তোমার মামুর নস্যির কৌটো হারিয়ে গেল না, তাই আগ্রা থেকে এটা কিনে আনলাম।"

কাজটা ভালই করেছেন। কৌটো হারিয়ে যাবার পর থেকে আমার বড্ড অসুবিধে হচ্ছিল।

নস্যির বড় ফাইল পকেটে নিয়ে ঘুরতে হচ্ছে। দিদি আমার এ অসুবিধের কথা বিস্মৃত হন নি, আমার জন্য কৌটো কিনে এনেছেন।

ভারি সুন্দর কৌটোটি—বাক্স প্যাটার্নের স্টেইন্‌লেস স্টিলের চৌকো কৌটো। ওপরে নাম খোদাই করে এনেছেন। আমি সানন্দচিত্তে আমার স্নেহশীলা দিদির দান গ্রহণ করি।

অমিয়বাবু কেন যেন এই সন্ধেবেলাতেই তাঁর বাঙ্কে চড়ে বসেছিলেন। এবারে তিনি নেমে আসেন নিচে। আমার হাত থেকে দিদির দেওয়া নস্যির কৌটোটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ ধরে পরীক্ষা করেন। তারপরে সেটি ফিরিয়ে দিয়ে জিজ্ঞেস করেন, "আজ দিন ভাল ছিল। কৌটোটা ওপেন করা হবে নাকি?"

তাঁর বক্তব্য ও বলার ভঙ্গি আমাদের অট্টহাসিতে ফেটে পড়তে বাধ্য করে।

অমিয়বাবু অবিবাহিত, বয়স পাঁচের কোঠায়। কালীঘাটে পৈতৃক বাড়ি আছে। একা মানুষ, বাড়ি ভাড়া দিয়েই বেশ ভালভাবে চলে যায়। রোগা কালো ও ছিপছিপে গড়ন। কানে একটু কম শোনেন কিন্তু জোরে কথা বললে বেশ মনমাতানো উত্তর পাওয়া যায়।

তাই চেঁচিয়ে বলি, "ওপেন করা যেতে পারে, কিন্তু সে কাজটা কে করবেন?" আমি তাঁর দিকে তাকাই।

"তাই তো, ভারি মুশকিল হল।" অমিয়বাবু চিন্তার ভান করেন, আজকাল যে মন্ত্রীরা ছাড়া আর কেউ কিছুর উদ্‌বোধন করতে পারেন না।"

"মন্ত্রীর অভাবে বোধহয় কাজটা আপনি করলেও করতে পারেন।" আমি সবিনয়ে প্রস্তাব পেশ করি।

"তা পারি।" গম্ভীর স্বরে অমিয়বাবু বলেন, "কারণ একাধিক মন্ত্রীর উদ্‌বোধনী অনুষ্ঠানে যোগদান করার সুযোগ আমার হয়েছে।"

"তা হলে আর দেরি করে লাভ নেই দাদা।" সরকারদা সোচ্চার স্বরে বলে ওঠেন, "আমরা একটু উদ্‌বোধন অনুষ্ঠানটি দেখি।"

অমিয়বাবু আর আপত্তি করেন না। আমি নস্যির ফাইলটি তাঁর হাতে দিই। তিনি তার থেকে খানিকটা নস্যি দিদির দেওয়া কৌটোটাতে ঢেলে দেন। সঙ্গে বৌদি উলুধ্বনি করে ওঠেন।

সবার সঙ্গে পাশের খোপ থেকে উকিলবাবুও ছুটে আসেন। উকিলবাবুর বয়স সাতের কোঠায় হলেও ভদ্রলোক এখনও বেশ চটপটে রয়েছেন। স্বাস্থ্যটিও ভাল। কাজেই তাঁর আগমনে অবাক হবার কিছু নেই। অবাক কাণ্ড এই যে বৌদির উলুধ্বনি শুনে মিসেস উকিল পর্যন্ত উঠে বসে মুখ বাড়িয়েছেন।

আপনারা জীবনে কে কত মোটা মানুষ দেখেছেন জানা নেই আমার। তবে আমি মিসেস উকিলের চেয়ে স্থূলাঙ্গীর দর্শন খুব কমই পেয়েছি।

উকিলবাবু একটি লোয়ার ও একটি আপার বার্থ পেয়েছেন। বলা বাহুল্য মিসেস রয়েছে লোয়ারে। এবং যেহেতু তিনি সর্বদা শুয়েই থাকেন, সেইহেতু উকিলবাবু কখনই বার্থে বসতে পারেন না। আর এমনটি যে হবে জানতেন বলেই বোধকরি তিনি ঐ জলচৌকিখানি নিয়ে এসেছেন। উকিলবাবু দিনের বেলায় তাঁর স্ত্রীর পায়ের কাছে সেখানি পেতে নিঃশব্দে বসে থাকেন।

নিজে রোগা বলে মোটা মানুষদের প্রতি আমার একটা সহজাত শ্রদ্ধা আছে। কিন্তু এবারে

যাত্রায় বেরিয়ে মিসেস উকিলকে দেখার পর থেকে বহুবার জীবনদেবতার কাছে আকুল আবেদন রেখেছি—ঠাকুর তুমি আর যাই করো, আমাকে কখনও মোটা কোরো না। আমি যেন আমার এই রোগা লিক্‌লিকে চর্মসর্বস্ব শরীরটি নিয়ে তোমার এই সুন্দর ভুবনে শেষ নিঃশ্বাস ফেলতে পারি।

সবার সঙ্গে দেখা করার আগেই পাঁচুবাবুর তাগিদে জায়গায় ফিরতে হল—ডিনার রেডি। এখুনি খাবার আসবে।

ভৌমিকবাবুর জ্বরটা আরও বেড়েছে। তিনি প্রায় বেহুঁশের মতো পড়ে রয়েছেন। উমাদি তাঁর শিয়রে বসে জলপট্টি দিচ্ছেন। দাদা বাতাস করছেন। মিসেস ভৌমিক চুপচাপ বসে আছেন স্বামীর পাশে।

উমাদিকে আমার বড় ভাল লাগে। বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড়ই হবেন। বেশ ছিমছাম স্মার্ট চেহারা। বহু তীর্থ ভ্রমণ করেছেন। মনে হয় সংসারে খুব আপনজন কেউ নেই এবং তিনি বিয়ে করেন নি। তাই বলে দিন কাটাতে কোন অসুবিধে হয় না, তাঁর যে গোপাল রয়েছে। একটি নয়, দু'টি গোপাল—একটি ছোট ও একটি মাঝারি মূর্তি। সারাদিন তাদের তিনি মাতৃস্নেহে সেবা করেন—ঘুম থেকে তোলা, মুখ ধোয়ানো, জলখাবার খাওয়ানো, স্নান করানো, বেড়াতে নিয়ে যাওয়া, দু-বেলা ঘুম পাড়ানো—সব মিলিয়ে অনেক কাজ। তাই ম্যানেজার পাঁচুবাবু উমাদিকে গোপালদি বলে ডাকে এবং তিনি সানন্দে সে ডাকে সাড়া দেন।

গোপালের প্রতি উমাদির এই পক্ষপাত আমাদের ঈর্ষার উদ্রেক করে নি। কারণ আমরা দু-বেলা গোপালের প্রসাদ পাচ্ছি গোপালসেবার পরে উমাদি যে সামান্য সময়টুকু হাতে পাচ্ছেন, সেটুকু তিনি আমাদের সুখসুবিধার জন্য ব্যয় করেছেন।

কিছুক্ষণ বাদেই খাবার এলো। এটি তীর্থযাত্রা সুতরাং নিরামিষ খাবার—লুচি তরকারি ডাল ভাজা আচার ও মিষ্টি। রাতে আমরা ভাত রুটি ও লুচি যা ইচ্ছে খেতে পারি। কিন্তু আমি লুচিই খাচ্ছি, কারণ এত ভাল ঘি এবং ময়দার লুচি বাড়িতে বড় একটা জোটে না।

খাওয়া শেষ হবার আগেই পাঁচুবাবুর তরুণ সহকারী তপন চক্রবর্তী সবাইকে সাবধান করে, "ট্রেন এসে গিয়েছে, তাড়াতাড়ি খেয়ে নিন। এখুন শান্টিং শুরু হয়ে যাবে।"

কুণ্ডু স্পেশালের সঙ্গে ভ্রমণে এসে এ পর্যন্ত যে জিনিসটির সঙ্গে সবচেয়ে বেশি করে পরিচয় হয়েছে, তার নাম 'শান্টিং'। যে সব বড় স্টেশনে ট্যুরিস্ট্ প্ল্যাটফর্ম আছে, সেখানে শান্তি। আর তা না থাকলেই শান্টিং—সকাল-সন্ধে, দিনরাতের কোন বাছ-বিচার নেই, যখন-তখন এই শান্টিংয়ের কবলে পড়তে হবে। তার মানে আমাদের কোচ্‌টিকে নিয়ে টানা-হেঁচড়া চলবে—কখনও প্লাটফর্মে নিয়ে আসবে, কখনও সেকেন্ড কিংবা থার্ড লাইনে আবার কখনও বা সাইডিংয়ে নিয়ে কোন মালগাড়ির পেছনে লুকিয়ে রেখে দেবে। আবার একটা মজার ব্যাপারও দেখেছি—সারারাত শান্টিংয়ের দৌরাত্ম্যে হয়তো দু-চোখের পাতা এক করতে পারি নি। যখনই চোখ বুজেছি তখুনি শান্টিং ইঞ্জিন এসে আমাদের কোচ্‌টিকে নাড়ানাড়ি শুরু করে দিয়েছে। কিন্তু পরদিন সকালে জানালা খুলে সবিস্ময়ে দেখেছি, আগের সন্ধ্যায় যেখানে ছিলাম, আমরা ঠিক সেখানেই রয়ে গেছি। তাহলে সারারাত ধরে অমন নাড়াচাড়া চলল কেন?

না, সে প্রশ্নের উত্তর আজও পাই নি। আর তাই মাঝে মাঝে মনে হয়—রেল কোম্পানির কর্মচারীদের হাতে কাজ না থাকলেই বোধহয় তাঁরা শান্টিং করে সময় কাটান।

অতএব তপনের সতর্কবাণীকে কেউ অহবেলা করলেন না। সবাই তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করে নিলেন। আর তারপরেই শুরু হল শান্টিং।

কিছুক্ষণ বাদেই গাড়ি ছাড়ল। আমরা রওনা হলাম রাজস্থান—রাজভূমি রাজস্থান।

তপন এসে সবাইকে আগামীকালের ভ্রমণসূচী জানিয়ে দিয়ে গেল। একে একে সবাই শুয়ে পড়ল। কুণ্ডু স্পেশালের কর্মচারী অহীন এসে জানালা-দরজা বন্ধ করে বড় আলো নিবিয়ে দিয়ে গেল। ধীরে ধীরে সহযাত্রীদের সমবেত নাসিকা গর্জন গাড়ির শব্দকে ছাপিয়ে উঠল। আমি কিন্তু চোখ বুজতে পারছি না। একে মানসীর চিন্তা, তার ওপরে ভৌমিকবাবুর জ্বরটা বেড়েছে। তিনি শুয়ে আছেন আমার পাশে। প্রায় বেহুঁশের মতো পড়ে আছেন। মিসেস বসে আছেন শিয়রে। এ অবস্থায় আমার পক্ষে ঘুমিয়ে পড়া তো দূরের কথা শুয়ে থাকাই সম্ভব নয়—আমি আবার উঠে বসি।

।। তিন।।

মানসীর ভাবনা ও ভৌমিকবাবুর চিন্তায় রাতে ভাল ঘুম হয় নি আমার।

না জানি বৃন্দাবনে ফিরতে ওদের কাল কত রাত হয়েছে! শীতের রাত নিজেও কষ্ট পেয়েছে আর মেয়েটাকেও কষ্ট দিয়েছে। কিন্তু কেউ যদি জেদ করে কষ্ট ডেকে আনে, আমি তার কি করতে পারি? কুণ্ডু স্পেশালের সুবন্দোবস্তের কথা জেনেও কাল মানসীর আগ্রা আসার কোন প্রয়োজন ছিল কি?

জানি প্রয়োজন হিসেব করে সব মানুষ সব সময় সব কাজ করে না। কারণ মানুষের মনটা বীজগণিতের সূত্রের মতো সর্বদা একটি নির্দিষ্ট নিয়ম মেনে চলে না। এবং তা চলে না বলেই জগতে আজও শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রেম-প্রীতি ও স্নেহ-ভালবাসা বেঁচে রয়েছে। আর তাই মানসী কাল অকারণে অমন কষ্ট পেয়েছে।

কিন্তু না, মানসীর কথা আর নয়। ওর কথা মনে পড়লেই যে আমার অন্য সব ভাবনা যায় হারিয়ে। তার চেয়ে বরং ভৌমিকবাবুর কথা বলে নিই।

শেষ পর্যন্ত মিসেস তাঁকে পাঁচুবাবুর ওষুধই খাওয়াতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্বরটাও বেড়ে যাচ্ছিল। ওষুধে কিন্তু খুব একটা ফল হয় নি। ভদ্রলোক সারারাত ছটফট করেছেন।

এমনিতেই ভৌমিকবাবু তেমন সচল নন, তার ওপর জ্বর। অথচ তিনি ডায়েবেটিসের রোগী। কাজেই কাল রাতে ঐ অবস্থাতেই তাঁকে আমার বেশ কয়েকবার ধরে ধরে বাথরুমে নিয়ে যেতে হয়েছে। সুতরাং আমি ভাল ঘুমোতে পারি নি।

কাল রাতে ঘুমোতে না পারলেও, আজ সকালে বাথরুমের ভিড় এড়াতে পেরেছি। অন্ধকার থাকতে থাকতেই প্রাতঃকৃত্যের পাট চুকিয়ে নিয়েছি।

ওরা মানে কুণ্ডু স্পেশালের কর্মচারীরাও কিন্তু অন্ধকার থাকতে বিছানা ছেড়েছে। বেড্-টি খেয়েই পাঁচুবাবু বেরিয়ে গেছে বাসের খোঁজে। আর ঠাকুর তার সাজ-সরঞ্জাম ও খাবারের জিনিসপত্র নিয়ে গাড়ি থেকে নেমে গিয়েছে। প্লাটফর্মে রান্না হচ্ছে।

এই রে, আসল কথাটাই বলতে ভুলে গিয়েছি। গতকাল রাত তিনটে নাগাদ আমরা রাজভূমি-রাজস্থানের রাজধানী জয়পুরে পৌঁছেছি। আমেদাবাদ এক্সপ্রেস আমাদের কোচটিকে

জয়পুরে রেখে গন্তব্যপথে চলে গিয়েছে।

শুধু রাজধানী নয়, রাজস্থান দর্শনার্থীদের প্রকৃত প্রবেশ তোরণ জয়পুর। পশ্চিম-রেলপথের দিল্লী-আমেদাবাদ শাখার একটি জংশন-স্টেশন। আগ্রাফোর্ট থেকে রেলপথে জয়পুর ২৪০ কিলোমিটার। আমরা কলকাতা থেকে রেলে প্রায় ১৬০০ কিলোমিটার এবং দিল্লী থেকে ৩৩৬ কিলোমিটার দূরে এসেছি। রেলপথে বম্বে থেকে জয়পুরের দূরত্ব প্রায় ১১২০ কিলোমিটার। দিল্লী ও আগ্রা থেকে দু'টি জাতীয় সড়ক এসে জয়পুরে মিলিত হয়েছে।

সকাল আটটায় ব্রেকফাস্ট এলো। আর আমাদের খাওয়া শেষ হবার আগেই পাঁচুবাবু ফিরে আসে। মোটাসোটা কিন্তু পরিশ্রমী মানুষ। বয়স বছর চল্লিশেক। মেদিনীপুরের লোক। প্রথম জীবনে ফিল্ম লাইনে ছিল। কয়েক বছর হল কুণ্ডু স্পেশালে কাজ করছে।

গাড়িতে উঠেই পাঁচুবাবু ঘোষণা করল, "মা ঠাকুরমা দিদি দাদা দাদু ও কাকারা! বাস এসে গেছে, স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। আপনারা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ুন।"

"তুমি যাবে না আমাদের সঙ্গে?" জিজ্ঞেস করি তাঁকে।

"না ঘোষদা! আমি গাড়িতেই থাকব, ভৌমিকবাবুর চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। তপন আপনাদের সঙ্গে যাচ্ছে। জয়পুর তার চেনা শহর, আপনাদের কোন অসুবিধে হবে না।"

মিসেস ভৌমিকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শ্রী ও দাদার সঙ্গে নেমে আসি গাড়ি থেকে। কাজটা খুব সহজ নয়। যথারীতি কাল রাত থেকেই আমাদের কোচটিকে সাইডিংয়ে ফেলে রেখেছে। এখানে প্লাটফর্ম নেই।

তাহলেও সহযাত্রীরা সকলেই, এমন কি মিসেস উকিলও নির্বিঘ্নে নেমে এলেন গাড়ি থেকে। ধীরে ধীরেও তিনি দিব্যি পাথুরে রেল লাইন পেরিয়ে আমাদের অনুসরণ করছেন। আর তাঁকে অনুসরণ করছেন উকিলবাবু।

কিন্তু তিনি জলচৌকিটা নিয়ে কোথায় চলেছেন। আমরা তো রিজার্ভড বাসে জয়পুর দেখতে চলেছি। এখন জলচৌকি দিয়ে কি হবে?

লাইন পেরিয়ে প্ল্যাটফর্মে উঠে আসি। মিটার গেজ রেলপথ, প্ল্যাটফর্ম খুব উঁচু নয়। কিন্তু মিসেস উকিলের পক্ষে তো ওঠা মুশকিল হবে। অথচ তাঁকে হাত ধরে টেনে তোলাও সম্ভব নয়।

মিসেস প্ল্যাটফর্মের পাশে আসতেই মিস্টার তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে জলচৌকিখানি তাঁর সামনে পেতে দিলেন। আর তারই ওপর পা ফেলে মিস্টারের কাঁধে ভর করে অক্লেশে উঠে এলেন প্ল্যাটফর্মে। এতক্ষণে জলচৌকি সঙ্গে আনার কারণটা বুঝতে পারছি।

বাসের কাছে এসে কিন্তু মাথায় হাত দিতে হল। আট/দশটি টাঙ্গা আমাদের বাসটিকে ঘেরাও করে আছে আর দু'জন কনস্টেবল-ড্রাইভারকে ধমকাচ্ছে। তাদের বক্তব্য—এটা 'নো-পার্কিং এরিয়া', সুতরাং তারা এখন বাস থানায় নিয়ে যাবে।

সর্বনাশ! বাসকে অ্যারেস্ট্ করলে যে আমাদের জয়পুর দর্শনের দফা শেষ।

বাধ্য হয়ে পাঁচুবাবুকে ড্রাইভারের পক্ষ সমর্থন করে পুলিশদ্বয়ের সঙ্গে আলোচনায় প্রবৃত্ত হতে হয়। ম্যানেজ-মাস্টার ম্যানেজার ম্যাজিসিয়ানের মতো টাঙ্গাওয়ালাদের দৃষ্টি এড়িয়ে তাদের একজনের হাতে একখানি নোট গুঁজে দেয়। অনতিকাল পরেই তারা ঘোষণা করে—'ট্রফিক-রুল্‌স' ভঙ্গ করার অপরাধ তারা ক্ষমা করছে। কারণ এমন অপরাধ হামেশাই

অনুষ্ঠিত হচ্ছে। কিন্তু টাঙ্গাওয়ালাদের সঙ্গে মিটমাট না করতে পারলে তারা নিরুপায়।

বাস ট্যাক্সি স্কুটার ও সাইকেল-রিক্সার আক্রমণে ঘোড়ার গাড়ির সংখ্যা ক্রমেই কমে যাচ্ছে আমাদের দেশে। কিন্তু কোচোয়ানদের তেজ কমে নি কিছুমাত্র। বাংলাদেশের ঢাকা থেকে কাশ্মীরের শ্রীনগর পর্যন্ত সর্বত্রই দেখেছি তাদের প্রবল প্রতাপ। শুনেছি—জনৈক নেতা টাঙ্গা অ্যাসোসিয়েশন কর্মকর্তা থেকে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন।

সুতরাং পুলিশদের প্রস্তাবটি কার্যকর করতে ম্যানেজারকে রীতিমত হিমশিম খেতে হল। টাঙ্গাওয়ালাদের অভিযোগ—বাসওয়ালা বে-আইনি ভাবে আজকের সমস্ত রেলযাত্রীদের নিয়ে যাচ্ছে। ঘোড়া সহ তাদের যে আজ উপোস করতে হবে।

অনেক কষ্টে ম্যানেজার তাদের বোঝাতে সক্ষম হয় সে আমরা সবাই একসঙ্গে এসেছি এবং আমাদের সময় কম। সুতরাং আমাদের পক্ষে টাঙ্গায় চড়ে জয়পুর দর্শন সম্ভব নয়।

"তব্ হম্‌লোগকো বকশিশ দিজীয়ে।" কোচোয়ানদের নেতা নতুন দাবি পেশ করে। এবং আমরা তাদের যে দাবি মেনে নিই।

অনেক দরাদরির পরে তাদের প্রত্যেককে টাকা দিয়ে আমরা বাসকে ঘেরাওমুক্ত করতে সমর্থ হলাম। জানি না আমার সহযাত্রীরা এই খেসারতকে ঘষ বলে মনে করছেন কিনা?

অবশেষে বাসের ইঞ্জিন গর্জে উঠল, নেচে উঠল আমার মন। শুধু আমার মনই বা বলি কেন, আমার সহযাত্রীদের সবার মন—শ্রী থেকে ঠাকুরমারা পর্যন্ত সবাই খুশিতে উজ্জ্বল। আর তাই বোধহয় তাঁরা পাঁচুবাবুর সঙ্গে গলা মিলিয়ে সোচ্চারকণ্ঠে বলে উঠলেন—শ্রীরাধাগোবিন্দজীউকী জয়।

গোবিন্দজী জয়পুরের গৃহদেবতা। আমরা আজ দর্শন করব শ্রীরূপ গোস্বামীর সেই ইষ্টদেবতাকে। আমার অনেক দিনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে আজ।

বাস চলতে শুরু করেছে। বেশ বড় বাস। একেবারে সামনের সারি দখল করেছেন ঠাকুরমারা—তাঁরা পাঁচজন, তিন ঠাকুরমা ও দুই দিদি। ঠাকুরমারা বয়েসে সবার চেয়ে বড় হয়েও সবচেয়ে চতুর এবং চটপটে। ওঁরা সবার আগে বাথরুম দখল করেন, সবার আগে খেতে বসেন, আগে খেতে বসেন, সবার আগে তৈরি হয়ে বেড়াতে বের হন। ওঁরা যে হামেশাই এমন যাত্রায় আসেন।

ঠাকুরমারা কেউ কারও আত্মীয়া নন, তাঁরা বান্ধবী। এবং সে বন্ধুত্ব পথের, এমনি বেড়াতে বেরিয়ে। তাঁদের দেখে আজ আবার বুঝতে পারছি সেবারে পাঠানকোটে বসে মানসী কি ভুলটাই না করেছিল। সে বলেছিল—পথের পরিচয়কে পথেই শেষ করে দেওয়া ভাল।*

অবশ্য সে কথা মানসীর নিজের জীবনেও মিথ্যে হয়ে গিয়েছে। পথের সেই পরিচয়ই আজ তার জীবনে সবচেয়ে বড় সত্য হয়ে উঠেছে।

কিন্তু না, মানসীর কথা এখন নয়। মানসী তো রয়েছে বহুদূরে। তার চেয়ে কাছের মানুষদের কথাই বলা যাক, আমার সহযাত্রীদের কথা।

ঠাকুরমাদের পরের সারিতে বসেছেন—সাহাবাবু ও মেজদি মানে মিসেস সাহা এবং তাঁর মা অর্থাৎ আমার মাসিমা, পূর্ণিমা ও শঙ্করী। তার পরের সারিতে সস্ত্রীক সরকারদা, সত্যেনদা,

* লেখকের 'মানালীর মালঞ্চে' অথবা 'হিমালয় (২য়)' দ্রষ্টব্য।

মা এবং অমরবাবু। তারপরের সারিতে আমরা—বিউটি শ্রী আমি দাদা ও দিদি। আমাদের পেছনে সস্ত্রীক উকিলবাবু এবং উমাদি। তারপরে সামন্তবাবু এবং তাঁর পরিবার ইত্যাদি।

সকাল আটটার পরে বড় বাস সোজাপথে স্টেশনে আসতে পারে না। তাই অনেকটা ঘুরে আমাদের রায়গঞ্জ বাজারে আসতে হল। এটি শহরের বেশ বর্ধিষ্ণু এলাকা। সুতরাং এখান থেকেই প্রকৃতপক্ষে আমাদের জয়পুর দর্শন শুরু হল—জয়শ্রী জয়পুর।

মসৃণ প্রশস্ত পথ ধরে বাস চলেছে এগিয়ে। পথের দু'পাশ শুধুই রঙের মেলা—রঙীন বাড়ি-ঘর ও দোকান পাট আর রঙীন-ঘর ও দোকান পাট আর রঙীন পোশাক পরা নারী-পুরুষ ও শিশুর দল। ভারতের বৃহত্তম মহানগরীর নাগরিক আমি।

জীবনে বহু নগর দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছে কিন্তু এমন রঙিন নগরী আমি এর আগে কখনও দেখি নি।

"মামু, দেখো দেখো কত্তো বড় বড়, কত্তোগুলো উট।"

শ্রীমতী শ্রীর কথায় বাসের জানলা দিয়ে সামনে তাকাতে হয়। সত্যি গলা উঁচু করে একসারি উট চলেছে। সহযাত্রীরা প্রায় সকলেই গলা বাড়িয়ে তাদের দেখছে। তবে শ্রীর পরেই বোধহয় সবচেয়ে বেশি আনন্দ হয়েছে সামন্তবাবুর ছোট ছেলের আর তার পরেই ঠাকুরমাদের স্থান। মনের দিকে থেকে যে বৃদ্ধ এবং শিশুর মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই।

আমাদের বাস পাশে পৌঁছতেই শ্রী হাততালি দিয়ে উষ্ট্রবাহিনীকে উষ্ণ অভিনন্দন জানায়। ঠাকুরমারা ইতিমধ্যে গল্প জুড়ে দিয়েছেন এর আগে তাঁদের কে করে কোথায় কতগুলো উট একসঙ্গে দেখেছিলেন।

শ্রীও আমার কাছে গল্প শুনতে চায়, উট নয়—জয়পুরের গল্প। বিউটিরও একই দাবি। সুতরাং শুরু করতে হয়, "১৭২৭ খ্রীস্টাব্দে ১৮ই নভেম্বর মহারাজা জয় সিংহ এই নগরীর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। জয়পুরকে বলা হয় Fantasy in pink বা গোলাপী স্বপ্ন। এই নগরীর অধিকাংশ প্রাসাদের গোলাপী পাথরে তৈরি এবং প্রায় সব বাড়ির রং গোলাপী। তোমরা শুনে খুশি হবে যে হিন্দু শিল্পশাস্ত্র অনুযায়ী এই নগরীর নক্শা করা হয়েছে। জয়পুর পৃথিবীর প্রথম পরিকল্পিত নগরী। আর যিনি এই নগরীর পরিকল্পনা রচনা করেছেন, তিনি একজন বাঙালী।"

"তাঁর নাম কি মামু?" আমি থামতেই শ্রী প্রশ্ন করে বসে।

উত্তর দিই, "বিদ্যাধর ভট্টাচার্য (অনেকের মতে চক্রবর্তী)। তিনি শুধু একজন বড় স্থপতি ছিলেন না, তিনি ছিলেন জয়পুর নগরীর প্রতিষ্ঠাতা মহারাজা সোয়াই জয় সিংহের প্রধান পরামর্শদাতা। জয় সিংহের রাজত্বকাল ১৬৯৯ থেকে ১৭৪৩ খ্রীস্টাব্দ।

"বিদ্যাধর জন্মেছিলেন ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দে। তার মানে মহারাজা দ্বিতীয় সওয়াই জয় সিংহ যখন সিংহাসনে বসেন, তখন বিদ্যাধর মাত্র দু-বছরের শিশু। তরুণ বয়সেই তিনি অম্বর রাজপ্রাসাদের সোপানশ্রেণীর একটি নক্শা এঁকে দিয়ে বিদ্যোৎসাহী ও সৃষ্টিশীল জয় সিংহের প্রিয়পাত্রে পরিণত হন। জয় সিংহের কল্পনাকে বাস্তব রূপ দিয়েছেন বিদ্যাধর। কেবল নগর নয়, সেই সঙ্গে রাজপ্রাসাদ এবং যন্তরমন্তরও তিনিই তৈরি করেছেন।

"১৭২৮ সালে তিরিশ বছর বয়সে বিদ্যাধর এই নগরী নির্মাণের প্রাথমিক কাজকর্ম আরম্ভ করেন। মাত্র দু-বছরের মধ্যে প্রাথমিক কাজ শেষ করে ফেললেন। বিদ্যাধরের সেইসব ছকের

কিছু কিছু এখনও এখানকার সিটি প্যালেসে সযত্নে রক্ষিত আছে। যাই হোক, ছক তৈরি শেষ হলে বিদ্যাধর শুরু করলেন নগর নির্মাণ। প্রায় পনেরো বছর ধরে দিবারাত্র প্রাণপাত পরিশ্রম করে হাজার হাজার কর্মীর সহায়তায় তিনি মহারাজা জয় সিংহের স্বপ্নকে সার্থক করে তুললেন। নির্মিত হল বিশ্বের প্রথম পরিকল্পিত-শহর ও রাজস্থানের মরূদ্যান—মহানগরী জয়নগর। পরে নাম হয়েছে জয়পুর।"

একটু থেমে আবার বলি, "অনেকে অবশ্য মনে করেন, মহারাজা জয় সিংহের সৃষ্টিশীল প্রতিভার প্রধান প্রেরণা ছিলেন তাঁর এক পরমসুন্দরী কিশোরী-প্রেয়সী। ইতিহাস সেই সুন্দরী সম্পর্কে সম্পূর্ণ-নীরব, এমনকি তাঁর নামটি পর্যন্ত আজও অজানা রয়ে গিয়েছে। শুধু জানা যায়, মহারাজা জয় সিংহ তাঁর কর্মব্যস্ত জীবনের কাছ থেকে ছুটি নিয়ে প্রায় প্রতিসন্ধ্যায় সেই কিশোরী-প্রেয়সীর প্রেমপ্রার্থী হতেন, আর সেই অভিসার-রজনীতেই তাঁরা রচনা করতেন নব-নব সৃষ্টির পরিকল্পনা।"

"আচ্ছা মামু, জয়পুরের মহারাজাদের সোয়াই বলে কেন?" এবারের প্রশ্ন বিউটির।

"সত্যি মিথ্যে বলতে পারব না, তবে এ সম্পর্কে একটা গল্প পড়েছি শ্রীদেবেশ দাসের 'রাজোয়ারা' বইতে।"

"গল্পটা বলো না গো!" গল্পের গন্ধ পেয়েই আমার সাত বছরের ভাগনী ফরমাশ করে বসে।

বলতে থাকি, "তোমরা জানো মহারাজা মানসিংহের পিতামহ বিহারমল্লের আমল থেকেই মুঘলদের সঙ্গে অম্বরের একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে ওঠে। তখন অম্বরের রাজপুত্রদের যুদ্ধ ও রাজ্যশাসন শিক্ষার জন্য কৈশোরে মুঘল সম্রাটের দরবারে পাঠিয়ে দেওয়া হত। বালক জয় সিংহও কিছুকাল আওরঙ্গজেবের কাছে আগ্রাদুর্গে ছিলেন। হিন্দুবিদ্বেষী আওরঙ্গজেব নেহাত নিরুপায় হয়েই অম্বররাজের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছে ছিল না যে বালক জয় সিংহ শিক্ষা শেষে অম্বর ফিরে যায়। তাই একদিন তিনি যখন কয়েকজন ওমরাহ এবং জয় সিংহকে নিয়ে বজরায় চড়ে যমুনায় সান্ধ্য বিহার করছিলেন, তখন হঠাৎ দু'হাতে জয় সিংহকে ধরে জলের ওপরে দোলাতে শুরু করে দিলেন। বললেন—এখন যদি আমি তোমাকে হাত থেকে ছেড়ে দিই?

"বালক সে প্রশ্নের কোন উত্তর দিলেন না, শুধু একটু মৃদু হাসলেন।

"বিস্মিত আওরঙ্গজেবের প্রশ্ন করলেন—তোমার ভয় করছে না?

"বালক নির্ভয়ে উত্তর দিলেন—না। কেন ভয় করবে জাঁহাপনা! আমরা রাজপুত। বিয়ের সময় কনে যখন একখানি হাত দিয়ে আমাদের হাত ধরে, আমরা সঙ্গে সঙ্গে সংসারের সব ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাই আর এমন আমি এখন দু'খানি হাতের আশ্রয়ে রয়েছি, যে হাত তামাম হিন্দুস্তানকে পালন করছে।

"পরাজিত আওরঙ্গজেব বললেন—বৎস তুমি বাচ্চা নও, তুমি এরই মধ্যে একটা গোটা মানুষের চেয়ে চার আনা বেড়ে গিয়েছো। তুমি শুধু জয় সিংহ নও সোয়াই জয় সিংহ।

"সেই থেকেই অম্বর তথা জয়পুরের মহারাজাদের নামের আগে সোয়াই মানে সোয়া শব্দটি বসানো হয়েছে আছে।"

"শুনেছি মহারাজা জয় সিংহ নাকি মস্তবড় পণ্ডিত ছিলেন?" বিউটি জিজ্ঞেস করে।

বলি, "হ্যাঁ, তবে শুধু পণ্ডিত বললে কম বলা হবে। তিনি ছিলেন একজন সুলেখক সুশাসক বীর রাজনীতিজ্ঞ আইনজ্ঞ ধার্মিক এবং বৈজ্ঞানিক।"

"বৈজ্ঞানিক!"

"হ্যাঁ, জ্যোতির্বিদ। জয়পুর দিল্লী কাশী এবং উজ্জয়িনীর যন্তর-মন্তর বা মানমন্দির তাঁরই অক্ষয়কীর্তি। একালের জ্যোতির্বিদগণও এগুলিকে অভ্রান্ত বলে স্বীকার করে নিয়েছেন।"

"জয়পুরেও যন্তর-মন্তর আছে মামু?" শ্রী রীতিমত উৎসাহিত।

"হ্যাঁ।" আমি উত্তর দিই।

"কেমন, দিল্লীর মতো?" শ্রী সেদিন দিল্লীতে যন্তর-মন্তর দেখেছে।

"না। তার থেকে অনেক ভাল।" আমি বলি।

"আমরা দেখব না?"

"হ্যাঁ।"

"কি মজা, আমরা আজ আবার যন্তর-মন্তর দেখব।" শ্রী আবার হাততালি দিয়ে ওঠে।

আমারও হাততালি দিতে ইচ্ছে করছে কিন্তু পারছি না। আমার যে শ্রীর মতো আনন্দ প্রকাশের অধিকার নেই। বহু বছর আগেই আমি সে বয়সটিকে পেছনে ফেলে এসেছি। তবে ঠাকুরমাদের বয়স পেলে, আমি হয়তো আবার অধিকার ফিরে পাবো।

যন্তর-মন্তর দেখবো বলে নয়, আমার হাততালি দিতে ইচ্ছে করছে আমি আজ "Land of the autumn sun-set' রাজস্থানে আসতে পেরেছি বলে। ভারতের দ্বিতীয় বৃহত্তম রাজ্য রাজস্থান। ২৬টি জেলা নিয়ে গঠিত। এই রাজ্যের উত্তরে পাকিস্তান পাঞ্জাব ও হরিয়ানা, পূর্বে হরিয়ানা উত্তরপ্রদেশ ও মধ্যপ্রদেশ, দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশ ও গুজরাত, পশ্চিমে গুজরাত ও পাকিস্তান।

রাজস্থানে ৩৫,৭৯৫টি গ্রাম আছে। তার মধ্যে ৩৩,৩০৫টিতে জনবসতি রয়েছে। এই রাজ্যের ১৫৭টি জনপদ শহরের মর্যাদা পেয়েছে। তার মধ্যে ১১টিতে মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলস, ১৩৪টিতে মিউনিসিপ্যাল বোর্ড, ১টিতে নোটিফাইড এরিয়া কমিটি এবং ১টিতে ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড রয়েছে। বাকি ১০টি শহর দেখাশোনা করেন স্থানীয় পঞ্চায়েত।

খ্রীস্টাব্দের আদমশুমারি অনুযায়ী রাজস্থানের আয়তন ৩,৪২,২১৪ বর্গ কিলোমিটার। এর মধ্যে গ্রামীণ অঞ্চল হল ৩,৩৮,৪২১৭ বঃ কিঃ মিটার। তার মানে শহরগুলির সম্মিলিত আয়তন মাত্র ৩৭৯২.৩ বঃ কিঃ মিটার।

সালের জনগণনা অনুযায়ী রাজস্থানের জনসংখ্যা ২,৫৭,৬৫,৮০৬ জন। এদের মধ্যে ১,৩৪,৮৪,৩৮৩ জন পুরুষ এবং ১,২২,৮১,৪২৩ জন নারী। সারারাজ্যে মাত্র ৪৫,৪৩,৭৬১ জন লোক শহরে বাস করে। অর্থাৎ গ্রামবাসীদের সংখ্যা শহরবাসীদের প্রায় ছ'গুণ।

১৯৭৪ সালের 'Fodor's India'-তেও রাজস্থানকে বলা হয়েছে 'Shrine of Chivalry' লেখা হয়েছে—

'...It is a land of rock and desert interspersed with fertile tracts, enchanting lakes and jungle...Rajsthan is a country that is still living in its historic past...it is the legendary land of Chivalry and Knightly prowess...palace and fort, garden and lake, they speak of love and

loyalty... Here the best martial qualities of a race are welded of the refinements of peace, of courtesy and culture.'

আরাবল্লী পর্বতমালা রাজস্থানকে দু'ভাগে বিভক্ত করেছে—উত্তর-পশ্চিম ও দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থান। আমাদের ভ্রমণসূচী সবটাই দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থানকে কেন্দ্র করে দুই অংশের মধ্যে এটিই সমৃদ্ধতর। কারণ উত্তর-পশ্চিম রাজস্থানের অধিকাংশ জুড়েই মরুভূমি। তাহলেও ঐ অংশ রয়েছে বিকানীর, যোধপুর এবং জয়সলমীরের মতো দর্শনীয় স্থান। এ যাত্রায় আমার সেগুলি অদেখাই রয়ে যাবে।

কিন্তু রাজস্থানের কথা আর নয়। আমরা জয়পুরে এসেছি, জয়পুরের কথাই ভাবা যাক্। আগ্রা থেকে রাজস্থানের ভরতপুর ও সোয়াই মাধোপুর জেলা পেরিয়ে আমরা জয়পুর জেলায় এসেছি। জয়পুর জেলার চারিদিকে রাজস্থানের নাগাউর, সিকার, আলওয়ার, সোয়াই মাধোপুর, টন্‌ক ও আজমীর জেলা। জয়পুর শহর রাজস্থানের রাজধানী হলেও জেলাটি রাজস্থানের প্রায় পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত। ২৬°২৩′ থেকে ২৭°৫১′ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৭৪°৫৫′ থেকে ৭৬°৫০′ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত এই জেলা। বর্তমান আয়তন ১৪,০০০ বঃ কিঃ মিটার। তার মধ্যে গ্রামাঞ্চলই হল ১৩,৬১৩°৭ বঃ কিঃ মিটার। আয়তনের দিক থেকে জয়পুর রাজস্থানের নবম জেলা।

১৯৭১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী জয়পুর জেলার জনসংখ্যা ২৪,৮২,৩৮৫ জন। এদের মধ্যে ১৩,১৩,৬১৮ জন পুরুষ এবং ১১,৬৮,৭৬৭ জন নারী।

১৫টি তহশিল নিয়ে জয়পুর জেলা। জয়পুর তহশিলের আয়তন ৫৯৬°৭ বঃ কিঃ মিটার ও জনসংখ্যা ৬,৬৭,৯৩৭ জন। এদের মধ্যে ৩,৫৯,৩৪৯ জন পুরুষ এবং ৩,০৮,৫৮৮ জন নারী। এই তহশিলের অধিকাংশই জয়পুর শহরের অধিবাসী। জয়পুর শহরের জনসংখ্যা ৬,১৫,২৫৮ জন। তাঁদের মধ্যে ৩,৩১,৪০০ জন পুরুষ এবং ২,৮৩,৮৫৮ জন নারী। কিন্তু তহশিলের আয়তন জয়পুর শহরের প্রায় তিন গুণ। জয়পুর শহরের আয়তন মাত্র ২০৬ বঃ কিঃ মিটার। বাড়ির সংখ্যা ১,০০,০৩৪টি। ১৯৭১ সালে ১,০৭,৯৯৮টি পরিবার এই শহরে স্থায়ীভাবে বাস করতেন। গত পনেরো বছরে নিশ্চয়ই এই সব সংখ্যা অনেক বেড়ে গিয়েছে।

দুর্ভেদ্য আরাবল্লী পর্বতমালার পাদদেশে ছবির মতো সুন্দর শহর জয়পুর ভারতের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক নগরীগুলির অন্যতম। প্রসিদ্ধ পাশ্চাত্য পর্যটক ম্যাক্‌সলারনার-এর মতো আমারও আজ বলতে ইচ্ছে করছে—'এবার আমি তৃপ্ত, আমি জয়পুর দেখেছি। এবার মরলেও শান্তি।'

জয়পুর একটি চতুষ্কোণ নগরী। রাজপথগুলি যেমন প্রশস্ত তেমনি ঋজু, একেবারে সরলরেখার মতো। প্রধান পথগুলি ৩৩ মিটার এবং উপ-পথগুলি ১৬ মিটার চওড়া। পথগুলি পূর্ব থেকে পশ্চিমে এবং উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত। পথে প্রতি সঙ্গমে একটি করে স্কোয়ার। সেখানে রয়েছে উদ্যান এবং ফোয়ারা। পথগুলি শহরটিকে বিভিন্ন ব্লকে ভাগ করেছে। রাজস্থানীরা স্কোয়ারকে বলেন চৌপর আর ব্লককে বলেন মহল্লা।

প্রায় প্রতি পথেরই দু'পাশে দেখছি দেওয়াল। তপন বলেছে, এগুলি নাকি ৬ মিটার উঁচু এবং ৩ মিটার চওড়া। দেওয়ালগুলো বিভিন্ন তোরণে এসে মিশেছে।

মোট আটটি বড় তোরণ আছে জয়পুরে। তার মধ্যে উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব পশ্চিমের প্রধান তোরণগুলির নাম যথাক্রমে 'ধ্রুব পোল', 'আজমীর গেট', 'সুরয পোল' ও 'চাঁদ পোল'।

আজমীর গেট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তোরণগুলির স্থাপত্যরীতি, বিশেষ করে তাদের ঝুল-বারান্দাগুলি দেখবার মতো।

রেল লাইনকে জয়পুর শহরের পশ্চিমসীমা বলা যেতে পারে। বলতে গেলে রাজভবন ছাড়া গোটা শহরটাই রেল লাইনের পূর্ব দিকে অবস্থিত। আমরা স্টেশন থেকে প্রথমে ভবানী সিংহ রোড ধরে সচিবালয় ও রাম বাগকে বাঁদিকে এবং স্টেডিয়াম ও বাপু নগরকে ডানদিকে রেখে পুবে এগিয়ে এসেছি। তারপরে সোয়াই মান সিংহ রোড এবং মতিদুংরি রোড ধরে আদর্শ নগর ও টেগোর মেমোরিয়াল থিয়েটারকে ডাইনে এবং চিড়িয়াখানাকে বাঁয়ে রেখে উত্তরে এসেছি। জয়পুরের রাজমাতা গায়ত্রীদেবী মতিদুংরি প্রাসাদে বাস করেন।

অবশেষে নেহেরু ও বাপু বাজার ছাড়িয়ে সকাল সাড়ে ন'টার সময় হাওয়া-মহলের সামনে এসে আমাদের বাস থামল। হৈ হৈ করে সবাই বাস থেকে নেমে পড়ি। পথের পাশেই হাওয়া-মহল, সত্যি দেখবার মতো। বাইরের দিকে সবটা জুড়েই কারুকার্য খচিত বিভিন্ন আকারের অসংখ্য ঝুলন্ত কক্ষ। তাদের সারাগায়ে ছোট-বড় গবাক্ষ এবং পাথরের জালির কাজ। বিজ্ঞান ও শিল্পকলার এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ। রাজপুত স্থাপত্যের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শন। গোলাপী রঙের অর্ধচন্দ্রাকৃতি পাঁচতলা প্রাসাদ—মহারাজাদের গ্রীষ্মকালীন আবাস। ১৭৯৯ খ্রীস্টাব্দে মহারাজা সোয়াই প্রতাপ সিংহ এটি নির্মাণ করেছেন প্রতাপের রাজত্বকাল ১৭৭৮ থেকে ১৮০৩ সাল।

প্রধান ফটকের সামনে এসে আবার থমকে দাঁড়াই। নহবৎখানাটির স্থাপত্যশৈলী মুগ্ধ করে আমাকে। কিন্তু বেশিক্ষণ সেদিকে তাকিয়ে থাকবার অবকাশ পাই না। সহসা শ্রী প্রশ্ন করে বসে, "মামু, এ বাড়িটার নাম হাওয়া মহল হলো কেন? হাওয়া মানে তো বাতাস!"

"এ বাড়ির ভেতরে পাখা ছাড়াই যে প্রচুর বাতাস পাওয়া যায়।" উত্তর দিই।

কিন্তু উত্তরটা খুশি করতে পারে না আমার সাত বছরের ভাগনীকে। তাই সে মন্তব্য করে, "তুমি বডড বোকা! পাখা ছাড়া কি কখনও হাওয়া হয়?"

না ভুল করে নি শ্রী। কলকাতার শিশু কেমন করে জানবে যে মাথার ওপরে পাখা না ঘুরলেও ঘরে বসে হাওয়া পাওয়া যেতে পারে। তবু তাকে বলি, "আগে বাড়িটার ভেতরে ঢুকে নাও, তাহলেই বুঝতে পারবে যে পাখা ছাড়াও হাওয়া পাওয়া যায়—প্রকৃতির হাওয়া।" আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে বলি, "ঐ যে জানলাগুলো দেখছ, ওগুলো এমনভাবে তৈরি যে এ বাড়ির প্রতিটি ঘরে সব সময় প্রচুর হাওয়া খেলে। গ্রীষ্মের দুপুরেও বসন্তের বাতাস পাওয়া যায়। আর তাই এ বাড়ির নাম হাওয়া-মহল।"

জয়পুরের আরেক নাম প্রাসাদ নগরী। নগরীর বিভিন্ন প্রাসাদ যে জায়গা জুড়ে রয়েছে, তার আয়তন প্রায় মূল-শহরের এক সপ্তমাংশ। হাওয়া-মহল থেকে বাস এলো ত্রিপোলি তোরণে। এটি নগর প্রাসাদ বা সিটি প্যালেসের দক্ষিণ প্রবেশতোরণ। প্রধান প্রবেশতোরণটি পূর্বদিকে, নাম শিরে-কি-দেউরী। প্রাসাদের চারিদিকে সুউচ্চ প্রচীর নাম সারহাদ। বিরাট অঞ্চল নিয়ে এই প্রাসাদ এলাকা।

ধীরে ধীরে বাস চলেছে। আমরা যতটা সম্ভব দু-দিকই দেখে নিচ্ছি। হঠাৎ তপন সামনের দিকে চলে এলো। ড্রাইভারের পেছনে দাঁড়িয়ে কোন রকম প্রস্তাবনা না করেই সে বলতে শুরু করল, "আমরা এখন সিটি প্যালেস চলেছি। সাতটি বড় বড় দেউড়ি পেরিয়ে আমাদের প্রধান

প্রসাদটির সামনে পৌঁছতে হবে। আপনারা সেখানে দেখতে পাবেন পাথরের ওপরে খোদি অপরূপ জয়পুরী শিল্পকলা।

"প্রধান প্রাসাদ থেকে আমরা যাবো দিওয়ান-ই-আম এবং দিওয়ান-ই-খাস দেখতে। রাজত্ব গিয়েছে, কাজেই দিওয়ান-ই-আম এখন আর মহারাজাদের আম-দরবার নয়, তাঁদের পুঁথিখানা বা গ্রন্থাগার। এটি বিশ্বের প্রাচীনতম গ্রন্থাগারগুলির অন্যতম। এখানে রয়েছে রাজস্থানী শিল্পকলার শ্রেষ্ঠ চিত্রসমূহ। রয়েছে মহারাজা জয় সিংহ কর্তৃক সংগৃহীত মানচিত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞানের বই এবং যন্ত্রপাতি। রয়েছে হিন্দু শিল্পশাস্ত্র, বিজ্ঞান, কলাবিদ্যা ও দর্শনের কিছু প্রাচীন পুঁথি এবং 'রাজ-নামা'-র পাণ্ডুলিপি।"

"রাজ-নামা কি ঘোষদা?" মাঝখান থেকে শঙ্করী আমাকে প্রশ্ন করে বসে।

উত্তর দিই, "মহাভারতের ফারসী অনুবাদ।"

"কে করেছেন?"

"মহামতি আকবরের সুযোগ্য সখা ও সভাসদ্ পণ্ডিত এবং ঐতিহাসিক আবুল ফজল।"

তপন কিন্তু বক্তৃতা বন্ধ করে নি, সে বলে চলেছে, "এই প্রাসাদ এলাকার মধ্যে আপনারা দেখতে পাবেন, ১৯০০ খ্রীস্টাব্দে মহারাজা মাধো সিংহ নির্মিত মুবারক-মহল বা অভ্যর্থনা-আলয়। এই বাড়িতেও আপনারা শ্বেতপাথরের ওপরে আশ্চর্য-সুন্দর খোদাই কাজ দেখতে পাবেন।"

"তারপরে দেখবেন রাজপুত স্থাপত্যকলার এ অপরূপ নিদর্শন চন্দ্রমহল—গোলাপী আভাযুক্ত শ্বেতপাথরে তৈরি সাততলা সুবিশাল প্রাসাদ। এটি দিওয়ান-ই-খাসের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। চন্দ্রমহলের প্রতিটি অলিন্দ রাজপুত চিত্রপটে সজ্জিত। ওখানেই রয়েছে মৌর্যচিত্রে শোভিত চন্দ্রমন্দির। রয়েছে শত শত রঙের আয়নায় সুসজ্জিত এবং হাজার হাজার রঙের প্রতিফলিত আলোকরশ্মিতে উদ্ভাসিত শোভানিবাস। রয়েছে প্রীত-মহল—শ্বেতপাথরে তৈরি মহারাজাদের শীতকালীন আবাস। ওখানে আপনারা রাজসিংহাসন সহ বহু দ্রষ্টব্য বস্তু দেখতে পাবেন।"

একবার থামে তপন, বোধহয় দম নিতে। কারণ আমরা কেউ কিছু বলতে পারার আগেই সে আবার শুরু করে, "এখানে আপনারা আরও অনেক দর্শনীয় স্থান দেখতে পাবেন। দেখবেন—রঙ্গ-মন্দির, সুখ-নিবাস, ছবি-নিবাস, শ্রী-নিবাস..."

শ্রীমতী শ্রী মৃদু হেসে আমার দিকে তাকায়।

আমি সহাস্যে বলি, "ভালই হলো, শ্রী আজ শ্রী-নিবাস দেখবে।"

শ্রী কোন কথা বলে না, শুধু হাসে।

তপন বলে চলেছে, শুনতে ভালই লাগছে আমার। ছেলেটা চোখ কান বুজে ম্যানেজারি করে না, চারিদিকে সজাগ নজর রাখে। আমি একটু গর্ববোধও করছি কারণ সে আমার প্রতিবেশী—ঢাকুরিয়ার অধিবাসী।

তপন বলছে, "তারপরে আমরা মুকুট-মহল দেখে শীলেখানা দেখব। মুকুট-মহলে রাজ্যাভিষেক উৎসব হতো। আর শীলেখানা মানে মহারাজাদের অস্ত্রাগার। চন্দ্রমহলের একাংশেই এই অস্ত্রাগার। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের নানা ঐতিহাসিক যুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত বহু অস্ত্রের সুবৃহৎ সংগ্রহশালা এই শীলেখানা। এখানে রয়েছে সম্রাট আকবরের দেওয়া

মহারাজা মান সিংহের সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ তরবারি, যার ওজন এগারো পাউন্ড।"

"তারপরে আমরা যাবো সিটি প্যালেসের পেছন দিকে, গোবিন্দজীর মন্দিরে।"

ঠাকুরমারা তাড়াতাড়ি কপালে হাত ঠেকান। না, তপনকে নয়, তাঁরা বোধহয় শ্রীরূপের শ্রীরাধাগোবিন্দকে প্রণাম করলেন।

।। চার ।।

শ্রীগৌরাঙ্গের আদেশে ভক্তিরসশাস্ত্র রচনা ও লুপ্ততীর্থ উদ্ধারের জন্য শ্রীরূপ গোস্বামী বৃন্দাবনে উপস্থিত হলেন। কিন্তু তাঁর পরম-বাঞ্ছিতের সাক্ষাৎ পেলেন না। তিনি 'হায় গোবিন্দ, হায় গোবিন্দ—হায় প্রাণনাথ তুমি কোথায়' বলে কাঁদতে কাঁদতে ব্রজের গ্রামে ও বনে ঘুরে বেড়াতে থাকলেন।

একদিন হঠাৎ এক অপূর্ব জ্যোতিসম্পন্ন ব্রজবাসী ব্রাহ্মণ তাঁর সামনে উপস্থিত হয়ে তাঁকে বললেন—ব্রহ্মকুণ্ডের কাছে গোমাটিলায় গিয়ে দেখো একটি গাভী এক জায়গায় দুগ্ধদান করছে, সেখানেই সর্ব ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্তা তোমার পরম-ঈপ্সিত শ্রীরাধাগোবিন্দ রয়েছেন।

শ্রীরূপের সেই বাঞ্ছিত বিগ্রহকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে গড়ে ওঠে বৃন্দাবনের গোবিন্দমন্দির। মহামতি আকবরের সক্রিয় সাহায্যে মহারাজা মানসিংহ সেই নয় চূড়াযুক্ত সাততলা মন্দিরটি তৈরি করে দেন। মন্দিরশীর্ষের আকাশ-প্রদীপটির আলো নাকি আগ্রাদুর্গ থেকে দেখা যেত।

সেই আলো আকবর দেখেছেন। দেখেছেন জাহাঙ্গীর ও শাজাহান। তাঁরা কেউ খুশি হয়েছেন, কেউ বা হন নি। কিন্তু কেউ ক্ষুব্ধ হন নি। ভেবেছেন—হিন্দু মন্দিরের আলো যদি মুসলমান সম্রাটের প্রাসাদ-অলিন্দ থেকে দেখাই যায়, তাতে ক্ষুব্ধ হবার কি আছে?

আছে বৈকি—ভাবলেন মহামতি আকবরেব ধর্মান্ধ প্রপৌত্র আওরঙ্গজেব। ভাবলেন—নামাজের পরে প্রতি সন্ধ্যায় আমাকে ঐ কাফেরদের মন্দিরের বাতি দেখতে হবে? অসম্ভব।

অতএব দিল্লীশ্বরের আদেশ হলো—মথুরা ও বৃন্দাবনের সব মন্দির ভেঙ্গে ফেলো, মূর্তিগুলো গুঁড়ো করো। তারপরে ঐ দুই নগরীর নতুন নাম রাখো, ইসলামাবাদ ও সেমিনাবাদ।

সম্রাটের আদেশ কার্যকর করতে সুযোগ্য সেনাপতি আবুন্নবি দিল্লী থেকে সসৈন্যে মথুরা রওনা হলেন।

তখন মুঘল দরবারে সর্বদাই জয়পুরের রাজপ্রতিনিধি উপস্থিত থাকতেন। সুতরাং খবরটা যথা সময়ে জয়পুরে এসে পৌঁছল।

কিছুমাত্র কালক্ষয় না করে মহারাজ জয় সিংহ কয়েকখানি রথ ও কয়েকশ' অশ্বারোহী সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বৃন্দাবনে ছুটলেন। আওরঙ্গজেবের সৈন্যরা মথুরার ধ্বংসলীলা শেষ করতে পারার আগেই তিনি বৃন্দাবনে পৌঁছলেন। গোবিন্দ, গোপীনাথ, মদনমোহন, রাধামাধব, রাধাদামোদর ও বৃন্দাদেবী প্রভৃতি তৎকালীন বৃন্দাবনের প্রায় সমস্ত প্রধান বিগ্রহ নিয়ে তিনি জয়পুরের পথে পা বাড়ালেন। কারণ জয় সিংহ জানতেন, বৃন্দাবনের বিগ্রহদের একবার রাজপুতানায় নিয়ে আসতে পারলে, আওরঙ্গজেবের সাধ্য হবে না তাঁদের কলুষিত করেন। বলা বাহুল্য জয় সিংহের সে অনুমান মিথ্যে হয় নি। বৃন্দাদেবীকে কাম্যবনে রেখে তিনি সমস্ত শ্রীবিগ্রহদের নিয়ে নির্বিঘ্নে জয়পুরে ফিরে আসতে পেরেছিলেন। আর তা পেরেছিলেন বলেই

আমি আজ গোবিন্দজীকে দর্শন করতে পারব। জয়পুরে নিয়ে এসে জয় সিংহ গোবিন্দজীকে যে মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, আমরা এখন সেই মন্দিরেই চলেছি।

হেঁটেই চলেছি, কারণ রাস্তা থাকলেও বড় বাসকে আর আগে যেতে দেওয়া হয় না। বাস থেমেছে সিটি প্যালেসের বহিরাঙ্গনে। দেবদারু ও অন্যান্য গাছে ছাওয়া সুশীতল ও সুবিরাট অঙ্গন। চারিদিকে চারটি তোরণ, বাকি সবটা জুড়েই সারি সারি দু'তলা ঘর। সব মিলিয়ে কয়েকশ' ঘর হবে। সেকালে প্রসাদরক্ষীদের ছিল, একালে সরকারি অফিস।

প্রসাদকে বাঁদিকে রেখে ডানদিকের তোরণটি পেরিয়ে আমরা বাঁধানো পথ ধরে এগিয়ে চলেছি। চলেছি প্রাসাদের পেছন দিকে।

পথের পাশে, ডানদিকে নির্মীয়মাণ কোটড়ীধাম—মহাসতী সাবিত্রীর মন্দির। দোল আসছে, মন্দিরটিকে কাগজের ফুল ও মালা দিয়ে সাজানো হয়েছে। বেশ ভিড়। মন্দিরের সামনে খোলা জায়গায় কিছু দোকান-পাট বসেছে—খাবার খেলনা বই বাসন ও পাথরের জিনিসপত্রের দোকান।

দোকান দেখেই দাদা ও শঙ্করী সেদিকে যেতে চায়। ওরা দুটি মুর্তি কিনবে। দাদা কিনবেন রাধাকৃষ্ণ আর শঙ্করী একটি নর্তকীর মূর্তি। দাদা বাড়ির ঠাকুরঘরের জন্য আর শঙ্করী তার কোন বন্ধুকে উপহার দেবে।

তপন তাদের বাধা দেয়। বলে, "এখানে নয়, অম্বর প্যালেসে যাবার পথে ভাল দোকান পড়বে।"

আবার একটি তোরণ পেরিয়ে এলাম। পরধর্মদ্বেষীদের হাত থেকে গোবিন্দজীকে রক্ষা করবার জন্যই বোধকরি মন্দিরটিকে এমন সুরক্ষিত করা হয়েছিল।

পথের দু'পাশে খানিকটা ফাঁকা জায়গা, তারপরেই সুউচ্চ প্রাচীর। ফাঁকা জায়গার একদিকে বসেছে সারি সারি ফুলের দোকান। সহযাত্রীরা অনেকেই রাধাগোবিন্দের জন্য মালা নিলেন।

পথের আরেকদিকে সারি বেঁধে ভিক্ষুকরা বসে আছে—অনেকেই অন্ধ, খঞ্জ কিংবা কুষ্ঠরোগী। কয়েকজন অর্ধনগ্ন সাধুকেও দেখতে পাচ্ছি। তাঁরাও তারস্বরে আমাদের করুণা প্রার্থনা করছেন।

কি করবেন? পেটের জ্বালা যে কঠিন জ্বালা। তাই রাজপ্রাসাদের পাশে দেবালয়ের দ্বারে বসেও তাঁরা পথের মানুষেরই করুণা প্রার্থনা করেছেন। আমার মতো ওঁরাও জানেন, ঐ প্রাসাদে এখনও কোটি কোটি টাকার সোনা-রূপা ও মণি-মানিক্য মজুদ রয়েছে কিন্তু সেগুলো ওঁদের কোন কাজে আসবে না।

স্বাভাবিক কারণেই শ্রীমতী শ্রীর নজর ছিল আকাশের দিকে—সেখানে যে অসংখ্য পায়রার আনাগোনা। সেকালে এই-সব তোরণে সৈন্য-সামন্ত থাকতেন। একালে তাঁদের প্রয়োজন গিয়েছে ফুরিয়ে। তাই কবুতরবাহিনী সেনাবাহিনীর জায়গা দখল করে নিয়েছে।

শ্রী কিন্তু তাতে মোটেই মর্মাহত হয় নি। আমার হাত ধরে সে আকাশের দিকে তাকিয়ে নিঃশঙ্ক চিত্তে পথ চলেছে। পূর্ণিমা মাঝে মাঝেই মনে করয়ে দিচ্ছে, "পড়ে যাবে কিন্তু!"

সে সাবধানবাণী তার কানে ঢুকছে বলে মনে হচ্ছে না আমার। কি করবে, শিশুরা যে পাখি বড়ই পছন্দ করে।

সহসা আমার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে শ্রী চিৎকার করে উঠল, "মামু, মামু, হনুমান!"

তাকিয়ে দেখি, সত্যি কয়েকটা হনুমান পাঁচিলের ওপরে ছুটোছুটি করছে। শুধু শ্রী নয়, বিউটি আর শঙ্করীও যেন বেশ কিছুটা বিস্মিত। ওদের বোধহয় খেয়াল নেই যে রাজস্থানীরা আজও নিজেদের শ্রীরামচন্দ্রের বংশধর বলে দাবি করেন। সুতরাং রাজস্থানের রাজধানীতে রামভক্ত হনুমান থাকবে না কেন?

যথারীতি পথের পাশে চানাওয়ালারা বসে আছে। পুণ্যার্থীরা অনেকেই চানা কিনে হনুমানদের সেবা করছেন। সুতরাং দাদাও কিনে ফেললেন কয়েক পয়সার চানা। শ্রী বিউটি এবং শঙ্করী তাই দিয়ে রামভক্তদের সেবা শেষ করার পরে আমরা আবার পথ চলা শুরু করি।

আমার সহাযাত্রীদের মধ্যে সরকারদা বৌদি ও একজন ঠাকুরমা ছাড়া আর কেউ নিয়মিত তিলকসেবা করেন না। কিন্তু এখানে দেখছি অনেক যাত্রী তিলকসেবা করে এসেছেন। এবং তাঁদের মধ্যে বহু বাঙালি রয়েছেন। থাকবেনই তো, রাধাগোবিন্দ যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পরমারাধ্য।

আরেকটি তোরণ পেরিয়ে আমরা মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত হলাম। মন্দির অবশ্য তোরণ থেকে অনেকটা দূরে। পাথর বাঁধানো পথ পেরিয়ে, একটি তেঁতুলগাছ ছাড়িয়ে আমরা মন্দিরের সামনে এলাম।

সামনে শ্বেতপাথরে বাঁধানো প্রশস্ত প্রাঙ্গণ। ওপরে রঙিন সামিয়ানা। ইতিমধ্যে বহু পুণ্যার্থী সমবেত হয়েছেন সেখানে। আমরাও মিশে যাই তাঁদের সঙ্গে। এখানে তো রাজা প্রজার, ধনী দরিদ্রের, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের কোন পার্থক্য নেই। এখানে সবাই সমান—সবাই রাধাগোবিন্দের দর্শনার্থী।

জনৈক ভক্ত তাঁর দলের লোকদের হিন্দী ভাগবত পড়ে শোনাচ্ছেন। একজন দাড়িওয়ালা বৃদ্ধ মন্দিরদ্বারের সোজাসুজি দাঁড়িয়ে বিড়বিড় করে কি যেন বলছেন আর মাঝে মাঝেই 'গোবিন্দভগবানজী কি জয়' বলে চিৎকার করে উঠছেন। পারিপার্শ্বিকতার প্রতি তাঁর কোন লক্ষ্য নেই। আমরা তাঁকে পাগল বললেও তিনি বোধহয় কোন প্রতিবাদ করবেন না।

কয়েকজন রাজস্থানী মহিলা গান গাইছেন। আমি ওঁদের ভাষা জানি না। কিন্তু এই সুরটি আমার সুপরিচিত। ভারতের বিভিন্ন তীর্থের দ্বারে দাঁড়িয়ে আমি ওঁদের এই সমবেত ভক্তিসঙ্গীত শুনেছি।

মন্দিরের মেঝে প্রায় আমার বুক সমান উঁচু। চতুষ্কোণ মন্দির, চারিপাশে বারান্দা। শ্বেতপাথরের মেঝে। সামনের দিকে কারুকার্যখচিত চারজোড়া সুদৃশ্য শ্বেতপাথরের গোলাকার স্তম্ভ। মন্দিরের দেওয়ালে ভারি সুন্দর সব খোদাই কাজ।

দরজা খোলা কিন্তু সামনে হলুদ রঙের পর্দা ঝুলছে। এখন দর্শন বন্ধ। বোধহয় গোবিন্দজীর ভোগ হচ্ছে।

সমবেত ভক্তমণ্ডলী যে পরম-মুহূর্তের প্রতীক্ষা করছিলেন, অবশেষে সেই শুভক্ষণটি সমাগত হলো—সহসা সামনের পর্দাটি সরে গেল। কোন এক অদৃশ্য শক্তির প্রভাবে চোখের পলকে চারিদিকে নেমে এলো এক মনোমুগ্ধকর স্তব্ধতা। আবালবৃদ্ধবনিতার দৃষ্টি নিবদ্ধ হলো সেই পরমসুন্দরের দিকে।

তারপরেই জনৈক পুলকিত পুণ্যার্থী ভক্তিবিনম্র কণ্ঠে কীর্তন শুরু করলেন—'গোবিন্দ জয় জয়, গোপাল জয় জয়।...'

কেউ কাউকে কোন অনুরোধ করলেন না, অথচ একে একে সকলেই তাঁর সঙ্গে গলা মেলালেন। জাতি ধর্ম ও ভাষা নির্বিশেষে সবাই সেই ভক্তিসঙ্গীতের শামিল হলেন। শতশত ভক্তের কণ্ঠে এখন শুধু একই জয়গান—গোবিন্দ জয় জয়, গোপাল জয় জয়...।

উমাদি বৌদি মা কিংবা ঠাকুরমাদের কথা বাদই দিলাম, শঙ্করী পূর্ণিমা বিউটি, এমন কি শ্রী পর্যন্ত তার মা-র সঙ্গে তাল মিলিয়ে হাততালি দিয়ে নিমীলিত নয়নে গেয়ে চলেছে—গোবিন্দ জয় জয়, গোপাল জয় জয়...

গর্ভমন্দিরের অধিকাংশ জায়গা জুড়েই কারুকার্যময় রুপোর সিংহাসন। ভেতরে দোলনায় শ্রীরাধাগোবিন্দের দণ্ডায়মান বিগ্রহ। এমন প্রাণময় মূর্তি এর আগে কখনও দেখি নি। বৃন্দাবন গোবিন্দমন্দিরের বর্তমান মূর্তিটি এঁরই প্রতিনিধি বিগ্রহ। অর্থাৎ এই মূর্তি দেখে সেটি তৈরি করা হয়েছে কিন্তু এঁর সঙ্গে তাঁর কোন তুলনাই চলে না।

রাধগোবিন্দের দিকে তাকানো মাত্র আমার মনের সকল মালিন্য মুছে গেল, হৃদয় ও মন এক অনির্বচনীয় আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। আমার জীবন সার্থক হলো, আমি ধন্য হলাম—শ্রীরূপ গোস্বামীর বাঞ্ছিত বিগ্রহ দর্শন করতে পারলাম।

মহারাজা জয় সিংহ! আমি আজ তোমাকেও প্রণাম করছি। তোমারই জন্য আজ আমার এই সৌভাগ্য হলো। তুমি সেদিন আওরঙ্গজেবের রক্তাক্ত হাত থেকে শুধু শ্রীবিগ্রহকে রক্ষা করো নি, রক্ষা করেছিলে ভারতের সনাতন ধর্ম ও শাশ্বত সংস্কৃতিকে। তুমি আমার সকৃতজ্ঞ চিত্তের সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করো।

রাধাগোবিন্দের পরনে মূল্যবান বস্ত্র ও অলঙ্কার। মাথায় মণিমাণিক্য খচিত স্বর্ণমুকুট। তাঁরা পুষ্পসজ্জিত দোলনায় দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে কৃপা-দৃষ্টিপাত করে আছেন। তাঁদের মাথার ওপরে রুপোর ছত্র, পায়ের কাছে দু'জন সেবারতা সখীর দুটি অপরূপ মূর্তি।

সিংহাসনের ওপরে সারা মন্দিরের উপরাংশ জুড়ে মখমলের চন্দ্রাতপ। ভক্তদের মালা ও ফুলে মন্দিরের মেঝে এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করেছে। চন্দনের গন্ধে চারিদিক আমোদিত।

প্রধান পুরোহিতের হাতে ঘণ্টা বেজে উঠল। বেজে উঠল কাঁসর ও কাড়া। শুরু হলো আরতি—রাধাগোবিন্দের নীরাজনা। আমরা তন্ময় হয়ে দর্শন করি। এমন পবিত্র ও মধুর লগ্ন জীবনে বেশী আসে না।

আরতি শেষ হলো। পুরোহিত জ্বলন্ত ঘিয়ের প্রদীপটি এনে রাখলেন মন্দিরের সামনে। আমি দু'হাতে সেই মধুর উত্তাপ গ্রহণ করে চোখে-মুখে ও মাথায় ঠেকাই।

পুরোহিত শান্তিজল বর্ষণ করেন। আমি নতমস্তকে সেই করুণাবারি গ্রহণ করি আর আমার মানসীর জন্য রাধাগোবিন্দের করুণা প্রার্থনা করি। মনে মনে বলি—ঠাকুর সে যে তোমরা সেবা না করে জলগ্রহণ করে না, তুমি তাকে শান্তি দাও।

আবার মন্দিরের পর্দা টেনে দেওয়া হলো। আজ দুপুরের মতো দর্শন শেষ। এবারে রাধাগোবিন্দ বিশ্রাম করবেন।

আমাদের বিশ্রামের অবকাশ নেই। প্রসাদ পেয়েই ছুটতে হবে বাসে, যেতে হবে অম্বর প্রাসাদে। সুতরাং সহযাত্রীদের সঙ্গে মন্দিরের পাশে প্রসাদ বিতরণ কেন্দ্রের সামনে এসে লাইন লাগাই।

এখানে পুজো দেবার নিয়মটি নিতান্তই আধুনিক। আমরা এখানে এসেই মন্দিরের অফিসে সাধ্যানুযায়ী টাকা জমা দিয়ে রসিদ নিয়ে নিয়েছি। এবারে সেই টিকেট দেখিয়ে প্রসাদ নিতে হবে।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই প্রসাদ পাওয়া গেল। বিস্মিত হলাম—এক টাকায় এতখানি প্রসাদ। শুধু পরিমাণ নয়, প্রসাদের উৎকর্ষতাও অবাক করল—খাঁটি ক্ষীরের প্যাঁড়া ও খাঁটি ঘিয়ের লাড্ডু, পেস্তা, বাদাম মেশানো! এমনটি আর কোথাও পেয়েছি বলে মনে পড়ছে না।

আমরা প্রায় সকলেই পুজো দিয়েছি কিন্তু উপস্থিত ভক্তমণ্ডলীর অনেকেই পুজো দিতে পারেন নি। হয় দেরিতে এসেছেন, না হয় সাধ্যে কুলোয় নি। তাঁদেরই কয়েকজন ঘিরে ধরেছেন সরকারদাকে। বলছেন—মহারাজ প্রসাদ দেও।

সরকারদা খানিকটা প্রসাদ বৌদির কাছে রেখে বাকিটা বিতরণ করতে আরম্ভ করলেন। একটু দূরে দাঁড়িয়ে আমরা দৃশ্যটাকে উপভোগ করছি।

সামান্য একটু করে প্রসাদই সরকারদা দিতে পারছেন সমবেত ভক্তদের হাতে কিন্তু সেটুকু পেয়েই তাঁদের চোখে-মুখে পরমতৃপ্তির আনন্দ উপচে পড়ছে। এ যে রাধাগোবিন্দজীর প্রসাদ, পরিমাণ দিয়ে তো এ প্রাপ্তির মূল্য বিচার করা যাবে না। এইটুকু পাবার জন্যই যে কত মানুষ কত দূর থেকে ছুটে এসেছেন এখানে।

হঠাৎ আমার নজর পড়ে হাত দু'খানির দিকে—সরকারদার সামনে পাশাপাশি প্রসারিত দু'খানি হাত। একখানি শীর্ণ-দুর্বল নিরাভরণা দরিদ্র যুবতীর, আরেকখানি শক্ত-সবল ধনী যুবকের। তার আংটির মূল্যবান মুক্তোর বিচ্ছুরিত আলোকরশ্মি সেই দরিদ্র যুবতীর মুখখানিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

সরকারদা সমান ভাবেই প্রসাদ দিলেন দুজনকে। দুজনেই সমান আগ্রহে সে প্রসাদ গ্রহণ করলেন। রাধাগোবিন্দের কাছে সে সবাই সমান। এখানে সবল ও দুর্বল কিংবা ধনী ও দরিদ্রের কোন পার্থক্য নেই।

গোবিন্দমন্দির থেকে যন্তর-মন্তরে এলাম। জয়পুরের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ মহারাজা সোয়াই জয় সিংহের এই মানমন্দির। মুবারক মহলের সামনে, প্রসাদ এলাকার বাইরে, বড় রাস্তার পাশে অবস্থিত। দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন একটি চিল্‌ড্রেন্‌স্ পার্ক।

জ্যোতির্বিজ্ঞানী জয় সিংহের অবিস্মরণীয় কীর্তি এই মানমন্দির। জয় সিংহ সূর্যসিদ্ধান্ত ও আরবীয় জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুসারে গবেষণা করতেন তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞানের কয়েকখানি আরবী গ্রন্থ সংস্কৃতে অনুবাদ করেন। তার মধ্যে 'জিরে-ই-মহম্মদ'য়ের অনুবাদ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। মূল-পুঁথিখানি আমরা কিছুক্ষণ আগে পুঁথিখানায় দেখে এসেছি।

বাস থেকে নেমেই লোহার গেট ঠেলে শ্রী ছুটল যন্তর-মন্তরে। বাধ্য হয়ে আমাকেও ছুটতে হলো তার পেছনে। সামন্তবাবুর ছেলেরা আমাদের সঙ্গী হয়। দাদা আর শঙ্করীও ছেলেমানুষীর সামিল হয়েছে।

দিল্লীর চেয়ে বিষয়ে ও বিরাটত্বে বৃহত্তর এই যন্তর-মন্তর। শ্রীর পেছনে আমরা সর্বোচ্চ যন্ত্রটির ওপরে উঠে আসি। এখান থেকে চারিপাশের জয়পুর এবং দূরের অম্বরদুর্গকে ছবির

মতো মনে হচ্ছে।

সহযাত্রীদের অধিকাংশই নিচে ঘোরাঘুরি করছেন। কেবল সাহাবাবু বিউটি সেজদি ও ঠাকুরমারা একটি অপেক্ষাকৃত নিচু যন্ত্রের ওপরে উঠেছেন।

শ্রী এখান থেকেই মাসি ও দিদিকে ডাকাডাকি করছে। হাত নেড়ে তাদের এখানে আসতে বলছে। বিউটি হাত নেড়ে না করছে। বোধহয় বলছে—আমরা অত উঁচুতে উঠতে পারব না। ঠিকমত শোনা যাচ্ছে না। এখানে যে প্রবল বাতাস বইছে।

শ্রী তবু খিলখিল করে হেসে উঠছে।

কিন্তু তার মাকে দেখছি না তো! না, ঐ যে ওখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে। একা একা পায়চারি করছে। পূর্ণিমা তো এখন একা কখনও থাকে না। সে খুব স্ফূর্তিবাজ। অমন গম্ভীর হয়ে আছে কেন? ওর কি কোন অসুখ বিসুখ করেছে?

নিচে নেমে যন্তর-মন্তর প্রদক্ষিণ করতে থাকি। কোন যন্ত্রের গায়ে লেখা রয়েছে—'Difference of time.' কোনটিতে লেখা—'Altitude of the Sun at noon.' কোনটিতে বা 'Declination of the Sun at noon'

জানি বিচিত্র আকারের এই পাথরের বস্তুগুলি পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের পর্যন্ত শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। তাঁরা সংক্ষেপে এই মানমন্দিরকে বলেছেন—'A logical landscape in Stone.' কিন্তু আমি যে কিছুই বুঝতে পারছি না। এবং এ অবস্থা আমার সহযাত্রীদের সকলেরই। বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা, বিশেষ করে ঠাকুরমারা রীতিমত বিরক্ত। বড়ঠাকুরমা তো তপনকে জিজ্ঞেস করেই বসলেন, 'এয়া তুমি আমাগো কি দেহাইতে লইয়া আইলা রে মণি? মায়ের বাড়ি কহন যাবা?"

মৃদু হেসে তপন সবিনয়ে বলে, "এই তো ঠাকুরমা, এখান থেকেই আমরা সোজা অম্বর প্রাসাদে যাবো, সেখানেই যশোরেশ্বরীর মন্দির।" একবার থেমে সে আবার বলে, "আপনার যখন এটা ভাল লাগছে না, তখন অযথা রোদে না ঘুরে বাসে গিয়ে বসুন। আমরা একটু বাদেই আসছি।"

"হেইয়াই ভাল। লয়েন দিদি আমরা বাসে যাই।" দ্বিতীয় ঠাকুরমা তপনের প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

তৃতীয়া বলেন, "তমরা তাড়াতাড়ি আইও কিন্তু।"

"হ্যাঁ, ঠাকুরমা আমরা একটু বাদেই আসছি।" তপন তাঁদের আশ্বস্ত করে। ঠাকুরমারা চলে যান।

তারপরে তপন আমাকে বলে, "ঘোষদা গাইড না নিলে এখানে কিছুই বুঝতে পারবেন না। একজন গাইড নেবো কি? চার্জটা আপনারা যে ক'জন আছেন, সমান ভাবে ভাগ করে দিয়ে দেবেন।"

"আমার কোন আপত্তি নেই।"

কিন্তু গাইড ঠিক করার পরে দেখা গেল, অনেকেরই আপত্তি আছে। কিন্তু তাঁদের আপত্তি নাকচ করে দিলেন সত্যেনদা। তিনি বললেন, "চার্জের জন্য তুমি ভেবো না তপন, ওটা আমরা যারা interested, তারাই দিয়ে দেব।"

গাইডের সঙ্গে দ্বিতীয়বার যন্তর-মন্তর দেখা শুরু করি। গাইড বলে চলেন, "আপনারা জানেন এটি একটি মানমন্দির। এখানে জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক তেরোটি নির্ভুল যন্ত্র আছে। এটি

হলো এক নম্বর যন্ত্র— 'সূর্যঘড়ি' বা 'নারোল'। এতে দিনের .বং য সময় জানা যায়। এটি প্রায় চৌদ্দ ফুট লম্বা।"

তারপরে আমরা আসি 'ধ্রুবনল' বা উত্তরমেরু কেন্দ্র দর্শন যন্ত্রে। সেখান থেকে 'রাজযন্ত্রে'। গাইড বলেন, "এখানে যে উজ্জ্বল ধাতুর দু'খানা বিরাটকায় পাত দেখতে পাচ্ছেন, এদের ওপরে নিখুঁতভাবে গ্রহাদির ছবি প্রতিবিম্বিত হয়।"

সূর্যের ছায়ার সঠিক প্রতিবিম্বের প্রতিফলন যন্ত্র 'নারী' দেখে আমরা আসি 'করযন্ত্রে'। এটি বিষুবমণ্ডলের অবস্থিতি নিরূপণের যন্ত্র।

তারপরে গ্রহনক্ষত্রাদির দূরত্ব পরিমাপের যন্ত্র 'ভট্রি' দেখে আমরা 'সম্রাট' ও 'রাশিযন্ত্র' দেখলাম। সম্রাটযন্ত্রটি প্রায় সত্তর ফুট লম্বা। এটি দিয়ে নির্ভুলভাবে আন্তর্জাতিক সময় নিরূপণ করা যায়। রাশিযন্ত্রের সাহায্যে রাশিসমূহের সঠিক অবস্থান ও দূরত্ব নির্ণয় করা হতো।

'জয়প্রকাশযন্ত্র' বা 'সামলা'র সামনে এসে থমকে দাঁড়াতে হলো। এটি অনেকগুলি যন্ত্রের সমষ্টি। গাইড বললেন, এই সব যন্ত্রের সাহায্যে সেকালে মহাকাশ গবেষণা করা হতো।

'কাপটিযন্ত্র' ও 'চক্রযন্ত্র' দেখে আমরা এলাম 'রামযন্ত্র' বা 'রামকৃষ্ণযন্ত্রের' সামনে। কাপটি ও চক্র দিয়ে ছায়াপথ এবং গ্রহনক্ষত্রাদির অবিস্থিতি ও গতিপথের কথা জানা যেত। রামকৃষ্ণ সূর্যের গতিপথ ও ছায়ার সঠিক নির্দেশ দিতে পারে।

অবশেষে এলাম 'দিগ-অংশযন্ত্রে'। গাইড বললেন, এটি জয় সিংহকে দুরূহ এবং জটিল জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণায় বিশেষ সাহায্য করত।

যন্তর-মন্তর দেখে ফিরে আসি বাসে। বাস এগিয়ে চলে দুর্গনগরী অম্বরের দিকে। সহযাত্রীরা প্রায় সকলেই উৎসুক আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। কখন তাঁরা পৌঁছবেন সেই ইতিহাস প্রসিদ্ধ প্রাচীন নগরীতে, দর্শন করবেন মহারাজা প্রতাপাদিত্যের ইষ্টদেবী যশোরেশ্বরীকে।

কিন্তু আমি ভাবছি আরেকজনের কথা—মহারাজা জয় সিংহের কথা। কি অসাধারণ বিদ্যোৎসাহী এবং দুরদৃষ্টিসম্পন্ন নরপতি ছিলেন তিনি! অথচ তাঁর অযোগ্য উত্তর পুরুষদের অক্ষমতার জন্য আমরা পরবর্তীকালে অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছি।

হঠাৎ নজর পড়ে পূর্ণিমার দিকে। তাই তো, সে যে এখনও তেমনি গম্ভীর হয়ে আছে। লেখাপড়া জানা হাসিখুশি ও অমায়িক মেয়ে, শিক্ষিত এবং অভিজাত পরিবারের বউ। সে হঠাৎ এমন গম্ভীর হয়ে গেল কেন? পরিচয় হবার পর থেকে তো তাকে কখনও চুপচাপ দেখি নি! তাহলে ওর নিশ্চয়ই অসুখ করেছে?

সেই কথাই জিজ্ঞেস করি পূর্ণিমাকে। সে একটু করুণ হেসে উত্তর দেয়, "না, ঘোষদা, শরীর ভালই আছে, তবে মনটা ভাল নেই।"

"কেন বল তো?"

পূর্ণিমা কোন উত্তব দেয় না। সে শুধু শঙ্করীর দিকে তাকায়।

শঙ্করী আমার দিকে ফিরে বলে, "ওর ব্যাগ থেকে টাকা চুরি গিয়েছে।"

"চুরি গিয়েছে! কত টাকা?"

"ঠিক বলতে পারব না, গোনা ছিল না।" এবারে পূর্ণিমা কথা বলে, "তবে শ'দেড়েক তো হবেই।"

"দেড় শো!" একটু থেমে প্রশ্ন করি, "কোথায় বসে চুরি হলো?"

"গোবিন্দমন্দিরে।"

"গোবিন্দমন্দিরে!"

'হ্যাঁ ঘোষদা, গোবিন্দমন্দিরে। আরতির সময়ে আমি চোখ বুজে তন্ময় চিত্তে গান গাইছিলাম, ব্যাগটা কাঁধে ঝোলানো ছিল। আরতি শেষ হবার পরে দেখি, ব্যাগ খোলা, টাকাগুলো নেই।"

বিস্ময়কর! প্রকাশ্য দিবালোকে এতগুলো মানুষের সামনে এ কেমন করে সম্ভব হলো? ভিড়ও তো এমন কিছু নয়। অন্তত কাশী কিংবা কালীঘাট মন্দিরের মতো নয়। তাছাড়া খোলা জায়গা। আমিও যে ওদের পেছনেই দাঁড়িয়েছিলাম।

তবে আমরা হয় চোখ বুজে গান শুনছিলাম, না হয় অপলক নয়নে রাধা গোবিন্দকে দর্শন করছিলাম। চোর আমাদের সেই অন্যমনস্কতার সুযোগ নিয়েছে।

পূর্ণিমা আবার বলে, 'ঘোষদা, আপনার শুভেচ্ছায় টাকার অঙ্কটা আমার কাছে বেশি নয়। কিন্তু আমি কষ্ট পাচ্ছি তাঁরা আমাকে এতবড় একটা আঘাত দিলেন।"

আমি ওকে সান্ত্বনা দিই। বলি, "ভাল আর মন্দ মিলিয়েই জগৎ। রাজস্থানে যেমন ভাল মানুষ আছেন তেমনি কিছু খারাপ মানুষও এখানে থাকতে পারে। তাছাড়া তোমার টাকাটা যে কোন রাজস্থানী চুরি করেছে, তারই বা প্রমাণ কোথায়? চোরটা তো ভিনদেশী লোকও হতে পারে!"

।। পাঁচ।।

জয়পুরের ১১ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ২৬°৫৯ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৭৫°৫১ পূর্বদ্রাঘিমার অবস্থিত দুর্গনগরী অম্বর, এই রাজ্যের প্রাক্তন রাজধানী। আমরা জয়পুর থেকে দিল্লী রোড ধরে অম্বর চলেছি। মনে হয় এত মসৃণ এবং প্রশস্ত না হলেও, এ পথটি সেকালেও ছিল। অম্বররাজ মান সিংহ এই পথ দিয়েই দিল্লী যাওয়া-আসা করতেন। আর আজ আমি চলেছি সেই পথে। দিল্লী নয়, চলেছি অম্বরে—অম্বররাজ মান সিংহের রাজপ্রাসাদে।

"আচ্ছা মামু! অম্বর নামটি কেন হলো? এর কি কোন বিশেষ কারণ আছে?"

আমার কলেজে পড়া ষোড়শী ভাগনীর প্রশ্নে পথ থেকে চোখ সরিয়ে আনতে হয়। বিউটির দিকে তাকিয়ে জবাব দিই, "শুনেছি, অম্বর নামটি এসেছে শিবের অম্বিকেশ্বর নাম থেকে। কথিত আছে অম্বরিশ নামে অযোধ্যার জনৈক রাজা এই শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। আবার অনেক বলেন দ্বাদশ শতাব্দীতে জয়পুরের মহারাজাদের আদিপুরুষ দুল্হা রায়ের বংশধরগণ মীনাদের পরাজিত করে এই দুর্গ অধিকার করেন। তাঁরা এখানে তাঁদের ইষ্টদেবী অম্বা বা ভগবতীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই থেকেই এই দুর্গনগরীর নাম হয়েছে অম্বর।

"অনেকের ধারণা অম্বর একাদশ শতাব্দীর জনপদ। কিন্তু তা সত্য নয়। দুর্গনগরীতে বহু পুরাকীর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে, যা থেকে মনে হয় ষষ্ঠ শতাব্দী থেকেই ওখানে জনবসতি ছিল। আবিষ্কৃত পুরাকীর্তিগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ৯৫৪ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত সূর্যমন্দিরের একটি স্তম্ভ। সূর্যমন্দিরটি সম্ভবত শাশ্বত মীনা সম্প্রদায়ের রাজারা নির্মাণ করেছিলেন। তুমি তো জানো যে মীনা এবং ভীলরাই রাজপুতনার আদি অধিবাসী?"

বিউটি মাথা নাড়ে। আমি বলতে থাকি "অম্বরকে কেন্দ্র করে মীনারা এখানে যে রাজ্য গড়ে

তুলেছিলেন, তার নাম ছিল ধুন্ধর। প্রকৃতপক্ষে সেই রাজ্যই পরবর্তীকালে জয়পুর নামে পরিচিত হয়েছে।"

আমি থামতেই বিউটি আমায় জিজ্ঞেস করে, "কি রায় যেন বললেন মামু?"

সহাস্যে উত্তর দিই, "দুল্হা রায়।"

"হ্যাঁ। তার কথা তো বললেন না?"

অতএব আমাকে আবার আরম্ভ করতে হয়, "জয়পুরের মহারাজারা সূর্য বংশীয় কাছাওয়া রাজপুত। তাঁরা নিজেদের শ্রীরামচন্দ্রের দ্বিতীয় পুত্র কুশের বংশধর বলে দাবি করেন। তাঁদের অতীত ইতিহাস মোটেই সুস্পষ্ট নয়। শুধু জানা যায় যে খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতকে তাঁরা শোন্ নদীর তীরে রোতাস নগরে বসতি স্থাপন করেছিলেন। পরে সেখান থেকে গোয়ালিয়রের নারাওয়ারে যান। কাছাওয়ারা সেখানে প্রায় ৮০০ বছর রাজত্ব করেন।

"কাছাওয়া রাজবংশের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে প্রথম যে রাজার নাম পাওয়া যায়, তিনি হলেন বজ্রদমন। গোয়ালিয়রের একটি শিলালিপি থেকে জানা গিয়েছে যে তিনি ৯৭৭ খ্রীস্টাব্দে কনৌজের শাসককে পরাজিত করে গোয়ালিয়র অধিকার করেন এবং নিজেকে স্বাধীন নরপতিরূপে ঘোষণা করেন।

"বজ্রদমনের অষ্টম বংশধর হলেন তেজকরণ বা দুল্হা রায়। দুল্হা রায় শব্দ দুটির অর্থ জামাতা রাজপুত্র। তিনি ১১২৮ খ্রীস্টাব্দে গোয়ালিয়র ত্যাগ করে ধুন্ধরে আসেন। অনেকের মতে তাঁর বাবার অর্থাৎ কুশের তেত্রিশতম বংশধর সোধা সিংহের অকালমৃত্যুর পরে তাঁর কাকা তাঁকে তাড়িয়ে দেন। আবার অনেকে বলেন যে তিনি মোরাণরাজ চৌহানের মেয়ে মারুণীকে ভালোবাসতেন। মারুণীর জন্যই তিনি নিজেই রাজ্য ভাগনেকে দিয়ে গোয়ালিয়র ছেড়ে এদেশে চলে এসেছিলেন। মারুণী নাকি ছিলেন অসাধারণ সুন্দরী। তাঁদের প্রেমগাথা আজও জয়পুরের ঘরে ঘরে গীত হয়।

"দু'দলই কিন্তু একথা স্বীকার করেন যে মারুণীকে বিয়ে করে পুত্রহীন শ্বশুরের কাছ থেকে দুল্হা বর্তমান জয়পুরের ৫০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত দোসা পরগণা যৌতুক পেয়েছিলেন। এবং পরবর্তীকালে পূর্বে রাজপুতণার কাছাওয়া রাজ্য এই দোসাকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে।

"আনুমানিক ১১৫০ খ্রীস্টাব্দে দুল্হার বংশধরগণ শাশ্বত মীনাদের কাছ থেকে অম্বর অধিকার করে সেখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তারপর থেকে প্রায় ছ'শ বছর অম্বরেই রাজ্যের রাজধানী ছিল।

"দুল্হা রায়ের চতুর্থ কিংবা পঞ্চম পুরুষের বংশধর পূজন দিল্লীর শেষ হিন্দু সম্রাট পৃথ্বীরাজ চৌহানের বোনকে বিয়ে করেছিলেন এবং ১১৯২ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর সঙ্গে যুদ্ধে তিনিও নিহিত হন।

"১৫৪৮ খ্রীস্টাব্দে বিহারমল্ল অম্বরের সিংহাসনে বসেন। তখন শেরশাহের রাজত্বকাল। কিন্তু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজা পাঠানদের সঙ্গে কোন প্রীতির সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করলেন না। শেরশাহের মৃত্যুর পরে ১৫৫৫ সালের জুলাই মাসে হুমায়ুন আবার দিল্লী অধিকার করলেন। ১৫৫৬ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি আকবর সিংহাসনে বসলেন কিন্তু বিহারমল্ল আরও কিছুদিন অপেক্ষা করলেন। অবশেষে ১৫৬১ সালে আকবর যখন আজমীর খাজা মুইন-উদ্-দিন চিস্তির

সমাধি দর্শন করতে এলেন, বিহারমল্ল তখন পুত্র ভগবান দাস ও পৌত্র মান সিংহকে সঙ্গে করে সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। আর সেদিন থেকেই অম্বরের সঙ্গে দিল্লীর সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হলো।"

"মান সিংহ তো ভগবান দাসের ছেলে না ঘোষদা?" আমি থামতেই সামনের সিট থেকে শঙ্করী জিজ্ঞেস করে।

"হ্যাঁ," আমি উত্তর দিই, "তবে পালিত পুত্র। মান সিংহ ভগবান দাসের ছোটভাই জগৎ সিংহের ছেলে। তিনি ১৬০০ সালে অম্বরকে একটি দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করার কাজ শুরু করেন আর সে কাজ শেষ করেন সোয়াই জয় সিংহ প্রায় ১০০ বছর পরে। যদিও তিনিই জয়পুরের পত্তন করে ১৭২৮ খ্রীস্টাব্দে এখান থেকে রাজধানী সরিয়ে নিয়ে যান।..."

"কিন্তু আর গল্প নয় ভাই, আমরা অম্বরে পৌঁছে গিয়েছি।"

সত্যেনদার কথায় থামতে হয় আমাকে। তাকিয়ে দেখি সত্যি বাস বড় রাস্তা থেকে নেমে এসেছে প্রশস্ত প্রান্তরে। দুটি গোড়া বাঁধানো বটগাছ, কয়েকটি চা, খাবার পাথরের জিনিসপত্র ও অন্যান্য কুটির শিল্পের দোকান রয়েছে এখানে। কয়েকখানি স্কুটার রিক্সা ট্যাক্সি ও বাস দাঁড়িয়ে আছে, একজোড়া সাহেব-মেম সহ বহু দর্শনার্থী ঘোরাঘুরি করছেন।

বাস থেকে নেমে পড়ি। সামনেই পাহাড়ের ওপরে অম্বরদুর্গ। পাহাড়টির প্রায় সারা দক্ষিণ ও পুবদিক জুড়ে জলাশয়—মাওটা হ্রদ। দুর্গের অবস্থানটি যেমন নিরাপদ, তেমনি মনোরম।

তপনের নির্দেশে আমরা তাকে ঘিরে ধরি। তপন বলতে থাকে "আমরা এখন অম্বরদুর্গ দেখতে যাবো। ১০৯ ধাপ সিঁড়ি এবং অনেকটা চড়াই পথ বেয়ে ঐ পাহাড়ের ওপরে উঠতে হবে। অম্বরদুর্গের উচ্চতা সমুদ্রসমতা থেকে প্রায় পাঁচশ' ফুট। যাঁরা পায়ে হেঁটে উঠতে পারবেন না, তাঁরা ইচ্ছে করলে হাতির পিঠে চড়ে ওপরে যেতে পারেন। প্রতি চারজনের যাওয়া-আসার জন্য চল্লিশ টাকার মতো খরচ পড়বে। হাতির পিঠে বসে যেমন অম্বরের মনোরম দৃশ্য দেখা যায়, তেমনি শোনা যায় বাঁশি—জনপ্রিয় হিন্দীগানের সুর। হাতিতে মাহুতের সঙ্গে একজন বাঁশিবাদক থাকে।

"আমরা দুর্গ দেখতে এসেছি কিন্তু অম্বর কেবল একটি দুর্ভেদ্য দুর্গ নয়, একাদশ শতাব্দী থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিক অবধি অম্বর এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। সেকালে এই পাহাড়ের পাদদেশে এক সমৃদ্ধ নগরী ছিল। জয়পুরের পত্তন হবার পর থেকে ধীরে ধীরে সেই নগরী জনহীন হয়ে পড়েছে। কিন্তু জগৎ শিরোমণি মন্দিরটি আজও অম্বর নগরীর সেই গৌরবময় যুগের সাক্ষী হয়ে আছে।

"অম্বরদুর্গে আপনারা হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যকলার এক আশ্চর্য এক আশ্চর্য সংমিশ্রণ দেখতে পাবেন। দেখতে পাবেন যশোরেশ্বরীর মন্দির, দিওয়ান-ই-আম, দিওয়ান-ই-খাস, শীশ-মহল, সুখ-মন্দির ও সোহাগ-মন্দির। দেখবেন শ্বেত পাথরের আশ্চর্য-সুন্দর জালির কাজ।" একবার থামে তপন। তারপরে বলে, "এবার চলুন রওনা দেওয়া যাক।"

পথ চলা শুরু করি। চলতে চলতে শ্রী জিজ্ঞেস করে, "ও মামু আমরা ক'টা দিওয়ান-ই-খাস আর আম দেখব গো? দিল্লীতে দেখলাম, আগ্রাতে দেখলাম, জয়পুরে দেখলাম, আবার এখানেও দেখব?"

"হ্যাঁ। তবে এর পরে আর বোধহয় দেখতে পাবে না।"

"কেন পাবো না মামু?"

"সে-সব জায়গার রাজারা যে বানান নি।"

"কেন বানান নি?"

"শ্রী! তুমি মামুকে বড্ড জ্বালাতন করছ! বক্‌বক্‌ না করে তাড়াতাড়ি পা চালাও দেখি।"

পূর্ণিমার ধমক খেয়ে শ্রী জোরে পা ফেলতে শুরু করে। কি জানি পূর্ণিমা হয়তো বুঝতে পেরেছিল, শ্রীর শেষ প্রশ্নটির উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে কঠিন হবে। তাই সে দাদার মান বাঁচাতে মেয়েকে ধমক লাগিয়েছে।

পথ পেরিয়েই দুপাশে দিলারাম বাগ ও মোহন বাগ। শুনেছি সেকালের দুই প্রখ্যাত স্থপতির নামে এই বাগিচা দুটি উৎসর্গীকৃত।

বাগিচার পরে শুরু হলো সিঁড়ি। অম্বরে উঠবার দুটি পথ—একটি এই সিঁড়ি বেয়ে সংক্ষিপ্ত পথে, আরেকটি দীর্ঘতর চড়াই পথ পেরিয়ে। সেই পথ বেয়েই সেকালে হাতি-ঘোড়া ওপরে উঠত। একালে শুধু হাতি যাওয়া-আসা করছে—সৈন্য-সামন্ত নয়, দর্শনার্থী নিয়ে।

উকিলবাবু ও তাঁর স্ত্রী ছাড়া আমার সহযাত্রীরা সবাই এক পথে এসেছেন। উকিলবাবুর স্ত্রীর পক্ষে শতাধিক খাড়া সিঁড়ি ভাঙা সম্ভব নয়। তাই বলে তাঁরা ঐরাবতের সওয়ার হন নি। বটের ছায়ায় বিশ্রাম নিচ্ছেন।

একসঙ্গে এতগুলো সিঁড়ি ভাঙা সহজসাধ্য নয়। তার ওপরে আমার সহযাত্রীরা অধিকাংশই প্রবীণ। ফলে তাঁরা খুবই ধীরে ধীরে উঠছেন, মাঝে মাঝেই বিশ্রাম নিচ্ছেন।

শ্রী কিন্তু এখনও বিশ্রামের কথা বলে নি। সে আমার সঙ্গে সমান তালে সিঁড়ি ভাঙছে। ঠাকুরমাদের সম্পর্কেও প্রায় একই কথা বলা চলে। তাঁরাও নামমাত্র বিশ্রাম নিয়েছেন। মা সত্যেনদার সঙ্গে ধীরে ধীরে আসছেন। মাসিমা মানে শঙ্করীর মা-কে নিয়ে আসছে তপন। সাহাবাবু যথারীতি ছাতা মেলে ধীরে ধীরে উঠছেন। সেজদি বিউটি ও দাদা তার সঙ্গে রয়েছেন। বৌদির বেশ কষ্ট হচ্ছে বুঝতে পারছি, তাহলেও তিনি আস্তে আস্তে সরকারদার সঙ্গে আসছেন।

সিঁড়ির শেষ ধাপটি পেরিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। এখানে এক টুকরো সমতল জায়গা রয়েছে। একদিকে ওপরে উঠবার চড়াই পথ, আরেকদিকে রূপার পাতে মোড়া মন্দিরদ্বার,—শিলামাতার মন্দির, আমরা বলি যশোরেশ্বরী। বছরে প্রায় এককোটি মানুষ এই মন্দির দর্শন করেন।

যশোরেশ্বরী অম্বররাজবংশের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। আজও রাজপরিবারের লোকেরা যে কোন শুভকাজে যাবার সময় যশোরেশ্বরীর মন্দিরে আসেন। খুবই মজার ব্যাপার যে বর্তমান রাজপরিবারের 'আলট্রা-মডার্ন অ্যারিস্টোক্রাট্‌রা রোল্‌স-রয়েস ডিলুক্স' চেপে এখানে এসে যশোরেশ্বরীর করুণা ভিক্ষা করে যান।

একটু বিশ্রাম করে মন্দিরে প্রবেশ করি। দ্বারে দু'জন বন্দুকধারী প্রহরী। শ্বেতপাথরের মন্দির—অপরূপ খোদাই কাজ সর্বত্র। বিশেষ করে সামনে সবুজ পাথরের কলাগাছ কয়টি।

মন্দিরটি দুটি অংশ বিভক্ত—নাটমন্দির ও গর্ভমন্দির। নাটমন্দিরে ঘণ্টা ঝুলছে। গর্ভমন্দিরে শ্বেতপাথরের সিংহাসনে মা যশোরেশ্বরী—উজ্জ্বল কালো পাথরের মূর্তি। গলায় জবাফুলের মালা। দেবী অষ্টভুজা—মহিষমর্দিনী। কোমর থেকে পা পর্যন্ত লাল ঘাগরায় ঢাকা। শুনেছি তাঁর পায়ের কাছে সিংহ প্রভৃতির মূর্তি রয়েছে কিন্তু ঘাগরার জন্য দেখা যাচ্ছে না। বাঁদিকের তিনখানি

হাতে ঢাল ধনুক এবং মহিষাসুরের জিহ্বা। অপর হাতখানিতে সম্ভবত চক্র ছিল, এখন শূন্য। ডানদিকের তিনখানি হাতে খড়গ তীর ও ত্রিশূল। অপর হাতখানিতে কি আছে ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

দেবীর মাথার ওপরে, পেছন দিকে, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এবং কার্তিকের মূর্তি। দেবীর মুখখানি একটু বাঁদিকে বেঁকে আছে। অনেকে বলেন প্রতাপাদিত্যের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েই তিনি মুখ ফিরিয়েছিলেন। আবার কেউ বা বলেন মান সিংহের সময়ে এখানে নাকি প্রত্যহ নরবলি দেওয়া হতো। কিছুকাল পরে সেই কু-প্রথা রহিত করা হয়। আর তারপরেই দেবী মুখ ফিরিয়ে নেন। মহারাজা জয় সিংহ একদিন স্বপ্নে এই কথা জানতে পেরে আবার বলির প্রচলন করেন। নরবলি নয়, পাঁঠাবলি।

নাটমন্দিরের সামনে মন্দির চত্বরে একফালি চতুষ্কোণ জায়গায় বালি বিছানো রয়েছে। বালিতে রক্তের দাগও দেখতে পাচ্ছি। শুনেছি দেবীর সামনে উৎসর্গ করার পরে ছাগশিশু নাকি নিজের থেকেই এখানে এসে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে। তখন রাজপুত-তরোয়াল দিয়ে সেই অবস্থায় তাকে বলি দেওয়া হয়। জানি না মান সিংহের আমলে এখানেই নরবলি দেওয়া হতো কি না, তবে এখনও প্রতিদিন ভোরে পাঁঠাবলি হয়।

মান সিংহের আমলে নরবলি না হলেও পাঁঠাবলি যে দেওয়া হতো তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি শাক্ত হবেন, এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু ভাবলে অবাক হতে হয়—যিনি নিজের প্রাসাদে যশোরেশ্বরীকে প্রতিষ্ঠিত করে বলির ব্যবস্থা করছেন, তিনিই আবার বৃন্দাবনে গিয়ে রূপ-সনাতনের পদধূলি নিচ্ছেন, গোবিন্দমন্দির নির্মাণ করে দিচ্ছেন।

তবে প্রতাপাদিত্যের পতনের পরে মান সিংহ তাঁর ইষ্টদেবীকে অম্বরে নিয়ে এসে নিজের অজান্তেই একটি মহৎ উপকার করে গিয়েছেন। তিনি যশোরেশ্বরীর যে পূজার ব্যবস্থা করে গিয়েছিলেন, আজও তা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হচ্ছে। মান সিংহ তখন বাংলা থেকে পুরোহিতকে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁরই বংশধরগণ এতকাল যশোরেশ্বরীর পুজো করেছেন। ঐ বংশেরই স্থপতি বিদ্যাধর ভট্টাচার্য জয় সিংহের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু শুনেছি, বছরখানেক আগে প্রাক্তন পুরোহিত প্রকাশ ভট্টাচার্য অবসর নেবার পর থেকে দ্বারভাঙ্গার জনৈক ভোগেন্দ্র ঝা এই মন্দিরের পৌরোহিত্য করছেন। কি কারণে তিনি এই অধিকার পেলেন, চেষ্টা করেও তা জানতে পারলাম না।

সেদিন মান সিংহ যশোরেশ্বরীকে জয়পুরে না নিয়ে এলে, হয়তো আমার জীবনে তাঁকে দর্শন করা সম্ভব হতো না। কারণ পাকিস্তানী আমলে বাংলাদেশে হিন্দুর দেবদেবী বিনষ্ট করার যে প্রবণতা দেখা দিয়েছিল, তার হাত থেকে যশোরেশ্বরীর মূর্তি রক্ষা পেতেন না বলেই আমার বিশ্বাস।

মন্দির থেকে বেরিয়ে দেখি শঙ্করী করুণচোখে নিচের দিকে তাকিয়ে আছে। কাছে এসে জিজ্ঞেস করি, "কি ব্যাপার, এখানে দাঁড়িয়ে যে?"

"তপনবাবু মাকে নিয়ে আসছেন, এখনও এসে পৌঁছলেন না। এঁরা বলছেন, একটু বাদেই নাকি মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে।"

শঙ্করীর সে আশঙ্কা কিন্তু সত্য হলো না। মন্দির বন্ধ হবার আগেই মাসিমা এসে পৌঁছলেন এবং তিনি যশোরেশ্বরীকে দর্শন করতে পারলেন। শঙ্করীর মুখেও হাসি ফুটে উঠল—তৃপ্তির

হাসি।

সহযাত্রীরা অনেকেই এগিয়ে গিয়েছেন। মাসিমার দর্শন শেষ হলে আমরাও তাঁকে নিয়ে ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে থাকি। এবারে আর সিঁড়ি নয়, পাথর বাঁধানো চড়াই পথ। মসৃণ পাথর নয়, খাঁজ কেটে দেওয়া হয়েছে। হাতি-ঘোড়ার পা যাতে ফসকে না যায়। সেকালে রাজা-রানীরা এই পথে প্রসাদ থেকে যশোরেশ্বরীর মন্দিরে আসতেন। তাঁরা যে হাতি-ঘোড়া ছাড়া বড় একটা ঘরের বাইরে বেরুতেন না। একালেও তাই, তবে এখন হাতি-ঘোড়ার জায়গাটি দখল করেছে রোল্‌স-রয়েস্‌ ডিলুক্স।

চড়াই পথের শেষে দুর্গের প্রথম তোরণ, নাম সিংহপোল। তোরণের কপাটজোড়া পেতলের পাতে মোড়া। আর তাই বোধহয় এখানেও দু'জন বন্দুকধারী পুলিশ রয়েছেন। একালে যে পেতলের দাম, সেকালের সোনার দামকেও ছাড়িয়ে গিয়েছে।

তোরণ পেরিয়ে উঠে আসি ওপরে—পৌঁছই অম্বরের জয়গড় দুর্গে। অম্বরদুর্গের প্রকৃত নাম জয়গড়। মহারাজা মান সিংহ ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে এর সংস্কারকার্য আরম্ভ করেন। শেষ করেন রাজা সোয়াই জয় সিংহ। চারিদিকে সুউচ্চ প্রচীর পরিবেষ্টিত প্রায় সমতল ও সুদীর্ঘ একটি পর্বতশীর্ষ। তারই ওপরে এই ঐতিহাসিক দুর্গ—ভারতের একটি শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় স্থল।

তোরণের পরেই পাথর বাঁধানো সুবিস্তীর্ণ প্রবেশ প্রঙ্গণের পুবদিকে চৌকোনা দিওয়ান-ই আম। তিনদিকে দেওয়াল, একদিক খোলা। ধূসর রঙের মর্মর ও বেলে পাথর দিয়ে তৈরি। কারুকার্যময় চল্লিশটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ছাদটি। শীর্ষে খোদাই করে তৈরি করা হাতির মূর্তিগুলো দেখবার মতো।

মীর্জারাজা জয় সিংহ এই অপরূপ আম-দরবারটি নির্মাণ করেছেন। মীর্জারাজা জয় সিংহ আর সোয়াই জয় সিংহ এক লোক নন। মীর্জারাজাও আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালেই অম্বরের রাজা ছিলেন। দাক্ষিণাত্যের বহু যুদ্ধে তিনি আওরঙ্গজেবকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছেন। তিনিই নাকি ছত্রপতি শিবাজীকে বন্দী করে আওরঙ্গজেবের হাতে সমর্পণ করেছিলেন। কিন্তু অকৃতজ্ঞ ও ঈর্ষাপরায়ণ আওরঙ্গজেব ১৬৬৭ অথবা ১৬৬৮ সালের কোন সময়ে তাঁকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেন। মীর্জারাজার পরে দু'জন রাজা অল্পদিনের জন্য অম্বরের সিংহাসনে বসেন। তারপরে রাজা হন মহারাজা সোয়াই জয় সিংহ।

দেওয়ালের সুদৃশ্য রঙিন রাজপুত চিত্রগুলো দেখে আমরা বেরিয়ে আসি দিওয়ান-ই-আম থেকে। এগিয়ে চলি প্রস্তর প্রাঙ্গণের অপরপ্রান্তে।

প্রাঙ্গণের পর আরেকটি তোরণ, নাম গণেশপোল। তারপরেই প্রশস্ত অঙ্গন। পাথর বাঁধানো নয়, মাটির উঠোন। শুনেছি শ'খানেক বছর আগেও এখানে বহু মূল্যবান ফল ও ফুলের গাছ ছিল। ছিল সুদৃশ্য ফোয়ারা। এখন সামান্য কিছু ফুলগাছ শুধু রয়েছে, বাকি সবটা জুড়েই ঝোপঝাড়। খুবই স্বাভাবিক, তখন ছিল রাজপ্রসাদ আর এখন হয়েছে জনসাধারণের সম্পত্তি।

গণেশপোলেই রয়েছে সোহাগ-মন্দির। মহারাজা সোয়াই জয় সিংহ এটি নির্মাণ করান। তখন সোহাগ-মন্দিরেই ছিল অন্দরমহল। দেওয়ালে মূল্যবান রঙিন চিত্র ও মাঝে মাঝে আয়না রয়েছে। অলিন্দের অলঙ্করণে সূক্ষ্ম স্থাপত্যের অপরূপ নিদর্শন। এখানেই রয়েছে অপূর্ব সুন্দর

জালির কাজ করা-শ্বেতপাথরের পরদা। তারই আড়ালে বসে রাজমহিষীরা আম-দরবারের অনুষ্ঠান দেখতেন।

উঠানের চারিদিকেই বিভিন্ন প্রাসাদ। সোহাগ-মন্দির দেখে আমরা জয়মন্দিরে এলাম। এটি পূর্বদিকে অবস্থিত। নির্মাণ করেছেন মীর্জারাজা জয় সিংহ। তার আমলে এখানেই দিওয়ান-ই-খাসের সভা বসত। হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যকলার অপরূপ সংমিশ্রণের সাক্ষী এই প্রসাদ। দেওয়াল ছাদ ও শ্বেতপাথরের স্তম্ভগুলিতে তাজমহলের মতো খোদাই কাজ—লতাপাতা ফুল ও প্রজাপতির জীবন্ত চিত্র।

জয়-মন্দিরের জনপ্রিয় নাম শীশ-মহল। শীশ মানে শীশা অর্থাৎ আরসী বা আয়না। ডিম্বাকৃতি ছাদ ও দেওয়ালে অসংখ্য ছোট ছোট আয়না বসানো। ফলে একটিমাত্র মোমের আলো সারা ঘরখানিকে উজ্জ্বল করে তুলেছে, একখানি হাত নাড়লে চারিদিকের দেওয়াল ও ছাদে সহস্র হাত নড়ে উঠেছে। শ্রী এবং সামন্তবাবুর ছেলেদের বড়ই ভাল লেগেছে এই মহলটি।

ভাল লেগেছে আমাদেরও, সবারই লাগে। তাই এর আরেক নাম যশ মন্দির বা গৌরব গৃহ। গৌরব করবার মতোই বটে। কারণ সদ্য প্রকাশিত `Fodor's India' বইতেও একে বলা হয়েছে `World's best Chamber of Mirrors'.

শীশ-মহলের পশ্চিম প্রাঙ্গণে সুখ-মন্দির। ১৬০১ খ্রীস্টাব্দে মহারাজা মান সিংহের মহিষী কনকাবতী তাঁর প্রিয়তম পুত্র জগৎ সিংহের স্মৃতি রক্ষার জন্য এই প্রাসাদটি নির্মাণ করান। পরে মান সিংহ একই উদ্দেশ্যে পাহাড়ের পাদদেশে জগৎ শিরোমণি মন্দির নির্মাণ করান। শুনেছি এই দুটি মন্দিরের সঙ্গে নাকি ভক্ত-গায়িকা মহারাণী মীরা বাঈয়ের অক্ষয় স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে।

সুখ-মন্দিরেও শ্বেতপাথরের ওপরে কিছু অবিস্মরণীয় জালির কাজ রয়েছে। তবে এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য হলো দরজাগুলি। হাতির দাঁত ও চন্দন কাঠের এমন সূক্ষ্ম কারুকার্য আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

সুখ-মন্দির থেকে হামাম অর্থাৎ মান সিংহের স্নানের ঘরে এলাম। তারপরে তাঁর রাণীদের অন্তঃপুরে—একসারি ছোট ছোট কুঠরি। এই ঘরগুলিতে অম্বর রাজ মান সিংহের মহিষীরা থাকতেন ভাবলেও অবাক হতে হয়। শুধু তাই নয়, শুনেছি তাঁর শতাধিক রাণী ছিলেন। ষাটজন তো তাঁর সঙ্গে সহমরণেই গিয়েছিলেন। তাহলে এই ক'খানি ঘরে মহারাজার শতাধিক মহারাণীরা বাস করতেন কি ভাবে?

যাক্ গে, আমি স্বাধীন ভারতের সামান্য পর্যটক, ষোড়শ শতাব্দীর রাজা-রাণীদের ঘরোয়া ব্যাপার নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর দরকার কি? তার চেয়ে বরং অম্বর দুর্গের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা মহাবীর মান সিংহের কথা ভাবতে ভাবতে দুর্গ থেকে নিচে নামা যাক, তপন তাড়া লাগিয়েছে।

ভারতে বিশেষ করে বাংলায় আজও ঠিকমত মান সিংহের মূল্যায়ন হয় নি। আমরা তাঁকে প্রতাপাদিত্য ও প্রতাপ সিংহ প্রমুখদের স্বাধীনতা হরণকারী আকবরের একজন বেতনভুক্ কর্মচারী রূপেই জেনে এসেছি। অথচ মজার কথা, প্রতাপাদিত্য ও রাণা প্রতাপের সঙ্গে মান সিংহ কখনও সম্মুখ সমরে প্রবৃত্ত হন নি। তাঁদের দু'জনের সঙ্গেই তাঁর যথেষ্ট হৃদ্যতা ছিল। আকবরের অন্য কোন মুসলমান সেনাপতি প্রতাপাদিত্যকে পরাজিত ও বন্দী করেন। তাঁর হাত থেকে রক্ষা করবার জন্যই মান সিংহ যশোরেশ্বরীকে অম্বর দুর্গে নিয়ে আসেন। বাংলার দেবীকে অম্বর রাজপরিবারের ইষ্টদেবীর আসনে প্রতিষ্ঠিত করে ধার্মিক মান সিংহ নিঃসন্দেহে

উদারতার পরিচয় রেখে গিয়েছেন।

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক কালিকারঞ্জন কানুনগো তাঁর 'রাজস্থান-কাহিনী' গ্রন্থে এ সম্পর্কে যে-সব যুক্তিসম্মত মন্তব্য করেছেন, আজ এই অম্বরে আসার পর থেকে বারবার আমার তা মনে পড়ছিল। কালিকারঞ্জন বলেছেন—'..বাঙ্গালার সুবাদার হিসাবে রাজা মান সিংহকে বিচার করিলে শাশ্বত ঐতিহাসিক সত্যের অপলাপ ঘটিবে। দেশ, ধর্ম ও কুলাভিমান নিরপেক্ষ হইয়া ইতিহাস বিচার না করিলে সত্যের সন্ধান কখনও মিলিবে না।...'

তিনি আকবর ও মান সিংহকে শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন—'...অখণ্ড ভারতে এক বিরাট ভারত সমাজ এবং একই ভারতীয় সংস্কৃতি-সৃষ্টির প্রেরণা যিনি সর্বপ্রথম পাইয়াছিলেন, যাঁহারা এই মহান্ আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহার নেতৃত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষ আকবর ও মান সিংহ প্রমুখ নবরত্নকে ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাসের ধারা এবং উদার দৃষ্টিভঙ্গির দ্বারা বিচার করাই একমাত্র সুবিচার এবং উহাই বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস।'

নিচে নেমেই অধিকাংশ সহযাত্রী ছুটলেন দোকানে দোকানে—কেনাকাটা করতে। শ্রী ও সত্যেনদার সঙ্গে আমি আসি সংগ্রহশালা ভবনে—দিলারামবাগে, মাওটা হ্রদের তীরে। ছোট হলেও সংগ্রহশালাটি মোটেই অবহেলার নয়। কারণ প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের সময় অম্বর, বৈরাট, সম্বর বৈরহ, বরনল ও আবাভেরী প্রভৃতি স্থানে যে-সব মূল্যবান বস্তু পাওয়া গিয়েছে, তার কিছু নিদর্শন এখানেও রয়েছে।

সংগ্রহশালা দেখে বাসস্ট্যান্ডে আসি। সহযাত্রীরা এখনও কেনাকাটায় ব্যস্ত। শ্রী তার মায়ের কাছে চলে যায়। সত্যেনদা ও মা গিয়ে বাসে বসে, আমি বটের ছায়ায় ঠাঁই নিই।

সহযাত্রীরা ফিরে এলেই বাস ছাড়বে। আমরা গাড়িতে ফিরে যাবো। স্নান ও খাবার পরে রওনা হব অ্যালবার্ট হল মানে জয়পুর মিউজিয়ামে। সেটিও জয়পুরের অবশ্য দর্শনীয় স্থানগুলির অন্যতম। জয়পুরে এসে এই যাদুঘরটি না দেখলে নাকি রাজস্থানের বৈচিত্র্যপূর্ণ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে জানা যায় না।

সংগ্রহশালা ভবনটিও শুনেছি চমৎকার। রামনিবাস উদ্যানে অবস্থিত ইন্দো-সারাসেনিক স্থাপত্য শৈলীর একটি অপরূপ নিদর্শন। ইংলন্ডের যুবরাজ অ্যালবার্ট (প্রিন্স অব্ ওয়েলস) ভারত দর্শনে এসে মহারাজা রাম সিংহের অনুরোধে ১৮৭৬ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি এই ভবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন।

১৮৮৭ সাল থেকেই অর্থনৈতিক ঐতিহাসিক এবং শ্রম ও কারুশিল্প বিভাগ নিয়ে সংগ্রহশালার উদ্‌বোধন হয়। এখানে জয়পুরী শিল্প ও সুষমামণ্ডিত বহু ধাতুমূর্তি এবং কাঠ ও পোড়ামাটির নিদর্শন রয়েছে। রয়েছে আশ্চর্য নক্‌শা ও বর্ণ-বিন্যাসময় পারস্যের উদ্যান-গালিচা, বিস্ময়কর রাজপুত চিত্রকলা এবং লোকশিল্পের সম্পদ বিভিন্ন পুতুল ও খেলনা। রয়েছে বহু দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা ও পাণ্ডুলিপি এবং হাতির দাঁত ও চীনামাটির দর্শনীয় জিনিসপত্র। তাছাড়া রামনিবাস উদ্যানে রয়েছে পশু ও পাখির ছোট একটি চিড়িয়াখানা। কিন্তু সব কিছু দেখার সময় পাবো না আমরা। কারণ আমরা সেখানে বড়জোর ঘণ্টাঘানেক থাকতে পারব। সাড়ে ছ'টায় ট্রেন! ছ'টার মধ্যেই ফিরতে হবে গাড়িতে।

জয়পুর ঐতিহাসিক মহানগরী। একদিনে জয়পুর দর্শন অসম্ভব। কিন্তু এজন্য কুণ্ণ

স্পেশালকে দোষ দেওয়া বৃথা। আমরা তো দেখতে আসি না, আসি বেড়াতে। কত কম খরচে, কত কম সময়ে, কত বেশি জায়গা বেড়ানো যায়, সেদিকেই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। সুতরাং ট্যুর কন্ডাকট'ররা সেই ভাবে প্রোগ্রাম তৈরি করেন। রাজস্থান এবং গুজরাতের ভ্রমণসূচীতেও তাঁদের দিল্লী দর্শনের ব্যবস্থা রাখতে হয়।

যাক্ গে, যে কথা বলেছিলাম। জয়পুরের বহু দ্রষ্টব্য স্থানই আমার অদেখা রয়ে গেল। যাওয়া হলো না চাঁদপুর বাজারে শ্রীরাধাগোপীনাথের মন্দিরে।

আমরা দেখতে পারলাম না গলতা—জয়পুরের পুবদিকে একটি পাহাড়ের ওপর অবস্থিত সূর্যমন্দির ও সরোবর। কথিত আছে পঞ্চদশ শতাব্দীতে সেখানে গালব নামে জনৈক ঋষির আশ্রম ছিল। তাঁর নামানুসারে জায়গাটির নাম হয়েছে গলতা। জয়পুর থেকে ৮ কিলোমিটার।

গলতা যাবার হাঁটাপথটি সূরযপালের কাছ থেকে। যাঁরা পায়ে হেঁটে চড়াই পথ পেরোতে পারেন না, তাঁরা উপযুক্ত পারিশ্রমিকে বয়ে নিয়ে যাবার লোক পেতে পারেন। অবশ্য একথা মিসেস উকিলের বেলায় প্রযোজ্য নয়।

কৃপারাম জৈন নামে জনৈক ধার্মিক ধনী গলতার সূর্যমন্দিরটি তৈরি করে দিয়েছেন। পাহাড়ের পাদদেশে কদম্বকুণ্ড চৌবেদি গোমুখীকুণ্ড ও সূর্যকুণ্ড নামে চারটি সরোবর আছে। সরোবরের তীরে মৌর্যচিত্রকলায় শোভিত মন্দিরে শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি রয়েছে।

গলতা ছাড়া আর যে-সব জায়গায় যেতে পারব না, তার মধ্যে গাতোর, নাহারগড় দুর্গ, মতিদুংরি প্রসাদ, সাঙ্গনের যজ্ঞশালা ও জল-মহল বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

গাতোর নাহারগাঁ পাহাড়ের পাদদেশে মহারাজাদের উদ্যানময় সমাধিক্ষেত্র। মহারাণীদের সমাধিক্ষেত্রটি এই রাস্তার ওপরেই, আরও খানিকটা এগিয়ে।

নাহারগড় দুর্গের আরেক নাম টাইগার কোর্ট। এটি সুদর্শনগড় নামেও পরিচিত। জিপে চড়েই দুর্গে যাওয়া যায়। বেশ প্রাচীন দুর্গ। মীনাদের আমলে এখানে রাজার কোষাগার ছিল। জয়পুরের সাড়ে ছয় কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত এই দুর্গটি মহারাজা সোয়াই জয় সিংহ ১৭৩৪ খ্রীস্টাব্দে নির্মাণ করেছেন। একটি পাহাড়ী পথ দিয়ে নাহারগড় থেকে অম্বর যাওয়া যায়। দুর্গটির নির্মাণ কৌশল ও অলঙ্করণ প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার বিষয়।

মতিদুংরি প্রাসাদ বা পার্লহিল প্যালেস মহারানী গায়ত্রীদেবীর বর্তমান নিবাস। কথিত আছে মহারাজা মান সিংহ প্রথম এখানে দুর্গ নির্মাণ করেন।

জয়পুর থেকে প্রায় ১৬ কিঃ মিটার দূরে সাঙ্গনের এক প্রাচীন প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ। কেবল প্রাচীর ও কয়েকটি তোরণের কিছু অংশ ইতিহাসের নীরব সাক্ষী রূপে দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেখানে সুন্দর একটি জৈন মন্দির আছে।

জল-মহল ও যজ্ঞশালার পাশ দিয়েই বাসে চড়ে জয়পুরে ফিরব আমরা, কিন্তু সময়াভাবে নামতে পারব না। জল-মহল সরোবরের মধ্যে মহারাজাদের সৌখিন প্রাসাদ আর যজ্ঞশালায় কাল-মহাদেবের মন্দির আছে। মহারাজা সোয়াই জয় সিংহ সেখানে অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। তিনি যজ্ঞশালার স্তম্ভ ও সিলিং রূপার পাত দিয়ে মুড়ে দিয়েছিলেন।

কেনা-কাটা শেষ করে ফিরে এলেন সহযাত্রীরা। সবার সঙ্গে আমিও বাসে উঠে আসি। অবশেষে উঠে এলো তপন। সে-ই আজ আমাদের দলনেতা। ড্রাইভার বাস ছেড়ে দিল।

ফিরে চলেছি জয়পুর রেলস্টেশনে—আমাদের গাড়িতে অর্থাৎ বাড়িতে। সহযাত্রীরা কে

কি কিনেছেন, তা নিয়ে আলোচনা করছেন। কেউ বা সঙ্গীদের জিনিসপত্র দেখাচ্ছেন।

কথায় কথায় পূর্ণিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, "তুমি কি কিনলে?"

"আমি কিছুই কিনি নি ঘোষদা!"

কথাটা মনে পড়ে আমার, ওর সব টাকা চুরি হয়ে গেছে গোবিন্দজীর মন্দিরে। প্রশ্নটা না করাই উচিত ছিল।

আমার মনের ভাবটি বোধহয় বুঝতে পারে সে। বলে, "ভাববেন না টাকার জন্য কিনি নি। শঙ্করী ও জামাইবাবুর কাছে টাকা ছিল, দরকার হলেই নিতে পারতাম। কিন্তু আমার জানেন, কেনা-কাটা করতে ভাল লাগে না, ভাল লাগে দেখতে। তাই ওরা যখন কেনা-কাটা করে সময় নষ্ট করছিল, আমি তখন প্রাণ ভরে জয়পুরী শিল্পকলা দেখে নিয়েছি।"

"কি কি দেখলে?"

"দেখলাম কাঠ ও পাথরের ওপর অপরূপ খোদাই কাজ। আকাশী-নীল রঙের কাচের বাসন ও মনের অলঙ্কার, আরও অনেক জিনিস—সবই সুন্দর।"

শঙ্করী তার হাতব্যাগ থেকে একটি পাথরের শিবমূর্তি বের করে আমার হাত দিয়ে বলে, "দেখুন তো ঘোষদা, মূর্তিটা কেমন?"

"ভারি সুন্দর। কিন্তু তোমার তো নর্তকীর মূর্তি কেনার কথা ছিল!'!

শঙ্করী হেসে দেয়। বলে, "নর্তকীর মূর্তি কেনার জন্যই দোকানে গিয়েছিলাম, কিন্তু এই মূর্তিটি দেখার পরে অন্য কোন মূর্তির কথা ভাবতেই পারলাম না। এখন যার জন্য নিয়ে যাচ্ছি, তার পছন্দ হলে হয়।"

আমি ওকে আশ্বস্ত করি। বলি, "তুমি নিশ্চিন্ত থাকো। এ মূর্তি তাঁর পছন্দ হবেই। এবং এই নির্বাচনের জন্য তিনি অবশ্যই তোমাকে ধন্যবাদ দেবেন।"

।। ছয়।।

বাস থেকে নেমে স্টেশনে উঠে আসতেই পাঁচুবাবুর সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞেস করি "ভৌমিকবাবু কেমন আছে?"

"ভাল নয়।" অসহায় স্বরে ম্যানেজার উত্তর দেয়। বলেন, "একজন ডাক্তার নিয়ে এসেছিলাম। তিনি বলে গেলেন, একে হাই-প্রেসার ও ডায়েবেটিজ, তার ওপরে এত জ্বর—এ রোগীকে নিয়ে আর এভাবে এগিয়ে যাওয়া উচিত হবে না। তিনি হাসপাতালে ভর্তি করে দেবার পরামর্শ দিয়ে গেলেন কিন্তু মিসেস ভৌমিক কিছুতেই রাজি হচ্ছেন না।"

আমরা চুপ করে থাকি। পাঁচুবাবু আবার বলে, "কয়েকঘণ্টা বাদেই আমাদের ট্রেন, ভদ্রলোককে নিয়ে কি করা যায় বুঝতে পারছি না।"

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে যায়। বলি, "আচ্ছা, দিল্লীতে সেদিন ওনারা এক ডাক্তার আত্মীয়ের বাড়িতে গিয়েছিলেন না?"

"আরে তাই তো!" আমি মনে করিয়ে দিতেই ম্যানেজার প্রায় চেঁচিয়ে ওঠে। "তাহলে তো ওনাদের দিল্লী পাঠিয়ে দেওয়া যায়, রাতের ট্রেন ধরলে কাল সকালেই ওরা দিল্লী পৌঁছে যাবেন।"

দাদা সত্যেনদা এবং সরকারদাও সে সিদ্ধান্ত সমর্থন করেন। ম্যানেজারের দুশ্চিন্তার অবসান

হয়।

প্লাটফর্ম থেকে রেল লাইনে নেমে এসে দেখি সহযাত্রীরা সবাই সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছেন। গাড়ি আছে কিন্তু গাড়িতে উঠবার উপায় নেই—শান্টিং চলেছে। শান্টিং ইঞ্জিনটা একবার তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে দূরে আবার নিয়ে আসছে কাছে। কেন, তা বুঝতে পারছি না। আমরা শুধু অবুঝ দর্শকের মতো দু'চোখ দিয়ে ইঞ্জিনের সেই লোফালুফি দেখছি, কিন্তু আমাদের পরমাশ্রয়টির দিকে এগোতে সাহস পাচ্ছি না।

অভিজ্ঞ তপন বলে, "একটু দাঁড়ান। এখুনি গাড়ি জায়গায় দিয়ে দেবে।"

আমরা আশ্বাসে আশ্বস্ত না হলেও নীরবে দাঁড়িয়ে থাকি। কিন্তু নীরব থাকতে পারেন না ঠাকুরমারা। তাঁদের একজন বলে ওঠেন, "আর দিচ্ছে। আমাগো যে অনেক কাচাকাচি আছে। কাইল কথায় থাকমু, জল পামু কি না, কিছুই তো জানি না। তুমি এট্টা কাম করো রে মণি, কাউরে দিয়া আমাগো বাসি কাপড়ের বালতি দুইডা আর গামছা কয়খান এট্টু আনাইয়া দেও দেহি।"

তপন প্রমাদ গণে, কিন্তু তার পাশে দাঁড়িয়ে থাকা অহীন বলে, "ঠিক আছে ঠাকুরমা, আমি দিচ্ছি।" অহীন রেল লাইন ডিঙিয়ে শান্টিংরত গাড়ির দিকে ছুটে যায়।

সত্যি এদের কোন তুলনা হয় না—এই পাঁচু তপন অহীন বাণেশ্বর জ্ঞান ও মতি এবং ঠাকুর রামনাথ ও তার সহকারী গৌর। এমন শ্রমশীল এবং সেবাপরায়ণ কর্মচারী বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না।

আর তুলনা হয় না আমার ঠাকুরমাদের। তাঁদের মতো পটু পর্যটক আমি খুব কমই দেখেছি। কাচাকাচি ও স্নান করে গাড়ির জল নষ্ট করার নিয়ম নেই। কারণ জংশন স্টেশন ছাড়া গাড়ির ট্যাঙ্কে জল বোঝাই করা যায় না। তার ওপর রাজস্থানে, সব জংশনে জল পাওয়া যাবে না সুতরাং যতটা সম্ভব জল বাঁচাতে হবে, নইলে গাড়ি চলাকালীন হাত-মুখ ধোবার জল পর্যন্ত পাওয়া যাবে না।

অথচ কয়লার গাড়ি, বড্ড জামা-কাপড় নোংরা হয়। তার ওপরে আছে স্নান ও বাসি কাপড় কাচার ঝামেলা। সুতরাং ঠাকুরমারা সুযোগ পেলেই স্টেশনের ওয়েটিং রুমে গিয়ে জলের ব্যাপারগুলো সেরে আসেন। প্লাটফর্মের ওপরেই জামা-কাপড় শুকিয়ে নেন।

যাই হোক্ শেষ পর্যন্ত গাড়ি এলো এবং আমাদের স্নান ও খাওয়ার পাট চুকলো। আর তারপরেই ম্যানেজার মিসেস ভৌমিকের কাছে প্রস্তাবটা পেশ করল।

মিসেস আপত্তি করলেন, তবে বললেন, "দিল্লী গিয়ে যদি সম্ভব হয়, ওকে আমি একেবারে কলকাতায় নিয়ে যাবো। দরকার হলে 'বাই এয়ার' যাবো। কিন্তু একা আমার পক্ষে তো এই বেহুঁশ রোগীকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়, আমাকে একজন লোক না দিলে..."

"লোক তা দেবই দিদি!" পাঁচুবাবু তাঁকে কথাটা শেষ করতে দেয় না। জিজ্ঞেস করেন, "আপনি কাকে চান?"

একটু ভেবে মিসেস বলেন, "অহীনকে যদি দিতে পারেন, ভাল হয়।"

"আমি যদি তপনকে আপনার সঙ্গে দিই?"

"খুবই ভাল হয়, তবে তপনকে আমি নিয়ে গেলে যে আপনার অসুবিধে হবে! এতগুলো লোকের ঝামেলা আপনার একারপক্ষে সামলানো খুবই মুশকিল।"

"কোন মুশকিল হবে না দিদি! আপনাদের আশীর্বাদে আমি সবাইকে নির্বিঘ্নে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবো।" পাঁচুবাবু উঠে দাঁড়ায়। বলে, "তাহলে এই কথাই রইল। আপনারা রাতের গাড়িতে দিল্লী চলে যান, তার পরে অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করে নেবেন।"

সহযাত্রীরা মিউজিয়াম দেখতে চলে গেলেন। কিন্তু আমার পক্ষে তাঁদের সঙ্গী হওয়া সম্ভব হলো না, মানে পাঁচুবাবু ছাড়ল না আমাকে। আরও এক জন মিউজিয়াম দেখতে যান নি—উমাদি। তিনি খাবার পরে সেই যে এসে ভৌমিকবাবুর শিয়রে বসেছেন, আর ওঠেন নি সেখান থেকে। তাঁকে মাথা ধুইয়েছেন, পথ্য আর ওষুধ খাইয়েছেন। এখন মাথায় বাতাস করছেন।

অথচ হাওড়াতে গাড়িতে ওঠার আগে উমাদি চিনতেন না ভৌমিকবাবুকে, আর এখান থেকে গাড়ি ছাড়ার পরেও হয়তো আর তাঁর কোনদিন দেখা হবে না ভৌমিকবাবুর সঙ্গে। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, উমাদির চেয়ে আপনজন ভৌমিকবাবুর খুব কমই আছে এ সংসারে।

পাঁচুর সঙ্গে নেমে আসি গাড়ি থেকে। স্টেশনে এসে দিল্লীর তিনখানি ফার্স্টক্লাস টিকেট কাটি। তারপরে স্টেশন-মাস্টারের অফিসে ঢুকি।

সব শুনে মাস্টারমশাই সবিনয়ে জানালেন—জয়পুর স্টেশনে রোগী বহন করবার জন্য কোন স্ট্রেচার নেই।

বিপদে পড়া গেল। ভৌমিকবাবুর পক্ষে গাড়ি থেকে নামা ও এতদূর হেঁটে আসা যেমন অসম্ভব, তেমনি আমাদের পক্ষে অতবড় ভারী দেহ বয়ে আনাও সহজ নয়।

শেষ পর্যন্ত স্টেশন-মাস্টারই কিন্তু উপায় বাৎলে দেন। বলেন, "এক কাম কিজীয়ে, ঠেলামে লে আইয়ে।"

ঠেলা! আমি সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাই। ঠেলায় তো মাল বয়, ঠেলায় মানুষ চড়ে বলে তো শুনি নি কখনও!

কুণ্ডু স্পেশালের অভিজ্ঞ ম্যানেজারও বুঝতে পারে না ব্যাপারটা। স্টেশন মাস্টার বুঝিয়ে দেন আমাদের। ঠেলা মানে গরুর গাড়ির মানুষ-সংস্করণ নয়, রেলের মাল বইবার জন্য স্টেশনে যে মনুষ্যবাহিত লাগেজ-ভ্যান থাকে, তাকেই এঁরা ঠেলা বলেন।

অবশেষে সেই ঠেলায় করেই অর্ধঅচেতন ভৌমিকবাবুকে ফার্স্টক্লাস ওয়েটিং রুমে নিয়ে আসা হলো। উমাদিও তাঁর সঙ্গে এলেন। বললেন, দিল্লী থেকে ট্রেন আসার পরে আমাদের গাড়ি প্লাটফর্মে নিয়ে এলে, আমরা যেন খবর দিই তাঁকে—তিনি তখন গাড়িতে উঠবেন।

তপন পাঁচুবাবুকে হিসেবপত্র বুঝিয়ে দিলে। বৃহত্তর প্রয়োজনে তাকে আজ ছেড়ে দিতে হচ্ছে আমাদের। কিন্তু গত কয়েকদিন এই হাসিখুশি উৎসাহী তরুণটি যেভাবে আমাদের সেবা ও সাহায্য করেছে, তা বহুদিন মনে থাকবে আমার।

মনে থাকবে ভৌমিকবাবুর কথা। হাওড়ায় গাড়ি ছাড়ার পর থেকে গত কাল পর্যন্ত পাশাপাশি রয়েছি আমরা। কত আশা করে তিনি সস্ত্রীক সঙ্গী হয়েছিলেন আমাদের—রাজভূমি রাজস্থান দর্শন করবেন।

হলো না, সে আশা পূর্ণ হলো না তাঁর। এমনকি জয়পুরে এসেও রাধাগোবিন্দজীকে দর্শন করতে পারলেন না তিনি। না পারুন, তবু সেই রাধাগোবিন্দের কাছেই আমি তাঁর মঙ্গল কামনা করি। বলি—ঠাকুর! মানসী বলেছে, ভক্তিভরে তোমার কাছে কোন প্রার্থনা করলে, তুমি নাকি

যে প্রার্থনা অপূর্ণ রাখতে পারো না। আমার ভক্তি নেই, আমি শুধু কায়মনোবাক্যে কামনা করছি—তুমি ভৌমিকবাবুকে নিরাপদে কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাও। তুমি তাঁকে সুস্থ করে তোলো ঠাকুর!

নির্দিষ্ট সময়ের ঘণ্টাখানেক পরে দিল্লী-আমেদাবাদ এক্সপ্রেস জয়পুর পৌঁছল। না, দেরি করার জন্য আমরা মোটেই ক্ষুব্ধ হই নি। কারণ দেরি করে আসাই এখন ভারতীয় রেলের ধর্ম আর সে বিচারে একঘণ্টা দেরিকে কোনমতেই দেরি বলা যায় না।

কিছুক্ষণ বাদেই আমাদের ট্রেন ছাড়ল। আমরা আজমীর চলেছি, তপন প্লাটফর্মে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে। মিসেস ভৌমিকও দাঁড়িয়ে রয়েছেন ওয়েটিং রুমের সামনে। তাঁর রাজস্থান দর্শনের বড়ই সখ ছিল। কিন্তু এ যাত্রায় আর রাজস্থান দেখা হলো না তাঁর। কি করবেন—মানুষ আশা করে, ভগবান বাদ সাধেন।

কদিন ধরেই দেখেছি, গাড়ি ছাড়ার পর সহযাত্রীরা সকলে হাসি আর গল্পে মুখর হয়ে ওঠেন। কিন্তু আজ যেন কেমন একটা অবসাদ নেমে বসেছে সারা গাড়িতে. বিশেষ করে আমাদের খুপরিটিতে। বড়ই ফাঁকা ফাঁকা মনে হচ্ছে। অথচ সত্যি কিন্তু ফাঁকা নেই। সংসারে যে কিছুই ফাঁকা থাকে না বেশিক্ষণ। ভৌমিকবাবুদের জায়গা দুটি ইতিমধ্যেই ভরে গিয়েছে। দাদা ও সাহাবাবু লোয়ার বার্থ নিয়েছেন। আর তাঁদের বার্থ দুটিতে এসেছেন উমাদি ও পাঁচুবাবু।

নিজের মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে ম্যানেজার বসল আমার পাশে। সে বুঝতে পেরেছে আমাদের মানসিক অবস্থা। তাই বিনা প্রস্তাবনায় শুরু করে, "ঘোষদা, আপনি প্রথমবার আমাদের সঙ্গে যাত্রায় এসেছেন বলেই, আপনার এত খারাপ লাগছে। নইলে এমন ঘটনা প্রায় প্রত্যেক যাত্রাতেই ঘটে। দুবার তো দু'জন মারাই গেলেন।"

"মারা গেলেন!"

"হ্যাঁ। একজন করোনারী থ্রম্বোসিসে আরেকজন নিমোনিয়ায়।"

চুপ করে থাকি। সহাবাবু এবং উমাদিও নীরব। একটু বাদে দাদা বলেন, "ভায়া যার যেখানে জমি কেনা আছে, তাকে সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলতেই হবে। তোমার বৌদিকে নিয়ে আমি ১৯৬০-৬১ সালে ভারত-দর্শন স্পেশাল ট্রেনের যাত্রী হয়েছিলাম। আমাদেরও একজন সহযাত্রী এলাহাবাদে হার্টফেল করেছিলেন।"

ঘটনাটা অজানা নয় আমার, কারণ সেবারে সুজয়াও ঐ ট্রেনে ভারত-দর্শনে বেরিয়েছিল।*

কেটে গেছে কিছুক্ষণ। সহযাত্রীরা ধীরে ধীরে যেন অবসাদ কাটিয়ে উঠেছেন। তাই তো উঠবেন, সংসারে যে সব অভাবই একসময় সয়ে যায়। ভৌমিকবাবুর অভাবও আমরা আস্তে আস্তে ভুলে যাবো। তিনিও একদিন আশাভঙ্গের বেদনা বিস্মৃত হবেন।

ঠাকুরমারা আচারের বয়াম বের করেছেন, সামন্তবাবুর ছেলেরা লুডো নামিয়েছে আর শ্রী বই নিয়ে বসেছে। সকাল সন্ধ্যায় সময় পেলেই সে পড়তে বসে। সে এখন পড়ে চলেছে—'Man proposes God disposes'...

কি বিচিত্র ব্যাপার! আমার মানসিক অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই শ্রী যেন পড়ে চলেছে এই চরম সত্যটির কথা।

কিন্তু না, ভৌমিকবাবুর কথা আর নয়। পথে বেরিয়ে পেছনে তাকাতে নেই—'চরৈবেতি।'

অতএব এগিয়ে চলা যাক্। মাত্র ঘণ্টা তিনেক বাদেই আমরা আজমীর পৌঁছচ্ছি। সুতরাং বসে বসে আজমীরের কথাই ভাবা যাক্।

জয়পুরের দক্ষিণ-পশ্চিমে আজমীর জেলা। এই জেলার চারিদিকে রাজস্থানের জয়পুর, টন্ক, ভিলওয়ারা, পালি ও নাগাউর জেলা। পাঁচটি তহশিল নিয়ে আজমীর জেলা। আয়তন ৮৪৭৯ বর্গকিলোমিটার, জনসংখ্যা ১১,৪৭,৭২৯ জন। ২৫°৩৮' ও ২৬°৫৮' উঃ অক্ষরেখা এবং ৭৩°৫৪' ও ৭৫°২২' পুঃ দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত এই জেলা।

জয়পুর থেকে আজমীর শহর রেলপথে ১৩৬ আর মোটরে ১৩১ কিলোমিটার। আরাবল্লী গিরিশ্রেণী পরিবেষ্টিত এই নগর ভারতের প্রাচীনতম জনপদগুলির অন্যতম। ভারতের ভাগ্য নির্ধারণে আজমীর অন্তত দু'বার প্রধান ভূমিকা নিয়েছে। প্রথমবার পৃথ্বিরাজের পরাজয়ে আর দ্বিতীয়বার আওরঙ্গজেবের জয়ে। পৃথ্বিরাজ ও সংযুক্তার স্মৃতিবিজড়িত সেই আজমীরে চলেছি আমি।

শুনেছি আজমীর নামটি অজয়মেরু নামের অপভ্রংশ। অজয়মেরু নামটিও কিন্তু মুছে যায় নি। যে গিরিশিরাটি প্রায় চারিদিক থেকে এই ঐতিহাসিক নগরীকে বেষ্টন করে আছে, তার নাম আজও অজয়মেরু। তাছাড়া আমরা আজমীর বললেও স্থানীয়রা বলেন অজমের—**AJMER** আর আরাবল্লীর যে পাহাড়টির পাদদেশে এই নগরটি অবস্থিত, তার নাম তারাগড়। পাহাড়টির ওপরে একটি প্রাচীন দুর্গ রয়েছে তার নামও তাবাগড়।

অনেকে বলেন, অজ অথবা অজয় কিংবা অজয়রাজ নামে চৌহান বংশীয় জনৈক রাজা দ্বাদশ শতাব্দীতে এই নগরের প্রথম পত্তন করেন। কিন্তু আজমীর ও তারাগড়ে যে-সব প্রাচীন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, তা থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে দ্বাদশ শতাব্দীর অনেক আগের থেকেই আজমীরে জনবসতি ছিল।

ভূতাত্ত্বিকগণ এই মত সমর্থন করেন। তাঁরা বলেন—আজমীর এবং পুষ্করের চারিদিকের গিরিশিরাগুলি ভারতের প্রাচীনতম শিলাস্তরের অন্যতম। সুতরাং সভ্যতার প্রথম প্রভাত থেকেই আজমীরে মনুষ্যবসতি ছিল, মহেনজোদড়ো সভ্যতার সঙ্গে যে সেকালে রাজধানী সভ্যতার যোগাযোগ ছিল, একথা সর্বজনস্বীকৃত। ইদানীং এই অঞ্চলে এমন কতকগুলো নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, যা থেকে মনে করা যেতে পারে আজমীর এবং পুষ্কর অঞ্চলও সেকালের সেই সুসভ্য রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তার মানে অবশ্য এই নয় মহেনজোদড়োর আমলেই আজমীর নগরের পত্তন হয়েছিল।

ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন মত পর্যালোচনা করে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে যে আজমীর ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম শতাব্দীর জনপদ। কিন্তু একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত আজমীর একটি সামান্য লোকালয় ছিল। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অজয়রাজ নামে চৌহান বংশীয় জনৈক নরপতি সেই ক্ষুদ্র জনপদকে একটি সমৃদ্ধ নগরে পরিণত করেন।

আজমীরের রাজনৈতিক জীবনে দ্বাদশ শতাব্দী সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য যুগ। কারণ ১১৯২ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ ঘোরীর কাছে পৃথ্বীরাজের পরাজয়ের পর থেকেই আজমীর প্রকৃতপক্ষে পরাধীন হয়ে পড়ে।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শুরু থেকে ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যকাল পর্যন্ত ভারতের রাজনৈতিক

জীবনে আজমীর তেমন কোন উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে নি। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সম্রাট আকবর কিন্তু আজমীরের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের কথা বিবেচনা করে এই নগরকে মোটেই অবহেলা করলেন না। রাজত্ব গ্রহণের ষষ্ঠবর্ষে অর্থাৎ ১৫৬১ খ্রীস্টাব্দে তিনি আজমীরে এলেন। এখানে বসেই তিনি অম্বরের সঙ্গে সখ্যতার সম্পর্ক স্থাপন করলেন। আজমীর তাঁর রাজপুতনা ও গুজরাত জয়ের প্রধান কর্মকেন্দ্রে পরিণত হলো। সম্রাট শহরের কেন্দ্রস্থলে এক দুর্ভেদ্য দুর্গ নির্মাণ করালেন। সে দুর্গ আজও রয়েছে। এখন তাকে 'ম্যাগাজিন' বলা হয়। তবে ম্যাগাজিন আজকাল আর অস্ত্রাগার নয়, মিউজিয়ামে রূপান্তরিত। শুনেছি সেই সংগ্রহশালায় কিছু উল্লেখযোগ্য প্রাচীন মূর্তি মুদ্রা এবং রাজপুত চিত্র রয়েছে।

আরও একটি কারণে আজমীরের নাম ভারতের ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছে। এখানেই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম বীজ বপিত হয়েছিল। ১৬১৬ খ্রীস্টাব্দে তৎকালীন ইংলন্ডের রাজা প্রথম জেম্‌সয়ের দূত স্যার টমাস রো এখানেই সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছে তার পরিচয়পত্র পেশ করেছিলেন। বলা বাহুল্য সম্রাট তাঁর আবেদন মঞ্জুর করেছিলেন। আর তারই সূত্র ধরে মাত্র দেড়শ' বছরের মধ্যে ভারতে ইংরেজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এজন্য জাহাঙ্গীরকে দোষ দেওয়া উচিত হবে না। কারণ জাহাঙ্গীর সেদিন পর্তুগীজদের রুখবার জন্যই ইংরেজদের ভারতে ব্যবসা করার অনুমতি দিয়েছিলেন। তাঁর বংশধরদের অযোগ্যতার ফলেই ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

মুসলমানদের কাছে আজমীর ভারতের মক্কা। এখানেই রয়েছে তাঁদের প্রাণপুরুষ খাজা মুইন-উদ-দিন চিস্তির সমাধি, সেই পবিত্র দরগা—আজমীর শরীফ। পাকিস্তান ভারত বাংলাদেশ ও উত্তর-পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে লক্ষ লক্ষ ধার্মিক মুসলমান প্রতিবছর সেখানে তীর্থযাত্রায় আসেন। এই যাত্রা শুরু হয়েছে মহামতি আকবরের সময় থেকে। তিনি বহুবার যাত্রায় অংশ নিয়েছেন। তার মধ্যে কয়েকবার এসেছেন পায়ে হেঁটে। আজমীর শরীফ শুধু মুসলমানদের তীর্থ নয়, জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের মহাতীর্থ। এখানে মুসলমানদের চেয়ে হিন্দু যাত্রীদের সংখ্যা অনেক বেশি।

দরগা ছাড়াও আজমীরের কয়েকটি দর্শনীয় স্থান রয়েছে—অজয়পালের মন্দির, সোনিজী কি নাসিয়ানা বা জৈন মন্দির, তারাগড়ের দুর্গ, অনাসাগরও দৌলত বাগ, আড়াই দিন-কা ঝোপড়া এবং মেয়ো কলেজ আমার সহযাত্রীদের কাছে অবশ্য আজমীরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ পুষ্কর। তীর্থরাজ পুষ্কর আজমীর থেকে মাত্র ১১ কিলোমিটার।

আজমীরের প্রতিষ্ঠাতা অজয়পালের মন্দিরে এখনও প্রতিবছর ৬ই ভাদ্র এক বিরাট মেলা বসে। ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম শতাব্দীর কোন এক বছরে ঐ তারিখেই নাকি অজয়পাল আজমীরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

আজমীরের জৈন মন্দিরটি প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভদেবের মহান স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। শেঠ মূলচাঁদ সোনি নামে জনৈক ধার্মিক ধনী ১৮৬৫ সালে এই মন্দির নির্মাণ করান। মন্দিরের সর্বাপেক্ষা দর্শনীয় ঘরখানির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ চল্লিশ ফুট। ঘরখানির সিলিং ও দেওয়ালে সোনা এবং কাচের খোদাই করা মোজাইক কাজ দেখবার মতো। তাছাড়া রয়েছে অপরূপ চিত্রকলা—জৈনধর্মে স্বীকৃত জীবনের ক্রমবিকাশ এবং অযোধ্যা ও প্রয়াগের দৃশ্যাবলীর চিত্র। আছে ঋষভদেবের জীবন্ত মর্মরমূর্তি।

তারাগড় পাহাড়ের ওপরে সেকালের দুর্ভেদ্য দুর্গ তারাগড় এখনও টিকে আছে কোন মতে। সমুদ্রসমতা থেকে ২৮৫৫ ফুট উঁচু এই দুর্গটি পাহাড়ের পাদদেশ থেকে মাত্র ৮০০ ফুট ওপরে অবস্থিত। এটি আজমীর জেলার উচ্চতম স্থান। এই দুর্গের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ঐতিহাসিক উত্থান-পতনের কিছু কাহিনী। তারাগড় বহুবার আজমীরের ভাগ্য নির্ধারণ করেছে। দুর্গের ভেতরে পাঁচটি জলাশয় এ একটি মসজিদ আছে। বলা বাহুল্য মুসলমান আমলে মন্দিরকে মসজিদে রুপান্তরিত করা হয়েছে।

আনাসাগর আজমীরের উপকণ্ঠে একটি রমণীয় হ্রদ। দুটি পাহাড়ের মাঝখানে বাঁধ দিয়ে এই হ্রদ সৃষ্টি করা হয়েছে। কথিত আছে পৃথ্বীরাজের (সংযুক্তার স্বামী তৃতীয় পৃথ্বীরাজ) পিতামহ অর্নোরাজ বা অনাজি ১১৫০ খ্রীস্টাব্দে এই হ্রদটি সৃষ্টি করেন। বাঁধটি নির্মাণ করতে তাঁর পনেরো বছর সময় লেগেছিল। দুর্ভাগ্যের কথা তাঁর জ্যেষ্ঠপুত্র জগদেব (পৃথ্বীরাজের বড়জ্যাঠা) তাঁকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন।

পিতৃহন্তা জগদেব কিন্তু বেশিদিন রাজত্ব করতে পারেন নি। ১১৫৩ সালে তাঁর ছোটভাই বিগ্রহরাজ তাঁকে তাড়িয়ে দিয়ে আজমীরের রাজা হন। তিনি দিল্লীসহ নিকটবর্তী বহু রাজ্য জয় করেন। ১১৬৩ সালে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর সাত বছর পরে জগদেবের ছেলে খুড়তুতো ভাইকে তাড়িয়ে ১১৭০ সালে আজমীরের সিংহাসনে বসেন। তাঁর কোন সন্তান না থাকায় তাঁর মৃত্যুর পরে মন্ত্রীরা পৃথ্বীরাজের বাবা অর্থাৎ অর্নোরাজের কনিষ্ঠ পুত্র সোমেশ্বরকে সিংহাসনে বসান। সোমেশ্বরের মৃত্যুর পরে পৃথ্বীরাজ দিল্লী ও আজমীরের রাজা হন।

কিন্তু পৃথ্বীরাজের কথা থাক্, এখন আনাসাগরের কথাই ভাবা যাক্। আনাসাগরের সৌন্দর্যে মুগ্ধ হয়ে প্রকৃতি-প্রেমিক সম্রাট জাহাঙ্গীর সেই বাঁধের ধারে একটি উদ্যান রচনা করেন। এই উদ্যানই দৌলতবাগ।

সৌন্দর্যপ্রিয় সম্রাট শাজাহান সেই বাঁধের ওপরে ৩৭৮ মিটার দীর্ঘ মসৃণ একটি শ্বেতপাথরের নিচু পাঁচিল (parapet) এবং পাঁচটি চমৎকার ছত্রী বা চাতাল (pavilion) তৈরি করে দিয়েছেন।

সুদূর অতীত থেকেই আজমীর শিক্ষা সংস্কৃতি ও সমাজসেবার ক্ষেত্রে রাজস্থানের অন্যান্য শহরের চেয়ে বেশি অগ্রসর। বিখ্যাত সারদা আইনের জনক শ্রীসারাদার জন্মস্থান আজমীর। মনোমুগ্ধকর প্রাকৃতিক পরিবেশ অবস্থিত এখানকার মেয়ো কলেজ একটি ভারত বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান।

জন্মশতবর্ষ উদ্‌যাপনের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে মেয়ো কলেজ আজও ভারতের একটি সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আজমীর শহরের উপকণ্ঠে সুবিশাল এলাকা নিয়ে কলেজ। চারিদিকে শুধুই সবুজের মেলা। পিচঢালা পথের পাশে গাছের সারি আর গাছে গাছে পাখির কাকলি। পথের ধারে কোথায় সবুজ মাঠ কোথাও বা প্রাসাদোপম অট্টালিকা—ছাত্রাবাস। শ্বেতপাথরে নির্মিত কলেজের প্রধান বাড়িটিকে দূর থেকে দেখে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ বলে মনে হয়।

কেবল পড়াশুনা নয়, সেইসঙ্গে খেলাধুলার প্রতিও সমান নজর কর্তৃপক্ষের। অশ্বারোহণ থেকে সাঁতার পর্যন্ত যাবতীয় খেলাধুলার ব্যবস্থা রয়েছে। আছে ডজনখানেক খেলার মাঠ, গোটাআটেক টেনিসকোর্ট, দুটি সুইমিং পুল ও একটা বেশ বড় প্যাভেলিয়ান। দেখে চোখ

জুড়িয়ে যায়। অতএব আজমীর ভ্রমণে এসে মেয়ো কলেজ একটি অবশ্য দর্শনীয় স্থান।

তারাগড় পাহাড়ের পাদদেশে হিন্দু স্থাপত্য-শৈলীর এক বিস্ময়কর অবদান আড়াই দিন-কা ঝোপড়া।

অনেকে বলেন যে পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করার পরে মোহম্মদ ঘুরী স্থানীয় স্থপতিদের আদেশ দিয়েছিলেন—আড়াই দিনের মধ্যে তাঁর জন্য একটি প্রার্থনা গৃহ তৈরি করে দিতে হবে। আড়াই দিনে নির্মিত বলে এর নাম হয়েছে আড়াই দিন-কা ঝোপড়া। কথাটা কিন্তু বিশ্বাসযোগ্য নয়। কারণ এমন অপরূপ স্থাপত্যকলা সমন্বিত কোন মসজিদ আড়াই দিনে নির্মাণ করা সম্ভব নয়। আর মুসলমানের উপসনাগৃহে হিন্দু স্থাপত্যকলার এত প্রাচুর্য বা থাকবে কেন?

অনেকে বলেন পরবর্তীকালে পাঞ্জাব সাহেব উর্স (উৎসব) উপলক্ষে ফকিররা আজমীরে এসে ঐ গৃহে আড়াই দিন বাস করতেন বলে এর নাম হয়েছে দিন-কা ঝোপড়া।

যে কারণেই অনিন্দ্যসুন্দর নিবাসটির এই বিচিত্র নাম হয়ে থাকুক, এটি পর্যটকদের একটি অবশ্য দর্শনীয় স্থান। প্রখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিৎ জেনারেল আলেকজান্ডার কানিংহ্যামের মতে—**'For gorgeous prodiaglity of ornament, beautiful richness of tracery, delicate sharpness of finish, laborious accuracy of workmanship, endless variety of detail, all of which are due to the Hindu masons, this building may justly vie with the noblest buildings which the world has yet produced'.**

।। সাত।।

শেষরাতে রোজই ঘুমের চোখে পায়ের কাছ থেকে কম্বলখানি টেনে আনতে হয়। সকালের দিকেও চাদরটা গায়ে না জড়ালে শীত করে। কিন্তু একটু বেলা বাড়লেই গরম লাগতে থাকে। চাদর তখন বোঝায় পরিণত হয়। আজ তাই আমি চাদর গাড়িতে রেখে এসেছি। কিন্তু বাস ছাড়ার পরে বুঝতে পারছি, কাজটা ঠিক হয় নি। বড্ড হাওয়া, বেশ একটু শীত শীত করছে।

শঙ্করী বোধহয় বুঝতে পারে আমার অবস্থা, তাই সে জানলাটা বন্ধ করে দিতে চায়। আমি বাধা দিই। বলি, "শীত সইতে পারব, কিন্তু সংযুক্তা পৃথ্বীরাজের আজমীর অদর্শনের জ্বালা সইতে পারব না।"

আমরা এখন পুষ্কর চলেছি। আজমীর শহরের ওপর দিয়ে বাস চলেছে। আজমীরের ১১ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে পুষ্কর।

সকাল সাড়ে সাতটায় রওনা হয়েছি আজমীর স্টেশন থেকে। বাস আসতে দেরি করল, নইলে আমরা আরও আগে বেরিয়ে পড়তে পারতাম, আজ সকালে যে ব্রেকফাস্টে হাঙ্গামা ছিল না। অনেকে বেড-টি পর্যন্ত মুখে দেন নি। পুষ্করে পিতৃকার্য করবেন কিনা!

আমিও পিতৃকার্য করব কিন্তু আমি চা খেয়ে নিয়েছি—এককাপ নয়, দু কাপ। এবং তা নির্ভয়েই খেয়েছি। কারণ যাঁর অমর আত্মার তুষ্টি বিধানের নিমিত্ত আমি আজ তীর্থরাজ পুষ্করে শ্রাদ্ধ-কার্য করব, আমার সেই পরমারাধ্য পিতৃদেব যে চা বড়ই ভালবাসতেন।

সহসা শঙ্করী বলে ওঠে, "আজমীর শুধু সুন্দর নয়, বেশ বড় শহর ঘোষদা!"

শ্রীর একটু সর্দি-জ্বরের মতো হয়েছে বলে সে আজ সামনের সারিতে মায়ের কাছে বসেছে। শঙ্করী এসেছে তার জায়গায়—আমাদের সারিতে।

"হ্যাঁ?" আমি উত্তর দিই, "বর্তমান আয়তন সাড়ে পঁয়তাল্লিশ বর্গ কিলোমিটারের মতো।"

"জনস খ্যা?" আরেক পাশ থেকে বিউটি প্রশ্ন করে।

"গত আদমশুমারি অনুযায়ী আজমীর শহরের জনসংখ্যা ২,৬২,৮৫১ জন, তাঁদের মধ্যে ১,২৩,৬২২ জন নারী এবং ১,৩৯,২২৯ জন পুরুষ।"

"?· ঘোষদা, আপনার মনেও থাকে!" সামনের সিট থেকে পূর্ণিমা মন্তব্য করে।

একটু হেসে বলি, "থাকে না মনে রাখতে হয়। আর এটা শুধু আমার নয়, প্রতি পর্যটকের অবশ্য কর্তব্য। কোন জায়গায় বেড়াতে যাবার আগে যদি সেই জায়গা সম্পর্কে সামান্য কিছু পড়াশুনা না করে নাও, তাহলে ভ্রমণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে।"

ওরা চুপ করে রয়েছে দেখে আমি আবার বলি, "১৯৭১ সালের আদমশুমারির সময়ে এই শহরের ৪৬,২০৫টি বাড়িতে ৪৭,৬৫৬টি পরিবার বাস করতেন। ২৬°২৭' উঃ অক্ষরেখা এবং ৭৪°৩৭' পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত এই শহর।"

"শুনেছি মহাভারতের যুগে আজমীর নাকি বিদুরের রাজ্য ছিল?" পেছনের সিট থেকে বৌদি প্রশ্ন করেন।

"হ্যাঁ।" উত্তর দিই।

"তাহলে তো আজমীর অন্তত তিন হাজার বছরের পুরনো শহর?" সরকারদা বলেন।

"তা বলা যেতে পারে বৈকি! তবে কোন কারণে সম্ভবত সে শহর ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম শতাব্দীতে চৌহানরাজ অজয়পাল এখানে আবার জনপদ প্রতিষ্ঠা করেন এবং দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে চৌহান নরপতি অজয়রাজ সেই জনপদকে একটি সমৃদ্ধ নগরে পরিণত করেন। এখানকার বিখ্যাত আড়াই দিন-কা ঝোপড়াতে একখানি শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে, তাতে লেখা আছে—দ্বাদশ শতাব্দীতে চৌহান সাম্রাজ্য উজ্জয়িনী পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল!"

"আচ্ছা মামু!" এবারে কথা বলে বিউটি, "সোমনাথ মন্দির লুঠ করতে যাবার সময় একবার সুলতান মামুদ নাকি আজমীরের মধ্য দিয়ে গিয়েছিলেন?"

"হ্যাঁ। এবং যাবার পথে এখানকার সমস্ত দেবালয় ও দেবমূর্তি ধ্বংস করেছিলেন।"

"কিন্তু ঘোষদা পৃথ্বীরাজ তো দিল্লীর রাজা ছিলেন! তাহলে কি আজমীর তখন দিল্লীর অধীনে ছিল?" শঙ্করী জিজ্ঞেস করে।

উত্তর দিই, "না। অনেকের মতে দিল্লীর পুত্রহীন রাজা অনঙ্গপালের মেয়ে কমলা হলেন পৃথ্বীরাজের মা। পৃথ্বীরাজ মাতামহের রাজ্য পেয়েছিলেন। আবার অনেকে বলেন পৃথ্বীরাজের জ্যাঠামশাই বিগ্রহরাজই দিল্লী জয় করেছিলেন।"

"পৃথ্বীরাজের বাবার নাম কি?"

"সোমেশ্বর আর তার পিতামহ হলেন অর্নোরাজ।"

"সংযুক্তা ও পৃথ্বীরাজের কাহিনী সম্পর্কে আপনার কি ধারণা। ওটা কি সত্য?"

"মিথ্যে মনে করার কি কারণ থাকতে পারে? সুপ্রাচীন কাল থেকেই তো আমাদের দেশে স্বয়ংবর প্রথার প্রচলন অর্থাৎ কুমারীদের স্বামী নির্বাচনের স্বাধীনতা ছিল। তাছাড়া মেয়েদের বীরপূজা এবং বীরদের রূপসী অপহরণ কিছু নতুন নয় আমাদের দেশে। আবার মূর্তির মধ্যে পৃথ্বীরাজের লুকিয়ে থাকা এবং সেই মূর্তির গলায় সংযুক্তা বা সংযোগিতার মালা দেবার

কাহিনীটিও অবিশ্বাস্য নয়। কারণ সে যুগে ঈর্ষাপরায়ণ রাজারা এইভাবে মূর্তি নির্মাণ করে দরজায় দাঁড় করিয়ে রেখে তাঁদের প্রতিদ্বন্দ্বীদের অপমান করতেন। তাছাড়া সংযুক্তার অসামান্য রূপ পৃথ্বীরাজের অসাধারণ বীরত্বের কথা ইতিহাস স্বীকার করে নিয়েছে।"

"জয়চাঁদ যেন কোথাকার রাজা ছিলেন মামু?"

"কনৌজের।" আমি কিছু বলতে পারার আগেই শঙ্করী বিউটির প্রশ্নের উত্তর দেয়, "তবে তিনি অধিকাংশ সময়েই বারাণসীতে বাস করতেন।"

"সমসাময়িক মুসলমান লেখকগণ কিন্তু জয়চাঁদকে তৎকালীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতির মর্যাদা দিয়েছেন।" দাদা আমাদের আলোচনায় অংশ নেন।

মৃদু হেসে বলি, "খুবই স্বাভাবিক, কারণ জয়চাঁদ মোহম্মদ ঘুরীর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন নি। তবে তিনি যে গোড়া থেকেই পৃথ্বীরাজের প্রতি ঈর্ষপরায়ণ ছিলেন এবং সংযুক্তা তাঁর অমতেই পৃথ্বীরাজকে বিয়ে করেছিলেন, সে সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। তিনি এই বিবাহে এতখানি ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন যে উত্তর ও মধ্যভারতের ছোট-বড় সমস্ত রাজারা যখন মোহম্মদ ঘুরীর বিপক্ষে পৃথ্বীরাজের পতাকাতলে সমবেত হয়েছিলেন, তখন জয়চাঁদ দূরে সরে রয়েছেন। তাঁর মানে অবশ্য এ নয় যে জয়চাঁদ ঘুরীকে ডেকে এনেছিলেন। আর সেদিন জয়চাঁদ পৃথ্বীরাজের পক্ষে এলেই যে ঘুরী পরাজিত হতেন সেকথাও মনে করবার কোন কারণ নেই! তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে ঘুরীর জয়লাভের উৎস তাঁর সৈন্যবল নয়, বুদ্ধিবল। পৃথ্বীরাজ নির্বোধ ছিলেন না কিন্তু মহম্মদ ঘুরী যে ছলনার অবতারণা করেছিলেন, সত্যাশ্রয়ী পৃথ্বীরাজ তা বুঝতে পারেন নি। পৃথ্বীরাজের সবচেয়ে বড় অপরাধ তিনি মিথ্যেবাদী মহম্মদ ঘুরীকে বিশ্বাস করেছিলেন।"

"তরাইনের প্রথম যুদ্ধে তো পৃথ্বীরাজ জয়লাভ করেছিলেন, তাই না ঘোষদা?" আমি থামতেই সেজদি প্রশ্ন করেন।

"হ্যাঁ।" উত্তর দিই। বলতে থাকি, "১১৯১ খ্রীস্টাব্দে পৃথ্বীরাজ দু'লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য ও তিন হাজার সৈন্য বোঝাই হাতি নিয়ে থানেশ্বরের কাছে তরাইনের প্রান্তরে মোহম্মদ ঘুরীর সম্মুখীন হয়েছিলেন। সেই প্রবল প্রতিরোধের সামনে মহম্মদের সৈন্যরা দাঁড়াতে পারে নি। মহম্মদ সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়ে কোন রকমে প্রাণ নিয়ে পালিয়েছিলেন। শোনা যায় পৃথ্বীরাজ সেবার নাকি সুযোগ পেয়েও মোহম্মদকে বন্দী কিংবা হত্যা করেন নি। কারণ যুদ্ধক্ষেত্র যে ন্যায়নীতির সীমারেখার ওপরে অবস্থিত, একথা ভারতের মানুষদের কাছে তখনও অজানা ছিল।

"পরাজিত মোহম্মদ কিন্তু নিরাশ হন নি। নতুন শক্তি সঞ্চয় করে পরের বছর তিনি একলক্ষ বিশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে সেই একই যুদ্ধক্ষেত্রে পৃথ্বীরাজের সম্মুখীন হলেন। লাহোর পৌঁছে ঘুরী পৃথ্বীরাজকে চরমপত্র পাঠালেন। লিখলেন—আমার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার কর, ইসলামকে বরণ কর।

"বলা বাহুল্য পৃথ্বীরাজ ঘৃণার সঙ্গে সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে ঘুরীকে উপদেশ দিলেন—ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে যাও। আমি কথা দিচ্ছি, তোমাকে কোন উৎপীড়ন করব না।

"তিন লক্ষ অশ্বারোহী সৈন্য নিয়ে পৃথ্বীরাজ মোহম্মদ ঘুরীর সম্মুখীন হলেন। ঘুরী বুঝতে পারলেন, ন্যায় যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের সঙ্গে এঁটে ওঠা সম্ভব হবে না। তাই তিনি ছলনার আশ্রয়

নিলেন।

"ঘুরীর প্রায় সমসাময়িক মুসলমান ঐতিহাসিক হাসান নিজামি এ সম্পর্কে লিখে গিয়েছেন—The Sultan in order to deceive him and throw him of his guard replied. "It is by command of my brother, my soverign, that I come here and endure trouble and pain ; give me sufficient time that I may despatch an intelligent person to my brother to represent to him an account of Thy power, and that I may obtain his permission to conclude a peace with Thee under the terms that Tarhind, the Punjib and Multan shall be ours, and the rest of the country Thine..."

"ঘুরীর উদ্দেশ্য সফল হলো, পৃথ্বীরাজ তাঁকে বিশ্বাস করলেন। আর তারই ফলে ঘুরী অপ্রস্তুত রাজপুতদের অতর্কিত আক্রমণে পরাজিত করতে সক্ষম হলেন। তাহলেও তরাইনের প্রান্তরে সেদিন দশ হাজার রাজপুত প্রাণ বিসর্জন দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন যে রাজপুতনার মানুষ দেশের জন্য বীরের মৃত্যু বরণ করতে পারে।

"ঘুরী বন্দী পৃথ্বীরাজকে আজমীরে নিয়ে এলেন। তাঁর মৃত্যুদণ্ড হলো। বছর ঘুরে না আসতেই সংযুক্তার সিঁথির সিঁদুর গেল মুছে।

"অনেক অবশ্য বলেন ঘুরী পৃথ্বীরাজকে হত্যা করেন নি, তাঁর চোখ দুটি নষ্ট করে দিয়ে তাঁকে বন্দী করে রেখেছিলেন এবং পৃথ্বীরাজ শেষ পর্যন্ত ঘুরীর বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ নিতে সমর্থ হয়েছিলেন।"

"কেমন করে?" আমি থামতেই সরকারদা প্রশ্ন করেন।

"১২০৬ খ্রীস্টাব্দের ১৫ই মার্চ লাহোর থেকে গজনী যাবার পথে ঘুরী কয়েকজন আততায়ীর দ্বারা ছুরিকাহত হন। এই আততায়ীদের প্রকৃত পরিচয় আজও পাওয়া যায় নি। রাজপুতরা বিশ্বাস করেন যে সেই আততায়ীরা রাজপুতনার মানুষ। এবং অন্ধ পৃথ্বীরাজের নির্দেশেই তাঁরা মোহম্মদকে হত্যা করেছিলেন। তাঁদের এ বিশ্বাস অমূলক নয়, কারণ কয়েকজন মুসলমান ঐতিহাসিকও এই কাহিনীকে সত্য বলে স্বীকার করে নিয়েছিলেন।"

"আচ্ছা ঘোষদা", শঙ্করী জিজ্ঞেস করে, "অনেকে বলেন, ভারতের ইতিহাসে তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের প্রভাব, ১৭৬১ সালের পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের চেয়ে কম নয়। আপনার এ সম্পর্কে কি ধারণা।"

"তাঁরা ঠিকই বলেন।" আমি উত্তর দিই, "কারণ তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ শুধু শক্তিশালী চৌহান রাজত্বের অবসান ঘটায় নি, ভারতে বিদেশী শাসনের পথ খুলে দিয়েছে।"

"মামু!" বিউটি বলে, "আপনি বললেন, বছর না ঘুরে আসতেই সংযুক্তার সিঁথির সিঁদুর মুছে গেল। সংযুক্তার স্বয়ংবর কি তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের মাত্র একবছর আগে হয়েছিল?"

"তার বেশি নয়, কারণ পৃথ্বীরাজ তরাইনের প্রথম যুদ্ধে জয়লাভের পরে কনৌজের স্বয়ংবর সভা থেকে সংযুক্তাকে আজমীর নিয়ে আসেন। তোমরা জানো যে পরের বছরই তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ হয়েছিল।"

বিউটি মাথা নাড়ে।

সরকারদা বলেন, "অনেকে কিন্তু মনে করেন যে পৃথ্বীরাজের এই অধঃপতনের মূলে তাঁর কলহপ্রিয় প্রকৃতি। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে পরাজিত হবার পরে মোহম্মদ ঘুরী যখন আহার-

নিদ্রা পরিত্যাগ করে প্রতিশোধ নেবার জন্য শক্তি সঞ্চয় করছিলেন, পৃথ্বীরাজ তখন তাঁর প্রতিবেশীদের সঙ্গে অযথা যুদ্ধ করে শক্তিক্ষয় করেছেন।"

"কথাটা মিথ্যে নয়, প্রতিবেশীদের সঙ্গে প্রীতির সম্পর্ক বজায় রাখলে হয়তো পৃথ্বীরাজের এমন পরাজয় হতো না। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে পৃথ্বীরাজের ব্যক্তিত্ব ও বীরত্ব, তাঁর সৈন্য পরিচালনার ক্ষমতা, দুর্বলের প্রতি মমতা এবং সাধু ও পণ্ডিতদের প্রতি শ্রদ্ধা, তাঁকে নিঃসন্দেহে সে যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ নরপতির আসনে বসিয়েছে। দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি বীরের মৃত্যু বরণ করেছেন। ভারতের ইতিহাসে তাঁর নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।"

"ঐযে সামনে পুষ্কর শহর দেখা যাচ্ছে।" পাঁচুবাবুর কথায় আমাদের আলোচনায় ছেদ পড়ে।

তাড়াতাড়ি সামনেই তাকাই। হ্যাঁ, পাঁচুবাবু ঠিকই বলেছেন। ছবির মতো সুন্দর একটি জনপদ ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছে। মসৃণ ও সমতল পথ দিয়ে বাস ছুটে চলেছে। পথের দু'পাশে বেশ খানিকটা দূরে, পাহাড়ের ধূসর রেখা।

২৬°৩০ উঃ অক্ষরেখা এবং ৭৪°৩৬ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত পুষ্কর আজমীর জেলার একটি ছোট শহর! আয়তন মাত্র ৩৬ বর্গকিলোমিটার। উচ্চতা ২৩৮৯ ফুট। ১৯৭১ সালের জনগণনার সময়ে জনসংখ্যা ছিল ৭৩৪১ জন। তাঁদের মধ্যে ৩৯৭৯ জন পুরুষ আর ৩৩৬২ জন নারী। ১৫০৯টি বাড়িতে ১৫৪২টি পরিবার নিয়ে এই তীর্থপ্রধান প্রাচীন জনপদ।

পুষ্কর অতি প্রাচীন তীর্থ। তবে মহাভারতের যুগে এখানে নাকি ম্লেচ্ছরা বাস করতেন। তখন নাম ছিল পোখ্‌রা। সাঁচীতে আবিষ্কৃত খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের শিলালিপিতে পুষ্করতীর্থের উল্লেখ রয়েছে।

বৌদ্ধযুগে গয়া কাশী ও মথুরার মতো পুষ্করও বৌদ্ধধর্মের একটি প্রধান প্রচারকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা কমে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পুষ্করও জনবিরল হয়ে পড়ে।

কিছুকাল পরে পদম সেন নামে জনৈক জৈনরাজা এখানে একলক্ষ গৃহ নির্মাণ করে পদ্মাবতী নামে এক নগরীর পত্তন করেন। সেই নগরীতে নাকি কোন দরিদ্র আগন্তুক এলে প্রতি গৃহস্থ তাঁকে একটি করে মুদ্রা ভিক্ষা দিতেন। আগন্তুক সেই লক্ষ মুদ্রা দিয়ে ব্যবসা আরম্ভ করতেন। এই নিয়মের নাম ছিল 'কোকান তীরথ্।'

কালক্রমে পদ্মাবতী নগরীর জৈনরা একটু সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হয়ে পড়লেন। এই সময় একজন যোগী সেই নগরে এলেন। তিনি এখানে বারো বছর ধরে তপস্যা করলেন। তপস্যাভঙ্গের পরে যোগী দেখতে পেলেন যে তাঁর এক শিষ্যের মাথা থেকে রক্ত ঝরছে। যোগী বিস্মিত হলেন—তাঁরা জৈন নগরীতে বাস করছেন! জৈনরা তো কখনও কাউকে আঘাত করেন না।

গুরুদেব প্রশ্নের উত্তরে শিষ্য জানালেন—জৈন নাগরিকরা জৈন ছাড়া আর কাউকে ভিক্ষা দেন না। তাই পেটের দায়ে তাঁকে কাঁটার বোঝা মাথায় বইতে হয়েছে।

ক্রুদ্ধ যোগীর অভিশাপে প্রবল প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘনিয়ে এলো পদ্মাবতীর আকাশে, নগরী ধ্বংস হয়ে গেল।

বহুকাল পরে খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দীর কোন এক রৌদ্রদীপ্ত মধ্যাহ্নে নরহর রাও নামে মান্দোরের একজন পরিহার রাজা শিকারে বেরিয়েছিলেন। বনের মাঝে একটি সুবিশাল সরোবর

দেখতে পেয়ে তৃষ্ণার্ত রাজা ছুটে এলেন সেখানে। ঘোড়া থেকে নেমে তিনি আঁজলা করে জলপান করলেন। তারপরই দেখতে পেলেন তাঁর হাত থেকে শ্বেতীর দাগগুলি মিলিয়ে গেছে। রাজা সেই সরোবর সলিলের শক্তি দেখে মুগ্ধ হলেন। পার্শ্ববর্তী গ্রামের অধিবাসীদের কাছে খবর নিয়ে জানতে পারলেন যে সেই সুবিশাল সরোবরই পিতামহ ব্রহ্মার যোগতীর্থ পুষ্কর হ্রদ।

রাজা তখন সেই পুণ্যতীর্থকে রক্ষা করার জন্য হ্রদের চারিদিকে বাঁধ নির্মাণ করে দিলেন। তৈরি করলেন ধর্মশালা। প্রচার করলেন তীর্থরাজ পুষ্করের অলৌকিক শক্তির কথা। পুষ্কর পুনরায় হিন্দুতীর্থে পরিণত হলো। ধন্য আমি, আজ সেই পুণ্যক্ষেত্রে আসতে পেরেছি।

আজমীর স্টেশন থেকে রওনা হবার ঠিক আধঘণ্টা পরে অর্থাৎ সকাল আটটার সময় ধর্মশালার সামনে আমাদের বাস থামল। পথের বাঁদিকে বেশ বড় বাড়ি। নাম—ভাই পেসুমল নারায়ণ দাস সিন্ধী ধর্মশালা। ১৯২৩ খ্রীস্টাব্দে নির্মিত।

ছোট শহর হলেও বড় তীর্থ। সুতরাং পঁচিশটি ধর্মশালা আছে পুষ্করে। মেলার সময় ছাড়া এখানে যাত্রীদের বড় একটা স্থানাভাব হয় না।

এ ধর্মশালাটি হ্রদের খুবই কাছে অবস্থিত। কিন্তু রিজার্ভড বলেই আমরা এ পর্যন্ত বাসে আসতে পেরেছি। লাইনের বাসে এলে প্রায় এক কিলোমিটার দূরে বাসস্ট্যান্ডে নামতে হতো। আজমীর থেকে সারাদিনই পুষ্করে বাস ট্যাক্সি ও টাঙ্গা যাতায়াত করে।

ম্যানেজার আলো-হাওয়াযুক্ত তিনখানি বড় বড় ঘর নিয়েছে। অহীন ও বাণেশ্বর সতরঞ্চি বিছিয়ে দিয়েছে। রমানাথ ও গৌর রান্নার আয়োজন করছে পাঁচু পাণ্ডার সঙ্গে কথা বলছে। বাংলাতেই তাঁদের কথাবার্তা হচ্ছে।

শুধু পাণ্ডাজী নয় ধর্মশালার চৌকিদার থেকে পথের দোকানদার পর্যন্ত এখানে প্রত্যেকেই বাংলা বুঝতে পারছেন এবং ভাঙা বাংলা বলছেন। তীর্থযাত্রীরাই তীর্থরাজ পুষ্করের লক্ষ্মী। আর তাঁদের অধিকাংশই বাংলা থেকে আসেন। তাই পুষ্করবাসীদের বাংলা শিখতে হয়েছে।

পণ্ডাজীর সঙ্গে বেরিয়ে আসি ধর্মশালা থেকে। বড় রাস্তা পেরিয়ে একটি পায়ে চলা মাটির পথ ধরে এগিয়ে চলি।

মাত্র মিনিট তিনেক হেঁটে হ্রদের তীরে পৌঁছই—পিতামহ ব্রহ্মার প্রিয়তম সরোবর পুষ্কর।

তাড়াতাড়ি ছুটে এসে জলস্পর্শ করি, মাথায় ও গায়ে অমৃতবারি সিঞ্চন করি। পুণ্য সলিলের পরশে আমার মনে পড়ে সেই পুণ্য কাহিনী। আমি ভেবে চলি—

একদিন লোকপিতামহ ব্রহ্মার মনে কোন পুণ্যভূমিতে যজ্ঞ করবার বাসনা হলো। পদ্মফুল হাতে নিয়ে তিনি সেই পুণ্যভূমির সন্ধান শুরু করলেন। পদচারণা করতে করতে ব্রহ্মা এক মনোরম বনময় পার্বত্য প্রদেশে উপস্থিত হলেন। হঠাৎ তিনি হাত থেকে একটি পদ্ম মাটিতে ফেলে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে মহাশব্দে চতুর্দিক প্রকম্পিত হয়ে উঠল। সৃষ্টি হলো এক পরম-রমণীয় হ্রদ।

এই সেই হ্রদ। ব্রহ্মা এখানেই বেদি নির্মাণ করে তাঁর ইপ্সিত যজ্ঞ সমাধা করেছিলেন।

এদিকে সেই পদ্মপতনের মহাশব্দে আকৃষ্ট হয়ে দেবগণ এসে উপস্থিত হলেন এখানে। ব্রহ্মা তাঁদের বললেন—এখানে বজ্রনাভ নামে এক বালকহন্তা অসুর বাস করছিল। জগতের মঙ্গলের জন্য আমি তাকে কমলপাতে বিনাশ করেছি। আবার কমল দর্শন করে সেই অসুরও পুণ্যলোকে গমন করেছে। আমার এই নিক্ষিপ্ত পদ্মে সৃষ্ট হয়েছে বলে এই হ্রদ পুষ্কর নামে খ্যাত হবে। আমার

এই পুণ্য যজ্ঞভূমি জগতের সকল প্রাণীর কাছে চিরকাল পুণ্যপ্রদ-মহাতীর্থরূপে অক্ষয় হয়ে থাকবে।

শান্ত সুন্দর সুবিশাল সরোবর। প্রায় চারিদিকেই ঘাট আর একদিকে সুরমা অট্টালিকার সারি—পুষ্কর শহরের অভিজাত পল্লী। পুষ্কর শুধু তীর্থ নয়, স্বাস্থ্যকর স্থানও বটে। তাই ধনীরা হ্রদের তীরে বড় বড় বাড়ি তৈরি করেছেন। তাঁদের প্রাসাদের পেছনে, বহুদূরে আরাবল্লীর ধূসর রেখা। শুনেছি অনেকে এই হ্রদ পরিক্রমা করেন। পাহাড়ী পথে তাঁদের প্রায় পাঁচ ক্রোশ হাঁটতে হয়।

হ্রদের ঠিক মাঝখানে ছোট একটি দ্বীপ। সেখানে চারিদিক খোলা গম্বুজাকৃতি শ্বেতপাথরের একটি ক্ষুদ্রকায় মন্দির। পাণ্ডাজী বলেন, "ঐ দ্বীপটি হলো পিতামহ ব্রহ্মার যোগস্থল—শিবমন্দির। আপনারা জানেন—গঙ্গা সকল তীর্থের মাতা, প্রয়াগ সকল তীর্থের পিতা আর এই পুষ্কর হলো সকল তীর্থের গুরু। ছেচল্লিশটি ঘাট আছে এই তীর্থরাজ পুষ্করে।"

আমাদের এই ঘাটটির নাম সাবিত্রীঘাট। পাশেরটি ব্রহ্মাঘাট। ব্রহ্মাকে ফেলে সাবিত্রীর কাছে আসার কারণ এ ঘাটটি বড় এবং নতুন, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ঘাটসহ প্রথমদিকের কয়েক ধাপ শ্বেতপাথরের সিঁড়ি। পাশেই একটি বটগাছ। তার ছায়ায় ঘাটটি শীতল। কে এই ঘাট তৈরি করেছেন জানি না। তবে শুনেছি, অহল্যাবাঈ এই হ্রদের তীরে একাধিক ঘাট নির্মাণ করে দিয়েছেন।

পাণ্ডাজী আরও জানান, "এখানে পুণ্যার্থীরা সাধারণত দু'রকমের কাজ করে থাকেন, দান অথবা শ্রাদ্ধ। দান করতে হলে ব্রাহ্মণকে মূল্যবাবদ ৫ টাকা সাত আনা এবং দক্ষিণা ।৯/০ আনা অর্থাৎ মোট ৬ টাকা দিতে হয়। শ্রাদ্ধ করতে হলে আরও দুটি টাকা অতিরিক্ত খরচ পড়ে। এখন আপনারা কে কি কাজ করবেন আমাকে জানালেই আমি সেইমত ব্যবস্থা করব।"

নিজেদের মধ্যে পরামর্শের পরে আমরা পিতৃলোকের তৃপ্ত্যর্থে দান করাই সাব্যস্ত করলাম।

হ্রদের জল ভালই। অন্তত বহু পুণ্যতীর্থের পুণ্যকুণ্ডের চেয়ে পরিষ্কার। আমরা স্নান করলাম। কতটা পুণ্য সঞ্চিত হলো ব্রহ্মাজী বলতে পারেন, তবে মনটা ভাল লাগছে।

স্নান শেষে বোতলটিতে জল ভরে নিই। হাসি পাচ্ছে আমার। আমি দুর্গম গিরিতীর্থ গোমুখী কিংবা মণিমহেশ থেকে জল আনি নি, অথচ আজ সযত্নে পুষ্করের জল বোতলে ভরছি! কি করব? সেদিন আগ্রাফোর্ট স্টেশনে মানসী যে এই বোতলটা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে বলেছে—পুষ্করের জল নিয়ে এসো।

ঘাটে উঠে দেখি, পাণ্ডাজীর সহকারী একসারিতে সাতটি পাত্র সাজিয়ে ফেলেছেন। চাল-ডাল তরি-তরকারি বাসনপত্র ও বস্ত্র—সবই রয়েছে। দাদা সত্যেনদা সরকারদা বড়ঠাকুরমা দিদি ও শঙ্করী নিজেদের জায়গায় বসে পড়েছে। জলের বোতলটা একপাশে রেখে আমিও খালি জায়গাটিতে বসে পড়ি।

গান্ধীটুপি মাথায় দিয়ে পাণ্ডাজী পায়চারি করতে করাতে মন্ত্রপাঠ আরম্ভ করেন। স্বর্গত পিতৃদেবের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে আমি সতীর্থদের সঙ্গে মন্ত্রপাঠ করতে থাকি—'ওঁ কুরুক্ষেত্রং গয়া গঙ্গা, প্রভাস পুষ্করাণি চ, তীর্থান্যেতানি পুণ্যানি, দানকালে ভবন্তি হ।'...

ভোজ্যদানের পরে ভিজে কাপড় পালটে ধর্মশালার দিকে রওনা দিই।

থামতে হয়। প্যান্ট-শার্ট পরা একটি সুদর্শন কিশোর আমার পথ আগলে দাঁড়িয়েছে। একটু

দূরে ঘাটের কোণে বসিয়ে রাখা দু'টি শিব ও গণেশ মূর্তি দেখিয়ে সে আমাকে বলে "মহারাজ শিউজীকো পানি দেও, গণেশজীকো পানি দেও।"

কি বিপদ! মানসীর জলটুকু বাবা মহাদেব ও দাদা গণেশকে দিয়ে দিলে যে আবার আমাকে জলে নেমে বোতল ভরতে হবে!

কিশোরটি বোধহয় আমার জলদানের অনিচ্ছার কথা বুঝতে পারে। তাই আবার বলে, "ঠিক হ্যায়, পানি মাত দেও, দক্ষিণা দেও।"

আর দ্বিরুক্তি না করে, তাড়াতাড়ি তার হাতে একটি সিকি গুঁজে দিই। সে খুশি মনে আমার পথ ছেড়ে দেয়।

কিন্তু আমি এগোতে পারি না। ইতিমধ্যে কয়েকটি ছোট-ছোট ছেলে-মেয়ে ঘেরাও করেছে আমাকে। তারা সমবেত কণ্ঠে দাবি করতে থাকে, "মহারাজ, পৈসা দেও, পৈসা..."

দাবি তাদের খুবই সামান্য, পুষ্কর যে দরিদ্র ভারতের পুণ্যতীর্থ। একটি করে পাঁচ পয়সা ওদের হাতে দিতেই তারা সকৃতজ্ঞ চিত্তে ঘেরাও তুলে নেয়।

ঘাট থেকে ধর্মশালায় আসবার পথেও কয়েকজন প্রার্থীকে পয়সা দিতে হয়। ওরা যে আমাদেরই পথ চেয়ে বসে আছে পথের ধারে। গ্রীষ্ম বর্ষা ও শীত উপেক্ষা করে। ওরা তীর্থের নারায়ণ। ওদের মুখে হাসি না ফুটলে তীর্থদেবতা দুঃখ পান। দান ছাড়া তীর্থদর্শন অর্থহীন।

ধর্মশালায় এসে ভরপেট লুচি ও হালুয়ার সঙ্গে গরম চা পাওয়া গেল। ব্রেকফাস্টের পরে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে সহযাত্রীরা সাবিত্রী পাহাড়ের পথে যাত্রা করলেন। ম্যানেজার সঙ্গে যাচ্ছে না, কিচেন ম্যানেজ করবার জন্য সে এখানেই থাকছে। অহীন ও জ্ঞান আমাদের 'গাইড' করবে।

বৃদ্ধ এবং অশক্তরা ডুলি চেপে রওনা হলেন—ডুলিভাড়া পঁচিশ টাকা। কিন্তু উকিলবাবু পঞ্চাশ টাকা 'অফার' করেও তাঁর মিসেসের জন্য একটি ডুলি সংগ্রহ করতে সক্ষম হলেন না। ডুলিওয়ালারা বলল যে মিসেস উকিলের উপযোগী ডুলি নাকি কোনকালে তৈরি হয় নি পুষ্করে। অতএব উকিলবাবু তাঁর সাবিত্রীকে ছাড়াই রওনা হলেন সাবিত্রী পাহাড়ে।

তবে মিসেস কিন্তু ধর্মশালায় একা থাকলেন না। মা ও মাসিমাসহ আরও কয়েকজন যাচ্ছেন না সাবিত্রী পাহাড়ে। ওঁদের না যাবার কারণটি অবশ্য ভিন্ন। মিসেস গেলেন না তাঁর দেহের জন্য আর মাসিমারা গেলেন না যাবার প্রয়োজন নেই বলে। তাঁরা এর আগেও পুষ্কর এসেছেন, মা-সাবিত্রীর পুজো দিয়ে গেছেন। অর্থাৎ তাঁরা গেলেন না স্বেচ্ছায় আর মিসেস রইলেন অনিচ্ছায়।

সেকি! শ্রী আর পূর্ণিমা দেখছি রওনা হয় নি এখনও! তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে বলি, "কি ব্যাপার, এত দেরি করছ কেন?"

ম্লান হেসে পূর্ণিমা বলে, "আমি যাবো না ঘোষদা!"

"কেন?"

"শ্রীর শরীরটা ভাল নয়, একটু জ্বর হয়েছে। এই রোদে ওকে এতটা পথ হাঁটিয়ে নিয়ে যাওয়া উচিত হবে না।"

কাছে এসে শ্রীর গায়ের উত্তাপ পরীক্ষা করি। হ্যাঁ, গাটা একটু গরমই মনে হচ্ছে। তাহলেও যেতে না পারার মতো কিছু নয়। মাত্র মাইল তিনেক পথ। এতদূর এসেও ওরা সাবিত্রী পাহাড়ে

যেতে পারবে না!

পূর্ণিমাকে জিজ্ঞেস করি, "তোমার তো ছাতা আছে?"

সে মাথা নাড়ে।

বলি, "এক কাজ করা যাক্, এখানে কুলি পাওয়া যাচ্ছে, একজন নিয়ে নিই। সে শ্রীকে কোলে করে নিয়ে যাবে। চলো ধীরে ধীরে ঘুরে আসা যাক।"

"আমি যাবো মামু। আমি সাবিত্রী পাহাড়ে যাবো।" মা কিছু বলতে পারার আগেই মেয়ে বলে ওঠে।

মা কিন্তু নিরুত্তর। বুঝতে পারছি কর্তব্যবোধ তার তীর্থদর্শনের ইচ্ছাকে দমিয়ে রেখেছে। আমি আবার বলি, "তুমি অযথা ভয় পাচ্ছ। ওর গা-টা একটু গরম হয়েছে মাত্র। ছাতা মাথায় দিয়ে কুলির কাঁধে চড়ে শ্রী নির্বিঘ্নে ঘুরে আসবে।"

"কাঁধে নয়, আমি কোলে চড়ে যাবো মানু!" শ্রী আবদার করে।

আমি তার দাবি মেনে নিই। বলি, "বেশ তাই যেও মা!"

কিন্তু পূর্ণিমা এখনও চুপ করে আছে। তার একেবারেই যাবার ইচ্ছে নেই। তবু বলি, "চলো ঘুরে আসবে। কতটুকুই বা পথ?"

"আমার ভয় করছে ঘোষদা! মেয়ের কিছু হলে, আমি বাড়িতে মুখ দেখাতে পারব না। ওর বাবা ঠাকুরমা ও কাকাদের অমতে আমি ওকে সঙ্গে নিয়ে এসেছি।"

"আমি বলছি তোমার মেয়ের কিছু হবে না, সে দিব্যি ঘুরে আসবে। তাছাড়া কুলির কোলে চড়ে ছাতা মাথায় দিয়ে গেলে, কিই বা হতে পারে? পুষ্করে এসে সাবিত্রী পাহাড়ে যাবে না? শুনেছি বড় সুন্দর জায়গা। মেয়েদের সেখানে যেতেই হয়।"

আর আপত্তি করতে পারে না পূর্ণিমা। তবে বলে, "কিন্তু তার আগে ওকে যে একটু পুষ্করের জল মাথায় দিয়ে আনতে হবে।"

"বেশ চলো।"

শ্রীকে কোলে নিয়ে আবার সেই সাবিত্রী ঘাটে আসি। পূর্ণিমা মেয়ের মাথা ধোয়ায়। মনে মনে সাবিত্রীকে বলি—মুখ রক্ষা কোরো মা! একরকম জোর করেই মেয়েকে নিয়ে তোমার মন্দিরে যাচ্ছি। ওর যেন কোন ক্ষতি না হয়।

ধর্মশালায় ফিরে একজন কুলি ঠিক করি। সে শ্রীকে কোলে নিয়ে পাহাড়ে উঠবে এবং ফিরে আসবে। তাকে পাঁচটি টাকা দিতে হবে।

মায়ের মনের দ্বিধা কিন্তু ঘোচে নি। পথচলা শুরু করার পরেও সে বলে, "ঘোষদা, জানি না মা-সাবিত্রীর মনে কি আছে? তবে ভয় হচ্ছে—কাজটা বোধহয় ঠিক হলো না।"

"তুমি বৃথাই ভয় পাচ্ছ বোন! নির্ভয়ে থাকো, মা-সাবিত্রীর আশীর্বাদে তোমার মেয়ের কোন ক্ষতি হবে না।"

পূর্ণিমা আর কোন কথা বলে না, নিঃশব্দে এগিয়ে চলে। বুঝতে পারছি না, আমার আশ্বাসে মায়ের [illegible] কতখানি আশ্বস্ত হয়েছে।

আমরা কুলির পেছনে নীরবে পথ চলি তারপরে হঠাৎ পূর্ণিমা প্রশ্ন করে, "পুষ্করে কি কি মন্দির আছে ঘোষদা?"

"পুষ্করের মূল মন্দির পাঁচটি—ব্রহ্মা, বদ্রী-নারায়ণ, বরাহ, আত্মেশ্বর শিব এবং সাবিত্রী।"

"সাবিত্রী, মানে আমরা এখন যে মন্দিরে চলেছি?"

"না, সে তো সাবিত্রী পাহাড়ে। এটি পুষ্করের সাবিত্রী মন্দির, হ্রদের উত্তর তীরে অবস্থিত। মাড়োয়াররাজ অজিত সিংহের পুরোহিত তৈরি করে দিয়েছেন।"

"বাকি চারটি মন্দির কারা তৈরি করেছেন?"

"ব্রহ্মার মন্দির তৈরি করে দিয়েছেন গোকুল পারেক নামে গোয়ালিয়রের জনৈক মহাজন। এটি ভারতের বৃহত্তম ব্রহ্মা-মন্দির। পুরীর গোঁসাইরা এই মন্দিরের সেবাইত।'

"বর্তমান বদ্রীনারায়ণ মন্দিরটি খারওয়া বা ঠাকুররা শ'খানেক বছর আগে তৈরি করেছেন। প্রাচীন বরাহ মন্দি·টি জাহাঙ্গীর ভেঙে ফেলেছিলেন। পরে যোধপুরের বখত সিং বর্তমান মন্দিরটি নির্মাণ করেন।"

"আর আত্মেশ্বর শিবের মন্দিরটি?" আমি থামতেই পূর্ণিমা প্রশ্ন করে।

উত্তর দিই, "গোমা রাও, একজন মারাঠা সুবাদার।"

"এগুলি সবই তাহলে নতুন মন্দির?"

"হ্যাঁ, পুরানো মন্দির থাকবে কেমন করে? আজমীর যে আওরঙ্গজেবের একটি প্রধান শাসনকেন্দ্র ছিল। মথুরার মতো এখানেও আওরঙ্গজেব কেশব রায় মন্দিরের একাংশে মসজিদ বানিয়েছিলেন, সে মসজিদ আজও আছে।"

"আচ্ছা ঘোষদা আসার পথে বাসে বসে আমরা যে বড় মন্দিরটি দেখলাম, ওটি কি মন্দির?"

"রামানুজ সম্প্রদায়ের রাম-বৈকুণ্ঠনাথ মন্দির। ১৯২৫ সালে মাগ্‌নীরাম বাঙ্গুর আট লাখ টাকা খরচ করে ঐ মন্দিরটি তৈরি করে দিয়েছেন। মন্দিরের বিমান এবং গোপুরম দক্ষিণ ভারতীয় হিন্দু-স্থাপত্যশিল্প অনুযায়ী নির্মিত।"

"এই পাঁচটি ছাড়া আর কি মন্দির আছে পুষ্করে?"

"প্রাচীন তীর্থ পুষ্কর, কাজেই বহু মন্দির আছে, অনেকে বলেন চারশ' মন্দির আছে এখানে। তবে তাঁদের মধ্যে নৃসিংহ এবং গণেশ মন্দির দুটি উল্লেখযোগ্য।"

"সরস্বতীর কোন মন্দির নেই?"

"আছে। এখানে নয়, ৩।৪ মাইল দূরে। শুনেছি রাস্তা ভাল নয়।"

শহরে পথ শেষ হয়ে গেল, শুরু হলো বালির পথ। এখানে এত বালি এলো কেমন করে? নদী নেই, সমুদ্র নেই!

না থাক্ রাজস্থান যে মরুভূমির দেশ। সুতরাং বালি দেখে বিচলিত হলে চলবে না। আমরা এগিয়ে চলি।

চলা মোটেই সহজ নয়। প্রতি পদক্ষেপে পা বালিতে ঢুকে যাচ্ছ। তার ওপরে প্রচণ্ড রোদ উঠেছে।

আমাদের কষ্ট হলেও লোকটি কিন্তু শ্রীকে নিয়ে অক্লেশে এগিয়ে যাচ্ছে। শুধু ছাতাটি মেলে রাখতে পারছে না, বড্ড হাওয়া বইছে যে। শ্রীরও ছাতা মেলায় আপত্তি। ছাতার জন্য সে নাকি দেখতে পাচ্ছে না কিছু।

আমাদের রওনা হতে দেরি হয়ে গিয়েছে। ভেবেছিলাম সহযাত্রীরা ইতিমধ্যে নিশ্চয়ই বহুদূর এগিয়ে গেছেন। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে তাঁদের অনেকেই তেমন একটা এগোতে পারেন নি। সামনে সারি সারি মানুষ দেখতে পাচ্ছি। বৃক্ষ-লতাহীন বালুকাময় প্রান্তর বলেই দেখা

যাচ্ছে।

দেখতে পাচ্ছি সাবিত্রী পাহাড়কে। সামনে, অনেকটা উঁচুতে গাছে ছাওয়া একটি টিলা। তার ওপরে মন্দির—সাবিত্রীর মন্দির। শুধু মেয়েরাই পুজো দিতে পারে ঐ মন্দিরে। এমন 'লেডিজ অন্‌লি' মন্দির ভারতে আর কোথাও আছে বলে শুনি নি।

শুধু সামনে নয়, আমাদের সঙ্গে এবং পেছনেও অনেকে চলেছেন সাবিত্রী পাহাড়ে। তাঁরা আমার সহযাত্রী নন, তবে তাঁদের মধ্যেও মেয়েদের সংখ্যা বেশি। অধিকাংশ বাঙালি এবং বৃদ্ধা। স্বভাবতই তাঁরা শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন।

একজন বৃদ্ধা লাঠি ভর করে ধীরে ধীরে পথ চলেছেন। আমরা তাঁর পাশে আসতেই তিনি হঠাৎ বলে উঠলেন, "বুঝলে বাবা, গতর আর বাসনা থাকলেই কেবল যাওয়া যায় না সাবিত্রী পাহাড়ে. মায়ের আশীর্বাদ থাকা চাই। মায়ের ইচ্ছে হলে অন্ধ খঞ্জ, ধনী দরিদ্র, ব্রাহ্মণ শূদ্র সবাই যেতে পারে তাঁর মন্দিরে।"

"ঠিকই বলেছেন মা!" আমি বৃদ্ধাকে বলি, "তীর্থের দেবতা না ডাকলে তো কেউ তীর্থে পৌঁছতে পারেন না। মায়ের আশীর্বাদে আপনিও পারবেন পাহাড়ে উঠতে।"

কৃতজ্ঞ কণ্ঠে বৃদ্ধা জিজ্ঞেস করেন, "তুমি বলছ বাবা, আমি পারব মায়ের কাছে যেতে?"

"পারবেন মা. নিশ্চয়ই পারবেন।" পূর্ণিমা আশ্বস্ত করতে চান তাঁকে।

বৃদ্ধা বলেন, "কিন্তু আমার সঙ্গীরা যে সবাই এগিয়ে গেল?"

"তাতে কী হয়েছে? আপনি ধীরে ধীরে আসুন, আপনিও পৌঁছে যাবেন মায়ের মন্দিরে।"

বৃদ্ধাকে ভরসা দিয়ে আমরা এগিয়ে চলি।

বালির পথ ফুরিয়ে গেল, আরম্ভ হলো পাথর আর মাটির চড়াই পথ। এখানে ঝোপ-ঝাড় ও গাছপালা রয়েছে। মাঝে মাঝে বড় গাছও আছে। তারই ছায়ায় সারি বেঁধে বসে আছে ভিক্ষুকের দল। ছোট-বড় সব বয়সের ছেলেমেয়ে ও নারী-পুরুষ রয়েছে তাদের দলে। সবচেয়ে দুঃখের কথা তাদের মধ্যে বাঙালিও রয়েছে। দেশ থেকে এত দূরে এসেও আজ বাঙালি ভিক্ষে করছে। অথচ সামন্ততান্ত্রিক রাজস্থানের বিভিন্ন রাজদরবারে এককালে বাঙালি ছিল সবচেয়ে সম্মানিত। আধুনিক রাজস্থানের পথিকৃৎ বাঙালি আজ রাজস্থানের তীর্থপথে ভিক্ষারত।

তাদের সামনে দু-চারটি করে পয়সা ফেলে আমরা ধীরে ধীরে পথ চলি। শ্রীর বাহক আগে আগে চলেছে। শ্রী মাঝে মাঝে হাত নাড়ছে আর বলছে, "মামু, তোমরা হেরে গেলে! আমি তোমাদের আগে পাহাড়ে চড়ব।"

"আচ্ছা ঘোষদা!" পূর্ণিমা জিজ্ঞেস করে, "এখানকার সবচেয়ে বড় উৎসব কি?"

"পুষ্করের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব কার্তিক-স্নান। কার্তিক মাসের শুক্লা একাদশী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত এই উৎসব চলে। পুণ্যার্থীদের পুরো পাঁচদিন থাকতে হয় এখানে। তখন বিরাট মেলা বসে এখানে—মানুষের মেলা তো বটেই, সেই সঙ্গে পশু-মেলা। মেলায় লাখখানেক লোক আর হাজার হাজার গোরু ঘোড়া ও উট আসে। মানুষের মেলা কবে থেকে শুরু হয়েছে, সঠিক সংবাদ সংগ্রহ করতে পারি নি, তবে সম্রাট জাহাঙ্গীরের সময়েও এখানে উত্তর-পশ্চিম ভারতের সর্ববৃহৎ পশু-মেলা বসত। এখন সরকারী সহযোগিতায় সেই মেলার শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। প্রতি বছর শ্রেষ্ঠ পশুপালকদের পুরস্কার দেওয়া হয়।

"পুষ্করের অন্যান্য মেলা হলো—সুদাবাঈ, নাগ-পঞ্চমী, সাবিত্রী, অগস্ত্য, পাপমোচনী ও

বৈশাখীর মেলা। বৈশাখী মেলায় হাজার দশেক মানুষ আসেন। অন্য মেলাগুলি তেমন উল্লেখযোগ্য নয়।"

"এবারে পুষ্কর শহর সম্পর্কে কিছু বলুন।"

"পুষ্কর শহরটি দু ভাগে বিভক্ত—ছোটিবস্তি ও বড়ীবস্তি। ছোটিবস্তিকে আগে বলা হতো বরাহপুরা। কারণ বরাহমন্দির ঐ অংশে অবস্থিত। দুই বস্তির ব্রাহ্মণদের মধ্যে কলহ লেগেই আছে। কলহের কারণ, ছোটিবস্তির ব্রাহ্মণগণ বড়ীবস্তির ব্রাহ্মণদের ব্রাহ্মণ বলেই স্বীকার করেন না। কিন্তু বড়ীবস্তির ব্রাহ্মণগণ দাবি করেন যে তাঁরা বেদব্যাসের পিতা পরাশর মুনির বংশধর এবং পুষ্করের আদি-ব্রাহ্মণ। শুধু তাই নয়, রাজা নরহর নাকি তাঁদের পূর্ব-পুরুষকেই পুষ্করের গুরু সম্প্রদায়ের মর্যাদা দিয়ে গিয়েছেন। বলা বাহুল্য ছোটিবস্তির ব্রাহ্মণগণ তাঁদের এই দাবিকে অসত্য বলে থাকেন।

"কলহ লেগে থাকলে কি হবে, মাঝে মাঝেই দেখা যায়, এ-বস্তির ছেলে ও-বস্তির মেয়েকে ভালোবেসে বসে আছে। তখন হয় নেতাদের মহাবিপদ। কাকে ওঁরা খারাপ বলবেন, ছেলেটিকে না মেয়েটিকে? তারপরেও আছে—ছেলের বাপ ছেলেকে ত্যাজ্যপুত্র করলে, মেয়ের বাপ সানন্দে তাঁকে ঘরে ঠাঁই দেন আর মেয়ের বাপ মেয়েকে তাড়িয়ে দিলে, ছেলের বাপ সস্নেহে তাকে ঘরে তুলে নেন। অর্থাৎ এ-বস্তির মানুষ ও বস্তির বাসিন্দা হয়।"

"সেকি! আপনি এরই মধ্যে ঘুরে এলেন?"

পূর্ণিমার প্রশ্নে আমাকে চোখ ফেরাতে হয়। দেখি উকিলবাবু ফিরে চলেছেন। সত্যই তো, এরই মধ্যে তিনি ঘুরে এলেন সাবিত্রী পাহাড় থেকে! খুব ভাল 'ক্লাইম্বার' বলতে হবে।

উকিলবাবু উত্তর দেন, "না, না। কোথায় আর যেতে পারলাম সেখানে। বড্ড বাজে রাস্তা, সামনে আবার সিঁড়ি রয়েছে দেখলাম। মা আমার মাথায় থাকুন, আমি ফিরে যাচ্ছি। আপনারা ঘুরে আসুন।" একবার থামেন তিনি। তারপরে বলেন, "তাছাড়া যার যাবার, সেই যখন যেতে পারল না, আমি কেন অযথা এই ঝামেলার মধ্যে যাই।"

আমাদের কোন কথা বলার সুযোগ না দিয়ে তিনি হনহন করে নিচে নেমে গেলেন।

একটু আগের শোনা সেই বৃদ্ধার কথাগুলো ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলি বৃদ্ধা বলেছিলেন—মায়ের আশীর্বাদ ছাড়া কেউ পৌঁছতে পারে না তাঁর মনমন্দিরে। মিসেস উকিলের জন্য দুঃখ হচ্ছে—নিজেও যেতে পারলেন না, পতির পুণ্যেও সতীর পুণ্যসঞ্চয় হলো না।

বাহকের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছে। সে ভাঙা ভাঙা হিন্দীতে কথা বলছে আর বাহক যথাসম্ভব বাংলা শব্দ ব্যবহার করার চেষ্টা করছে। সুতরাং তাদের গল্প আর শেষ হচ্ছে না।

পাথুরে পথের শেষে শুরু হলো সিঁড়ি—বেশ খাড়া সিঁড়ি। সহযাত্রীরা অনেকেই এখানে এসে অসহায় বোধ করছেন। অহীন আর জ্ঞান তাঁদের সাধ্যমত সাহায্য করছে।

সত্যেনদার একখানি পা একটু দুর্বল। তার সিঁড়ি ভাঙতে অসুবিধে হচ্ছে। পূর্ণিমাকে এগোতে বলে আমি সত্যেনদার সঙ্গে চলতে থাকি। এখান থেকে মন্দিরটিকে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে।

জনৈকা বাঙালি বৃদ্ধা ধীরে ধীরে সিঁড়ি ভাঙছেন আর আবৃত্তি করছেন—

'পারিব না এ কথাটি বলিও না আর
কেন পারিবে না তাহা ভাব একবার।

পাঁচজনে পারে যাহা,
তুমিও পারিবে তাহা,
পার কি না পার তাহা দেখ একবার।

অবশেষে উঠে আসি ওপরে, সাবিত্রী মায়ের মন্দির প্রাঙ্গণে। যিনি নিখিলবেদ প্রসব করেছেন, তিনিই সাবিত্রী। যিনি সরস্বতী গায়ত্রী ও ব্রাহ্মণী, তিনিই সাবিত্রী। সেই সূর্যতনয়া সাবিত্রীর মন্দিরে এসেছি আমি।

পদ্মপুরাণে সাবিত্রীর সহস্র নামের উল্লেখ আছে। বলা হয়েছে সাবিত্রীর উপাসনা করে যে দ্বিজগুণসম্পন্ন ব্যক্তি দৈনিক তাঁর সহস্রনাম পাঠ কিংবা শ্রবণ করেন, তিনি সর্বপাপ মুক্ত হয়ে ব্রহ্মলোকে বাস করেন।

বলা হয়েছে—একবার সাবিত্রী জপ করলে দিনের পাপ ক্ষয় হয়, দশবারে দিন-রাতের। শতবার জপ করলে মাসের পাপ ক্ষয় হয় আর হাজারবারে সারা বছরের। এইভাবে শত লক্ষবার সাবিত্রী জপ করলে জন্মের পাপক্ষয় আর সহস্র লক্ষবারে মানুষের পরিপূর্ণ মুক্তি।

কথিত আছে কৃষ্ণ-ভগবান সাবিত্রীকে সৃষ্টি করে ব্রহ্মার হাতে সম্প্রদান করলেন। কিন্তু সাবিত্রী ব্রহ্মার সঙ্গে গোলোক ছেড়ে ব্রহ্মলোকে যেতে সম্মত হলেন না। তখন শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে সাবিত্রীর স্তব করার পরামর্শ দিলেন। নিরুপায় ব্রহ্মা স্ত্রীর স্তব করতে বাধ্য হলেন এবং সেই স্তবে সন্তুষ্ট হয়ে সাবিত্রী ব্রহ্মার সঙ্গে ব্রহ্মলোকে চলে গেলেন।

ব্রহ্মলোক কোথায় আমি জানি না, কিন্তু জানি পুষ্করে ব্রহ্মাণীর মন্দির রয়েছে। আর আমি এখন সেই মন্দির প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়েই সরস্বতী-সাবিত্রীকে স্মরণ করছি।

ছোট একফালি পাথর বাঁধানো প্রাঙ্গণ। তিনদিকে কোমর সমান রেলিং, একদিকে মন্দির—একটু উঁচুতে।

প্রাঙ্গণটি ভারি সুন্দর। মনে হচ্ছে যেন মন্দিরের আনত-অলিন্দ। জায়গাটি ছায়াশীতল। শ্রান্তি-জুড়ানো ঠাণ্ডা বাতাস বইছে। তৃষ্ণার্ত যাত্রীদের জন্য জলের ব্যবস্থাও রয়েছে।

সত্যেনদাকে বলি, "একটু বসা যাক্ এখানে। তারপর জল খেয়ে ধীরে সুস্থে মন্দিরে ওঠা যাবে।"

"না ভাই।" হাঁফাতে হাঁফাতে শ্রান্ত সত্যেনদা বলে, "মা-কে দর্শন না করে জলগ্রহণ করব না, বিশ্রাম তো নয়ই।" তিনি মন্দিরের দিকে এগিয়ে যান।

সত্যেনদা ঠিকই বলেছেন। তীর্থযাত্রীকে তীর্থে পৌঁছে প্রথমে তীর্থের দেবতাকে দর্শন করে নিতে হয়।

তবু আমি এসে রেলিংয়ের ওপরে বসি। বসে বসে চারিদিকে দেখি। এখান থেকে পুষ্করকে ছবির মতো মনে হচ্ছে।

পুষ্কর হ্রদের তীরে পুষ্কর শহর। তার তিনদিকে পাহাড়, একদিকে বালি—মাড়োয়ারের সমতল পর্যন্ত প্রসারিত।

পাহাড়গুলির পৃথক পৃথক নাম। একটির নাম গায়ত্রী আর পুবেরটি হলো নাগ পাহাড়। ঐ পাহাড়ে অনেক গুহা আছে। রাজস্থানিরা বিশ্বাস করেন সেগুলিতে একদা অগস্ত্য, কন্ব এবং ভর্তৃহরি প্রভৃতি মুনিরা বাস করতেন। ঐ গুহাগুলির প্রসঙ্গে কর্নেল টড বলেছেন, "here are

many beautiful spots about the serpent mount, which as it abounds in springs, has from earliest times been the resort of the Hindu sages whose caves and hermitages are yet pointed out, now embellished with gradens and fountains. One of the latter issuing from a fissure in the rock is sacred to the Muni Agastya."

নাগ পাহাড়ের পশ্চিম ঢালে রয়েছে পঞ্চ-কুণ্ড এবং গোমুখী। প্রথমটি জলাশয়, দ্বিতীয়টি ঝরনা। কাজেই একটি বড় গুহা এবং তার সামনে ঝরনাবিধৌত তৃণাচ্ছাদিত ছায়াশীতল সুবিস্তীর্ণ একফালি সমতল। রাজস্থানিরা দাবি করেন, সেখানেই ছিল মহর্ষি কণ্বের আশ্রম। সেই আশ্রমে শকুন্তলার শৈশব ও কৈশোর কেটেছে আর দেখা হয়েছে দুষ্মন্তের সঙ্গে।

নাগ পাহাড়ের পাদদেশে রয়েছে গায়ত্রী এবং ভৈরব সর্বানন্দের মন্দির। সেটি নাকি একান্ন পীঠের অন্যতম।

রামায়ণ ও মহাভারতে পুষ্করের উল্লেখ আছে। বনবাসের সময় পাণ্ডবরা নাকি কয়েক বছর ঐ-সব পাহাড়ে কাটিয়ে গিয়েছেন।

"মামুগো, ও মামু! আর কতক্ষণ ওখানে একা একা বসে থাকবে? মন্দিরে আসবে না?"

শ্রীর ডাকে চিন্তায় ছেদ পড়ে। তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াই। চার-পাঁচ ধাপ সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি মন্দিরে। শ্রী আমাকে হাত ধরে নিয়ে চলে ভেতরে।

চৌকোনা মন্দির। দুটি অংশে বিভক্ত নাট ও গর্ভমন্দির। গর্ভমন্দিরে সাবিত্রীর বেশ বড় বিগ্রহ।

পুরুষ সহযাত্রীরা নাটমন্দিরে বসে শ্রান্তি দূর করছেন, মেয়েরা সবাই গর্ভমন্দিরে। কেউ পুজো করছেন, কেউ বা বিশ্রাম নিচ্ছেন।

পুজো করার অধিকার না থাকলেও মা-কে প্রণাম করতে বাধ্য নেই কোন। গর্ভমন্দিরে প্রবেশ করে আমি সরস্বতী-সাবিত্রীকে সশ্রদ্ধ প্রণাম করি। কায়মনোবাক্যে কামনা করি—মা, তুমি আমাকে বিদ্যা দাও আমার মানসীকে দাও শান্তি। সে অনেক অশান্তি ভোগ করেছে বাকি জীবনটা তুমি তাকে শান্তিতে রাখো মা!

।। আট ।।

পুষ্করে ফিরে ধর্মশালায় ঢোকার মুখেই দেখা হলো অমিয়বাবুর সঙ্গে। তিনি দরজার ধারে বসে চৌকিদারের সঙ্গে বেশ জমিয়ে নিয়েছেন। চৌকিদার খৈনি মন্থনরত। অমিয়বাবু অমৃতপ্রাপ্তির অপেক্ষায়। সিগারেট বিড়ি তামাক খৈনি দোক্তা জর্দা ও নস্যি প্রভৃতি তাম্রকূট জাতীয় যাবতীয় ভোগ্যবস্তুতেই অমিয়বাবুর অসীম আসক্তি।

আমি কাছে পৌঁছতেই তিনি আমাকে বললেন, "এই যে দাদা! একটু প্রসাদ পেতে পারি?"

অমিয়বাবু বয়সে আমার চেয়ে কিছু বড়ই হবেন, তবু তিনি আমাকে উচ্চস্বরে দাদা বলে ডাকেন। মনে করবার কিছু নেই। কারণ আমাদের মাতৃভাষায় দাদা শব্দটি অনেক সময়েই শুধু একটা অর্থহীন সম্বোধন। তাই বান্ধবী থেকে বাস-কন্ডাকটর পর্যন্ত সবাই নিঃশঙ্কচিত্তে দাদা শব্দটির শরণ নেয়।

কিন্তু এত মানুষ থাকতে অমিয়বাবু আমার কাছে মা-সাবিত্রীর প্রসাদ চাইছেন কেন? তিনি

কি জানেন না যে সাবিত্রী পাহাড়ে শুধু মেয়েরাই পুজো দিতে পারেন।

দিদি বোধহয় আমার অসহায় অবস্থাটা বুঝতে পারেন। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর হাতের ছোট্ট থলিটি খুলে প্রসাদ বের করতে যান।

অমিয়বাবু বাধা দেন তাঁকে। বলেন, "আমি আপনাদের মায়ের প্রসাদ চাইছি না দিদি! আপনি ভেতরে যান। আমি ঘোষদার প্রসাদ চাইছি।" তারপরে আমার দিকে তাকিয়ে বলেন, "আপনি তো বেশ মানুষ মশায়, সেদিন অতো কষ্ট করে কৌটোটার উদ্‌বোধন করলাম, আর একটু প্রসাদ দিতে চাইছেন না। দিন, কৌটোটা দিন একবার।'

দিদি হাসতে হাসতে ভেতরে চলে গেলেন। আমি সহাস্যে নস্যির কৌটোটা বের করে অমিয়বাবুর হাতে দিই। তারপরে জিজ্ঞেস করি, "আপনি যে সাবিত্রী পাহাড়ে গেলেন না?"

"কেন যাবো? সে তো শুনলাম 'অল-লেডিজ' তীর্থ।"

কুলির পাওনা মিটিয়ে পূর্ণিমা ও শঙ্করী শ্রীকে নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

অমিয়বাবুকে বলি, "সেকি মশাই, আমি যেতে পারলাম আর লেডিজ-তীর্থ বলে আপনি গেলেন না!"

"আপনার সে অধিকার আছে দাদা, আমার নেই।"

"কিন্তু আমিও তো একাই আপনাদের সঙ্গে এনেছি!"

এক টিপ নস্যি নিয়ে, কৌটোটা আমার হাতে ফিরিয়ে দিয়ে অমিয়বাবু বলেন, "একা এলেও তো আপনি আমার মতো সত্যি সত্যি একা নন দাদা!"

সহাস্যে বলি, "আপনার কি ধারণা বাড়িতে আপনার একজন বৌদি আছেন?"

"বাড়িতে আছেন কি না জানি না, তবে বৃন্দাবনে রয়েছেন।"

চমকে উঠি। কথাটা একেবারেই খেয়াল ছিল না, সেদিন বৃন্দাবনে গোবিন্দমন্দিরের সামনে সবার সঙ্গে অমিয়বাবুও মানসীকে দেখেছেন, আগ্রাফোর্ট স্টেশনে কথা বলেছেন তার সঙ্গে।

আমাকে অপ্রস্তুত অবস্থা থেকে মুক্তি দেবার জন্যই বোধহয় অমিয়বাবু প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেন। বলেন, "এতক্ষণে সবাই খেতে বসে গেলেন। যান, তাড়াতাড়ি গিয়ে বসে পড়ুন।"

"আপনি বসবেন না?"

"আমরা যারা সাবিত্রী পাহাড়ে যাই নি, তাঁরা খেয়ে নিয়েছি।"

আর তাঁর সামনে না দাঁড়িয়ে তাড়াতাড়ি ধর্মশালায় প্রবেশ করি।

অমিয়বাবু ঠিকই বলেছেন, সবাই খেতে বসে গিয়েছেন। ম্যানেজার নিজে পরিবেশন করছেন। তবে খাওয়া পর্বটি মোটেই নীরবে নিষ্পন্ন হচ্ছে না। ভোজনরত সহযাত্রীদের মধ্যে রীতিমত বাকযুদ্ধ চলেছে।

বাকযুদ্ধের বিষয়টি অভিনব। আজ একাদশী, তাই দাদা মিষ্টি খাওয়াবার জন্য দশটি টাকা দিয়েছেন ম্যানেজারকে। তাঁকে বলেছেন—যাঁরা একাদশী করবেন, তাঁদের দুটি করে আর যাঁরা করবেন না তাঁদের যেন একটি করে মিষ্টি দেওয়া হয়। কিন্তু বিউটি একাদশী না করে সত্ত্বেও ম্যানেজার তার পাতে দুটি মিষ্টি পরিবেশন করেছেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জবাবদিহি করা হয়েছে। ম্যানেজার সবিনয়ে জানিয়েছেন—দাদার নির্দেশেই তিনি বিউটির প্রতি এই পক্ষপাত প্রদর্শন করেছেন।

আর যায় কোথায়! সরকারদা দাদাকে জেরা শুরু করেছেন, "বিউকে দুটো দেওয়া হলো

কেন?"

দাদা গম্ভীর স্বরে উত্তর দিলেন, "সে একাদশী করেছে।"

"একাদশী করেছে!" সরকারদা বিস্ময়ের ভান করেন। দাদাকে আবার প্রশ্ন করেন, "এ কেমন করে সম্ভব হয় দাদা?"

"কেন, অসম্ভবের কি আছে? সে কি একাদশী করতে পারে না?"

"না, পারে না।" সরকারদা দাদার প্রশ্নের উত্তর দেন। জিজ্ঞেস করেন, "আপনি বেঁচে থাকতে বিউ কোন্ শাস্ত্রমতে একাদশী করতে পারে দাদা?"

সবাই সোচ্চার স্বরে হেসে ওঠেন। দাদাও বাদ পড়েন না। কেবল বিউটি বেচারী হাসতে পারে না। সে লজ্জায় মুখ লুকোয়।

খাবার পরেই পথে বের হতে হলো। আমরা পুষ্করের মন্দির দর্শন করতে চলেছি। পাণ্ডারা বলেছেন—চারশো মন্দির নাকি রয়েছে এই ছোট তীর্থশহরটিতে। সব দর্শন করা সম্ভব নয়। আমরা হাঁটতে হাঁটতে ব্রহ্মার মন্দির পর্যন্ত যাবো। পুষ্কর ছাড়া আর কোথাও নাকি এতবড় ব্রহ্মামন্দির নেই।

ধর্মশালা থেকে বেরিয়ে প্রথমেই গণেশমন্দির—পথের পাশে, বাঁদিকে। মন্দিরে সুন্দর ও সুবিশাল বিনায়ক-মূর্তি। সিদ্ধিদাতা গণপতিকে প্রণাম করে আমরা এগিয়ে চলি।

একটু এগিয়েই ডানদিকে নৃসিংহদেবের মন্দির। ছোট হলেও জয়পুরী শিল্পকলায় সমৃদ্ধ সুন্দর মন্দির। হিরণ্যকশিপুহন্তা নরসিংহকে সশ্রদ্ধ দণ্ডবৎ করে আমরা বেরিয়ে আসি মন্দির থেকে।

মাত্র কয়েক পা এগিয়েই ব্রহ্মার মন্দির। বাঁদিকে পথ থেকে অনেকটা উঁচুতে বেশ বড় মন্দির।

বত্রিশ ধাপ শ্বেতপাথরের সিঁড়ি বেয়ে আমরা মন্দিরতোরণে উঠে আসি। তারপরে আরও নয় ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে অঙ্গন। সাদা আর কালো মর্মর পাথরের মসৃণ ও প্রশস্ত অঙ্গন। বাঁদিকে দুটি গোড়া বাঁধানো নিম ও বটগাছ আর ডানদিকে দুটি উঁচু পাথরের পিলারের সঙ্গে একটি বিরাট ঘণ্টা ঝুলছে। এতবড় ঘণ্টা খুবই কম দেখা যায়। সুতরাং ঘণ্টাটি সামন্তবাবুর ছোটছেলে ও শ্রীর মনোযোগ আকর্ষণ করে। শ্রী বলে, "মামু, এই ঘণ্টাটা বাজালে কতদূর থেকে শোনা যাবে?"

আমি কিছু বলতে পারার আগেই দাদা উত্তর দেন, "কলকাতা থেকে।"

কি যেন একটু ভেবে শ্রী বলে, "কোথায়? আমরা কখনও শুনতে পাই না তো!" একবার থামে সে তারপরেই দাদাকে ধমক লাগায়, "ধেৎ! তুমি মিথ্যে কথা বলছ দাদু! কলকাতা থেকে কখনও শোনা যেতে পারে? কলকাতা তো কত্তো দূর। সাবিত্রী পাহাড় থেকে শোনা যায় হয়তো।"

আমরা সবাই সশব্দে হেসে উঠি, দাদা নির্বাক।

হাসি থামলে বিউটি দাদাকে বলে, "সবাই আমার মতো বোকা নয় দাদু!"

আবার হাসি।

ঠিক মাঝখানে মূল-মন্দির, চারিপাশে প্রশস্ত অঙ্গন। তারপরে সারি সারি ছোট ছোট ঘর—কোনটি মন্দির কোনটি বা সেবাইত ও কর্মচারীদের কোয়ার্টার। যেমন ঝকঝকে, তেমনি

জমজমাট মন্দির।

মূল-মন্দিরটির তিনটি চূড়া। প্রতিচূড়ায় শিখর কলস! মন্দিরটি নির্মাণে "নাগরশৈলী" অনুসরণ করা হলেও এতে 'রাঢ়দেশীয়' পদ্ধতির প্রভাব সুস্পষ্ট। তাই পুষ্করের এই ব্রহ্মা মন্দিরটি দেখে আমার বার বার বাঁকুড়ার রেখ-দেউলের কথা মনে পড়েছে।

অঙ্গন থেকে আরও পাঁচধাপ শ্বেতপাথরের সিঁড়ি পেরিয়ে আমরা নাটমনিদের উঠে আসি। নাটমন্দিরের তিনদিক খোলা, একদিকে গর্ভমন্দির। কারুকার্যখচিত কয়েক সারি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ছাদটি। সিলিংয়ের সর্বত্র সুন্দর শিল্পকলা, মাঝখানে একটি রুপোর কচ্ছপমূর্তি—কূর্মাবতার।

গর্ভমন্দিরের দরজার সামনে নাটমন্দিরের খানিকটা জুড়ে একটি চৌকোনা বাঁধানো মঞ্চ, চারিদিকে রেলিং। এখানে বোধহয় পাঠ-কীর্তনের আসর বসে।

মঞ্চটির পাশ দিয়ে আমরা গর্ভমন্দিরে আসি। ভেতরে লাল মার্বেল পাথরের সিংহাসনে শ্বেতপাথরের পদ্মাসন ব্রহ্মা।

জগৎস্রষ্টা প্রজাপতির পাশে তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী গায়ত্রী এবং চার ছেলে—সনক, সনন্দ, সনন্দন ও সনৎকুমার। ব্রহ্মার কিন্তু আরও সাতটি ছেলে আছে। তাঁদের মধ্যে দক্ষ, ভৃগু ও নারদ অন্যতম। শুধু তাই নয়, সাবিত্রী এবং গায়ত্রী ছাড়া ব্রহ্মার আরেকজন স্ত্রী আছেন, তিনিই আমাদের পরমারাধ্যা সরস্বতী। অর্থাৎ ব্রহ্মা শিবের জামাই। আবার শিবের বিবাহ এবং দক্ষযজ্ঞেরও তিনিই পুরোহিত। তিনি জ্যোতিষ নাট্য ও বাস্তু শাস্ত্রের প্রবক্তা।

বৌদ্ধদের মতে ব্রহ্মাই হিন্দুদের প্রধান দেবতা। আর জৈনরা বলেন, ব্রহ্মা তাঁদের তীর্থঙ্কর শীতলনাথের যক্ষ বা অনুচর।

ব্রহ্মার চতুর্মুখ মূর্তিটি সবচেয়ে জনপ্রিয়। হংস তাঁর বাহন। তাঁর চারখানি হাতে সাধারণত স্রক্, অক্ষমালা, পুস্তক ও কমণ্ডুল থাকে। খাজুরাহো, মথুরা ইলোরা ও মহাবলিপুরম্ প্রভৃতি জায়গায় বহু ব্রহ্মা মূর্তি রয়েছে। এমন কি চীন, জাপান, কম্বোডিয়া এবং বলি ও যবদ্বীপে প্রচুর ব্রহ্মামূর্তি আছে। এইসব মূর্তির বৈচিত্র্য লক্ষ্য করবার মতো।

বুন্দেলখণ্ডে এবং রাজপুতনার অন্যান্য জায়গায় কিছু ব্রহ্মামন্দির আছে কিন্তু পুষ্করের এই মন্দির ছাড়া আর কোন মন্দিরে প্রতিদিন পূজা হয় বলে শুনি নি। উত্তরপ্রদেশ এবং বাংলার কোন কোন অঞ্চলে লৌকিক দেবতারূপে ব্রহ্মার বাৎসরিক পূজার প্রচলন আছে।

পুষ্করের এই মন্দিরে তিন স্ত্রীর মধ্যে কেবল গায়ত্রীকে ব্রহ্মার পাশে স্থান দেবার একটি বিশেষ কারণ রয়েছে। স্থানীয়রা মনে করেন, গায়ত্রী পুষ্করের মেয়ে, তিনি গোপিনী। যজ্ঞের প্রয়োজনে এই পুষ্করেই ব্রহ্মা তাঁকে বিয়ে করেন। আর তাই অভিমানিনী সাবিত্রী পুষ্কর ছেড়ে সাবিত্রী পাহাড়ে গিয়ে বাসা বেঁধেছেন।

পদ্মপুরাণের সেই উপাখ্যানটি মনে করা যাক্। পুষ্করে যজ্ঞ শুরু করার আগে ব্রহ্মা ইন্দ্রকে বললেন—আমি এখুনি যজ্ঞে বসব, তুমি তাড়াতাড়ি গিয়ে সাবিত্রীকে ডেকে নিয়ে এসো।

কিছুক্ষণ বাদে দেবরাজ একাই ফিরে এলেন। বিস্মিত ব্রহ্মা জিজ্ঞেস করলেন—কি হলো? সাবিত্রী কোথায়?

—আজ্ঞে, তিনি এলেন না।

—কেন?

—বললেন যে লক্ষ্মী এবং তাঁর অন্যান্য সখীরা সেখানে নেই। তাঁরা এলেই তিনি তাঁদের সঙ্গে নিয়ে এখানে চলে আসবেন।

—কেন, সে বুঝি একা আসতে পারল না?

—আজ্ঞে, না। বললেন, একা আসা নাকি সম্ভব নয় তাঁর পক্ষে।

স্বভাবতই ব্রহ্মা ভীষণ রেগে গেলেন। বললেন—চুলোয় যাক্ সাবিত্রীর সতীপনা। তুমি এক কাজ কর দেখি।

—আদেশ করুন প্রভু! ইন্দ্র সবিনয়ে বললেন।

পিতামহ প্রস্তাব করলেন—দেখেশুনে এখুনি একটা ডাগর মেয়েকে ধরে আনো দেখি, আমি তাকে বিয়ে করে যজ্ঞে বসব।

প্রস্তাবটা দেবরাজের পছন্দ হলো না। তবু তিনি নিরুপায়। কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পরে হঠাৎ দেখতে পেলেন একটি পরমাসুন্দরী স্বাস্থ্যবতী যুবতী দৈ ও দুধ নিয়ে হাটে চলেছে। দেবরাজ তাঁকে ধরে নিয়ে এলেন বিরিঞ্চির কাছে।

মেয়েটিকে দেখে ব্রহ্মার বড়ই পছন্দ হলো। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁকে গান্ধর্বমতে বিয়ে করে ফেললেন। তারপরে যজ্ঞে বসলেন।

সেই গোপকন্যাই গায়ত্রী। আমরা এখন অপলক নয়নে তাঁরই মূর্তি দর্শন করছি।

তাঁর গায়ের রং সাদা। একহাতে পদ্ম, অন্য হাতে মৃগশৃঙ্গ। তাঁর কানে কুণ্ডল, মাথায় রত্নখচিত মুকুট। গলায় মুক্তাহার ও পরনে লাল পোশাক।

পদ্মপুরাণে আছে ভক্ত-ব্রাহ্মণগণ পুষ্করে স্নান করে গায়ত্রী জপ করলে সর্বপাপ মুক্ত হন। আমি ব্রাহ্মণ তো নয়ই, ভক্তও নই। সুতরাং গায়ত্রী জপের যোগ্যতা আমার নেই। আমি শুধু শশ্রদ্ধ চিত্তে ত্রিলোকেশ্বরী ব্রহ্মাণী গায়ত্রীকে প্রণাম করি।

প্রণাম করি স্বয়ম্ভূ ও তাঁর সুযোগ্য পুত্রদের। তারপরে মূল-মন্দির থেকে নেমে আসি আঙিনায়। আরও অনেক মন্দির রয়েছে ব্রহ্মা মন্দিরের চত্বরে। আমরা একে একে সেই-সব ছোট মন্দির দর্শন করি।

মূল-মন্দিরের ডানদিকে দত্তাত্রেয় ও নারদেশ্বর মহাদেবের মন্দির। তারপরে সুরপতি ইন্দ্রদেবের মন্দির—শ্বেতপাথরের ঐরাবতে দেবরাজ বসে আছেন।

ডানদিকে ধনপতি কুবেরের মন্দির। যক্ষরাজও দেবরাজের মতোই শ্বেতহস্তীতে উপবিষ্ট।

কুবের মন্দিরের পেছনে পশুপতিনাথের মন্দির—ভেতরে শ্বেতপাথরের ত্রিমূর্তি।

অবশেষে শ্বেতপাথরের গণপতি, অর্ধনারী নরেশ্বর ও ব্রহ্মার মানসপুত্র নারদমূর্তি এবং কালোপাথরের সূর্য ও লক্ষ্মী-নারায়ণ মূর্তি দর্শন করি। তারপরে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মামন্দির থেকে নেমে আসি ব্রহ্মাতীর্থ পুষ্করের পথে।

বেলা তিনটে নাগাদ আজমীর ফিরে এলাম। ম্যানেজার বললেন, "যাঁরা আজমীর দেখতে চান, তাঁরা চা খেয়েই টাঙ্গা নিয়ে বেরিয়ে পড়ুন। আটটার মধ্যে গাড়িতে ফিরে আসবেন, রাত সাড়ে আটটায় ট্রেন।"

তার মানে সংযুক্তা ও পৃথ্বীরাজের পুণ্যস্মৃতি বিজড়িত আজমীরে আমরা আর মাত্র ঘণ্টা

পাঁচেক থাকতে পারব। তার মধ্যে আবার ক্যামেরা দুটো ঠিক কবা দরকার এবং আমার দাড়িকাটা রয়েছে।

কিছুক্ষণ থেকে আমার ক্যামেরায় ফিল্ম ঘুরছে না আর দাদার ক্যামেরার ফিল্ম ফুরিয়ে গেছে। নরসুন্দরের সহায়তা ছাড়া আমার দাড়িকাটা হয় না। তাই প্রতিদিন সকালে ক্ষুরখানি পকেটে নিয়ে আমাকে সেলুনে হাজিরা দিতে হয়। গতকাল জয়পুরে দাড়িকাটার সময় পাই নি। ফলে পাকাদাড়িতে মুখখানি ভরে উঠেছে। অবিলম্বে তাদের একটা ব্যবস্থা করা দরকার।

বাস থেকে নেমে আমি তাই গাড়িতে না গিয়ে হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনের বাইরে আসি। রাস্তার ওপারেই একটি স্টুডিও রয়েছে দেখছি। একজন সুশ্রী যুবক দোকানে বসে কাজ করছিলেন। আমি দোকানে ঢুকতেই উর্দু মেশানো হিন্দীতে তিনি আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন, বসতে বললেন। বুঝতে পারি, ভদ্রলোক মুসলমান। শুনেছি আজমীরের মুসলমানরাও নাকি লখনউয়ের মুসলমানদের মতো শিক্ষিত ভদ্র ও অতিথিপরায়ণ।

ভদ্রলোক আমার কাছ থেকে ক্যামেরা দুটি হাতে নেন। প্রথমে তিনি দাদার ক্যামেরা খুলে ফিল্মটা বের করে নতুন ফিল্ম ভরে দেন। দাম জিজ্ঞেস করে অবাক হই, কলকাতার দর। মফস্বল শহরে সাধারণত এ-সব জিনিসের দাম কিছু বেশি হয়।

এইবার ভদ্রলোক আমার ক্যামেরাটি নিয়ে নাড়াচাড়া আরম্ভ করেন। একটু বাদে বলেন, "ডার্করুমে না গিয়ে এটা ঠিক করা যাবে না।"

"আপনার তো ডার্করুম রয়েছে।"

"আছে, কিন্তু ভেতরে আমার ভাই কাজ করছে।"

"কতক্ষণ লাগবে তাঁর?"

"অন্তত ঘণ্টাখানেক।"

সর্বনাশ! এখানে যদি ক্যামেরার জন্য একঘণ্টা অপেক্ষা করতে হয়, তাহলে যে আমার আজমীর দর্শন মাথায় উঠবে। ভদ্রলোককে কথাটা বলি।

সব শুনে ভদ্রলোক বলেন, "তাই তো! আপনি ট্যুরিস্ট, আপনার পক্ষে অতক্ষণ বসে থাকা মুসকিল অথচ আমার ভাই ভেতরে একটা জরুরী কাজ করছে।...আচ্ছা, দেখি কি করতে পারি।" তিনি চেয়ার ছেড়ে ডার্করুমের দরজার কাছে গিয়ে ভাইকে ডাক দেন।

ভাই ভেতর থেকে সাড়া দেয়। ভদ্রলোক বলেন, "জিনিসপত্রগুলো গুছিয়ে রেখে একবার বাইরে আয় তো!" তারপরে আমাকে বলেন, "আপনি একটু বসুন স্যার, আমি এখুনি আপনার ক্যামেরা ঠিক করে দিচ্ছি।"

সলজ্জ স্বরে বলি, "আমি আপনাকে বিরক্ত করলাম।"

"মোটেই না স্যার! বরং আমার সৌভাগ্য আপনি কলকাতা থেকে আমাদের আজমীর দেখতে এসেছেন, আমি আপনাকে সেবা করার সুযোগ পেলাম!"

ভদ্রলোকের ভাই বেরিয়ে আসতেই তিনি আমার ক্যামেরা নিয়ে ডার্করুমে ঢুকে যান। তাঁর ছোট ভাইও বেরিয়ে যায় দোকান থেকে। অবাক হই, আমার মতো একজন অপরিচিত পরদেশী লোককে একা দোকানে রেখে ছেলেটি কোথায় গেল?

একটু বাদে ফিরে আসে ছেলেটি, তার হাতে এক কাপ গরম চা। সে কাপটি আমার সামনে

রাখে। বলি, "এর আবার কি দরকার ছিল?"

"আপনি মুসাফির, আমাদের মেহ্‌মান্। এককাপ চা অন্তত খাবেন না?"

ভদ্রলোক বেরিয়ে আসেন ডার্করুম থেকে। ক্যামেরাটি আমার হাতে দিয়ে বলেন, "ঠিক হয়ে গেছে। ফিল্মটা জড়িয়ে গিয়েছিল।"

"আপনি আমার জন্য অনেক সময় নষ্ট করলেন।" তারপর একটু দ্বিধা করে বলে ফেলি কথাটা, "এটার জন্য আমাকে কি দিতে হবে?"

"Nothing in coins Sir, only thanks."

"সেকি! আপনি নিজের কাজ নষ্ট করে.."

"It was my duty Sir !"

কি বলব? ভদ্রলোককে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে উঠে দাঁড়াই। তিনি দুহাত জড়ো করে সবিনয়ে বলেন, "আর কিভাবে আপনার সেবা করতে পারি?"

"আচ্ছা, এখানে কাছাকাছি ভাল সেলুন আছে?"

"আছে, তবে একটু দূরে—বাজারে।"

"কোন্‌পথে যেতে হবে?"

ভদ্রলোক ভাইকে বলেন, "তুই এক কাজ কর। বাজারে নিয়ে গিয়ে ওনাকে রতনের সেলুনে বসিয়ে দিয়ে আয়।"

"না, না তার কোন দরকার হবে না।" আমি প্রতিবাদ করি। বলি, "আমাকে একটু রাস্তাটা দেখিয়ে দিলেই, আমি চলে যেতে পারব। তাছাড়া উনি কাজ ফেলে ডার্করুম থেকে বেরিয়ে এসেছেন।"

মৃদু হেসে ভদ্রলোক বলেন, "কাজ তো স্যার রোজই করতে হবে, আপনি তো আর রোজ রোজ আসছেন না আমার দোকানে।"

আপত্তি করে কোন লাভ হবে না বুঝতে পেরে ক্যামেরা কাঁধে নিয়ে ভদ্রলোকের করমর্দন করি। তারপর তাঁর ভাইয়ের সঙ্গে বেরিয়ে আসি দোকান থেকে।

তিনি পরমাত্মীয়ের মতো দাওয়ায় দাঁড়িয়ে থাকেন। একটু বাদে হঠাৎ চেঁচিয়ে বলে ওঠেন, "সময় পেলে একবার দৌলত-বাগে যাবেন, সেখানে আজ 'Flower Show' হচ্ছে, আপনার খুব ভাল লাগবে।"

স্টেশনে ফিরে এসে দেখি সহযাত্রীরা অনেকেই বেরিয়ে গেছেন, কেবল একখানি টাঙ্গা দাঁড়িয়ে আছে। দাদা দিদি অমিয়বাবু ও শঙ্করী অপেক্ষা করছে আমার জন্য। ম্যানেজার পাশে দাঁড়িয়ে।

তিনি বলেন, "চট করে গাড়িতে গিয়ে চা খেয়ে আসুন।"

আমি টাঙ্গায় উঠে বলি, "এক ভদ্রলোক চা খাইয়েছেন।"

"তাহলে বেরিয়ে পড়ুন। টাঙ্গাওয়ালাকে বলে দিয়েছি, সে যতখানি সম্ভব দেখিয়ে দেবে। একটা কথা মনে রাখবেন, আজমীর-খাণ্ডোয়া ফার্স্ট প্যাসেঞ্জার আমাদের চিতোরগড় নিয়ে যাবে—রাত সাড়ে আটটায় ট্রেন।"

শহরের জনাকীর্ণ পথ পেরিয়ে টাঙ্গা ছুটে চলল। কিছুক্ষণ বাদে আমরা এলাম ম্যাগাজিন বা আজমীর দুর্গের দ্বারে। ১৫৭১-৭২ খ্রীস্টাব্দে আকবর এই দুর্গ নির্মাণ করেন। ২৬ মিটার

দীর্ঘ ও ১৩ মিটার উঁচু দুর্গতোরণটি দেখবার মতো। তোরণের ঠিক ওপরে একটি বড় জানলা রয়েছে। এই জানলার সামনে দাঁড়িয়েই সম্রাট জাহাঙ্গীর ১৬১০ সালের ১০ই জানুয়ারি স্যার টমাস রো-কে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন।

ম্যাগাজিন থেকে টাঙ্গা এলো আনাসাগরের তীরে। সত্যই সাগরের মতো সুবিশাল এক হ্রদ। তবে বেলাভূমি সাগর-সৈকতের মতো বালুকাময় নয়, সেখানে সবুজের ছড়াছড়ি। সমস্ত তীরভূমিটি শ্বেতপাথরে বাঁধানো, তারই ওপরে শাহ্‌জাহানের সেই পাঁচটি মর্মর ছত্রী—পথিকদের পরমাশ্রয়। পাশেই দৌলত-বাগ। এখানেই গড়ে উঠেছে আজমীরের অভিজাত পল্লী।

শুনেছি শারদীয়া পূর্ণিমার রাতে আনাসাগরের এই তীরভূমি, এক অপূর্ব শ্রী ধারণ করে। শাহ্‌জাহানের মর্মরছত্রীর প্রতিবিম্ব পড়ে তার বুকে। আরাবল্লীর গা ছুঁয়ে বয়ে আসা পশ্চিমা পবন তীরে বিশ্রামরত মানুষের দেহ ও মনকে শীতল ও স্নিগ্ধ করে তোলে।

সাগরতীরে কিছুক্ষণ পায়চারি করে আমরা এলাম জাহাঙ্গীরের দৌলতবাগে। রমণীয় পরিবেশে চমৎকার উদ্যান। আজ সেটি আরও রমণীয় হয়ে উঠেছে। কারণ এখানেই বসেছে ফুলের মেলা।

তাহলেও বেশিক্ষণ দেখতে পারি না। আমরা যে পর্যটক, সৌন্দর্য-মদিরা পান করার অবসর নেই আমাদের।

কর্মময় শহরের বুক দিয়ে টাঙ্গা চলে এগিয়ে।

সহসা শঙ্করী বলে, "ঘোষদা, আজ যে আপনাকে কি বলে ধন্যবাদ জানাবো বুঝে উঠতে পারছি না।"

সহসা শঙ্করীর সকৃতজ্ঞ হয়ে উঠবার উপলক্ষ না জেনেও হেসে উত্তর দিই, "তাহলে জানিও না। কিন্তু আপনাকে হঠাৎ ধন্যবাদ জানাবার হেতুটা জানতে পারি কি?"

"বারে! আপনি আজ ন'দি ও শ্রীকে সাবিত্রী পাহাড়ে নিয়ে গেলেন না?"

"ও এই কথা! তা পুষ্করের কথাটা আজমীরে এসে মনে পড়বার কারণ?"

"মনের খবর বলতে পারব না, তবে আপনি না থাকলে আজ ওদের কিছুতেই পাহাড়ে যাওয়া হতো না। জানেন ঘোষদা, যাবার পথে এবং সাবিত্রী পাহাড়ে পৌঁছে ওদের সঙ্গে দেখা হবার আগে পর্যন্ত, আমার কেবলই ওদের কথা মনে পড়েছে। ভেবেছি—এ-সব জায়গায় তো মানুষ বারবার আসতে পারে না। অথচ আজ পুষ্করে এসেও ন'দি সাবিত্রী মা-কে দর্শন করতে পারল না।"

"একটু 'ডিসটার্ব করছি", অমিয়বাবু শঙ্করীকে বলেন, "আচ্ছা ওখানে, মানে ঐ সাবিত্রী পাহাড়ে তোমাদের মায়ের মূর্তিটি দেখতে কি রকম?"

"অপূর্ব। শঙ্করী উচ্ছ্বসিত স্বরে উত্তর দেয়, "শ্বেতপাথরের বেশ বড় দণ্ডায়মানা মূর্তি। কালো রঙ দিয়ে আঁকা বড় বড় টানা-টানা দুটি চোখ। কপালের সিঁদুরের টিপ। মাথায় মুকুট। পরনে লাল শাড়ী ও লাল ওড়না হাতে অসংখ্য শাঁখা ও গালার রুলি। চাইলে সেবাইতরা হাত থেকে খুলে দেন।"

"তুমি এনেছো নাকি একখানি।" দাদা মাঝখান থেকে প্রশ্ন করে বসেন।

"হ্যাঁ।" শঙ্করী উত্তর দেয়।

"কি করবে?"

"তা তো জানি না। সবাই নিলেন, আমিও নিলাম একখানা।" একবার থামে শঙ্করী, তারপরে আবার বলতে থাকে, "তাই মন্দিরে উঠে ভাল করে মাকে দেখি নি পর্যন্ত। ন'দির পুজোর উপকরণও আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম। সেগুলি পূজারীকে দিলাম। পুজোর সময়ও মনে মনে শ্রীর কথাই ভাবছিলাম। এমন সময় হঠাৎ শুনতে পেলাম, 'মাসি'। ছুটে দরজার কাছে চলে এলাম। দেখি সত্যি শ্রী এসে গিয়েছে, পেছন ন'দি। সঙ্গে সঙ্গে আমার মনটা হালকা হলে গেল। তাড়াতাড়ি নেমে গিয়ে শ্রীকে কোলে নিয়ে ছুটে এলাম সাবিত্রী মায়ের কাছে। তাঁকে বললাম—মা তোমার অসীম করুণা। তোমার অদৃশ্য নির্দেশে নিশ্চয় ঘোষদা এমন জোর করে ওদের নিয়ে এসেছেন তোমার এই মনোহর মন্দিরে। তুমি আমার প্রণাম নাও।"

তারাগড় পাহাড়ের পাদদেশে এসে টাঙ্গা থামল। টাঙ্গাওয়ালার সঙ্গে আমরা মসজিদটির সামনে আসি।

একটি সুরম্য সংস্কৃত পাঠশালা মসজিদে রূপান্তরিত—হয়তো বা ১১৯২ সালের সেই অভিশপ্ত সন্ধ্যার আড়াই দিন পর থেকেই। তাই এমন মনোহর দেবালয়ের নাম আড়াই দিন-কা ঝোপড়া।

এই রূপান্তরের প্রয়োজন ছিল। মিথ্যের আশ্রয় নিয়ে মোহম্মদ ঘুরী দিল্লীর শেষ হিন্দু সম্রাট পৃথ্বীরাজকে পরাজিত করতে পেরেছিলেন, কিন্তু নিজের বিবেককে ফাঁকি দিতে পারেন নি। তাই তিনি আজমীরে পদার্পণ করেই ঈশ্বরের কাছে উপাসনার প্রয়োজন বোধ করেছিলেন। আর তারই ফলে সৃষ্ট হয়েছে ৬১ মিটার দীর্ঘ ও ৫৩ মিটার প্রস্থ এই অনিন্দ্যসুন্দর মসজিদ।

সংস্কৃত পাঠশালাটি হয়েছিল সেই রূপান্তরের প্রায় চল্লিশ বছর আগে ১১৫৩ খ্রীস্টাব্দে। তৎকালীন আজমীরের মহারাজা বিশালদেব দ্বিতীয় বিগ্রহরাজ সেটি নির্মাণ করান। ১৮৭৫-৭৬ সালের খননকার্যের সময় এখানে ছ'টি প্রস্তরফলক পাওয়া গিয়েছে। তাতে দেবনাগরী অক্ষরে 'হরকেলী' ও 'ললিত বিগ্রহরাজ' নামে দুটি নাটকের কিছু অংশ খোদিত রয়েছে। প্রথম নাটকটির রচয়িতা স্বয়ং বিগ্রহরাজ আর দ্বিতীয়টি রচনা করেছেন সোমদেব নামে তাঁর জনৈক সভাকবি। শুনেছি ফলকগুলি আজমীর সংগ্রহশালায় সযত্নে রক্ষিত রয়েছে। কিন্তু সময়াভাবে আজ তা দেখার সুযোগ হলো না আমার।

দশটি গোলাকার গম্বুজযুক্ত ঝোপড়া, সামনে দিকে সাতটি কপাটহীন দরজা। মাঝখানেরটি উঁচু এবং বড়। আমরা টাঙ্গাওয়ালার সঙ্গে সেটি দিয়েই ভেতরে ঢুকি। প্রথমেই আসি প্রধান উপাসনাস্থলে। এটি মসজিদের পশ্চিমাংশ পাঁচ সারিতে অপরূপ কারুকার্যমণ্ডিত শতাধিক স্তম্ভের ওপরে ছাদটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। সিলিংয়ের খোদাই কাজ দেখবার মতো।

সবই সুন্দর। তাহলেও বাইরে দিকে সাতটি খিলানযুক্ত যে পাথরের প্রকোষ্ঠটি রয়েছে, তা তুলনাহীন। এমন মনোমুগ্ধকর অথচ মার্জিত শিল্পকর্ম খুব কমই দেখেছি। ডঃ ফুরার ঠিকই বলেছেন—'The whole of the exterior is covered up with a netwark of tracery so finely and dilicately wrought that it can only be compared to a fine lace.'

জেনারেল এ কানিংহ্যাম এবং ডক্টর ডি. আর ভাণ্ডারকারের মতো প্রখ্যাত পুরাতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিক এই মসজিদটি নিয়ে বহু গবেষণা করেছেন। জেনারেল কানিংহ্যাম বলেছেন—'There is no building in India which either for historical interest

or archaeological improtance, is more worthy of preservation.'

আনন্দের কথা তৎকালীন ব্রিটিশ সরকার তাঁর সে পরামর্শ গ্রহণ করেছিলেন। বড়লাট লর্ড মেয়োর আমলে মসজিদটি আমূল সংস্কার সাধন করা হয়। তারপরে ১৯০০ সালে আবার এটিকে সারানো হয়েছে।

কানিংহ্যাম ও ভাণ্ডারকার সহ প্রায় সমস্ত গবেষকগণই এ সম্পর্কে একমত যে একটি সংস্কৃত পাঠশালাকে আংশিক ভেঙে ফেলে এবং স্থানীয় অন্যান্য ভগ্ন হিন্দু ও জৈন মন্দির থেকে কারুকার্যময় পাথর এনে এই মসজিদটিকে তৈরি করা হয়েছে।

মসজিদটিকে দেখে আমাদেরও তাই মনে হচ্ছে। মনে হচ্ছে মূল-পাঠশালার শুধু ছাদ এবং স্তম্ভগুলি রেখে চারিদিকের দেওয়াল ভেঙে ফেলা হয়েছে। আজ সেগুলি থাকলে না জানি দর্শকরা আরও কত খুশি হতেন। কারণ ফার্গুসনের মতো প্রখ্যাত পণ্ডিত ও পর্যটক তো শুধু এটুকু দেখেই বলে গিয়েছেন—'Nothing can exceed the taste with which the kufic and the Tugra inscriptions are inteiwoven with the more purely architectural decorations or in the manner in which they give life and variety to the whole without ever interfering with the constructive lines of the design.'

অবশেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন—'Nothing in Cairo or in Persia is so exquisite in detail, and nothing in Spain or Syria can approach them for beauty of surface decoration.'

আড়াই দিন-কা ঝোপড়া থেকে খাজা সাহেবের দরগায় চলেছি। বুড়ো টাঙ্গাওয়ালা আজমীরের গল্প বলছে। বলছে—শরতের আজমীর নাকি সবচেয়ে সুন্দর। তখন আনাসাগর কানায় কানায় ভরে থাকে। চশমা, অন্তেধ-কি-মাতা আর বৈজনাথের জলপ্রপাত তিনটি আরও সতেজ হয়। সাবন্দা, অগস্ত্যজী, গৌকুণ্ড, পঞ্চকুণ্ডী ও কানবাই নামের ঝরনা পাঁচটি আরও অনেক উচ্ছল হয়ে ওঠে। আজমীরের মানুষের মন তখন বহির্মুখী। তাঁরা চড়ুইভাতির জন্য অস্থির। ছুটি পেলেই দলে দলে পথে বেরিয়ে পড়েন। টাঙ্গাওয়ালাদের তখন বড়ই সুদিন। তারা দু-হাতে পয়সা লোটে।

কথায় কথায় টাঙ্গাওয়ালা বলে চলে আজমীরের উৎসবের কথা। সারা বছরই নাকি আজমীর উৎসব-মুখর। হোলি রাক্ষসবন্ধন দশেরা ও দেওয়ালী হলো হিন্দুদের শ্রেষ্ঠ উৎসব। বৌদ্ধ ও জৈনদের বুদ্ধদেব এবং মহাবীরের জন্মজয়ন্তী। মুসলমানদের ঈদ ও মহরম। তবে খাজা সাহেবের উর্স হলো আজমীরের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থানীয় উৎসব। হজরত মুইন-উদ্-দিন চিস্তির জন্মদিন উপলক্ষে প্রতিবছর হিজরী সালের ১লা থেকে ৬ই রজাব পর্যন্ত এই উৎসব হয়।

আমার প্রশ্নের উত্তরে টাঙ্গাওয়ালা জানায়—আজমীরের কিছু লৌকিক উৎসবও আছে। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য গঙ্গাওর। শিবানী গৌরীর পূজাকে কেন্দ্র করে আজমীরের মহাজন ও রাজপুতরা এই উৎসবের আয়োজন করেন। প্রায় পনেরো দিন স্থায়ী উৎসবের সময় প্রতি মহল্লায় সুসজ্জিত হরগৌরীর মূর্তি প্রতিষ্ঠা করা হয়। মেয়েরা নাচ-গান করতে করতে এক মণ্ডপ থেকে আরেক মণ্ডপে আসে। পনেরো দিনের ভেতরে চারবার করে হরগৌরীকে কাছাকাছি কোন পার্কে নিয়ে গিয়ে কিছুক্ষণ রেখে আবার মণ্ডপে ফিরিয়ে আনা হয়। আজমীরের ঘরে ঘরে তখন উৎসবের আমেজ, পথ ও প্রান্তর সঙ্গীতময়।

ঝোপড়া থেকে টাঙ্গা এলো দরগায়, হজরত মুইন-উদ্-দিন চিস্তির দরগায়—সংক্ষেপে খাজা সাহেব। এটি আজমীরের সবচেয়ে জনপ্রিয় তীর্থ। সকল ধর্মাবলম্বীর দর্শনীয়।

প্রধান তোরণের সামনে এসে টাঙ্গা থেমেছে। জায়গাটা দেখছি খুবই জমজমাট। পথের দুপাশে দোকান-পাট। প্রচুর পথচারী ও ক্রেতার ভিড়।

তোরণটি ফতেপুর সিক্রির ঢংয়ে তৈরি। তেমনি দুদিকে দুটি সুদৃশ্য পাথরের মিনার। তোরণের ওপরে পাঁচটি অর্ধচন্দ্রাকৃতিক দরজাযুক্ত ঝুলানো বারান্দা, ওপরে ও নিচে দুপাশে দুটি করে চারটি জানলা। পথ থেকে সাত-আট ধাপ সিঁড়ি বেয়ে তোরণের ওপর উঠতেই হবে আমাদের।

টাঙ্গা থেকে নামতেই প্যান্ট শার্ট পরা একজন যুবক আমাদের নমস্কার করে। বলে, "আসুন।"

দাদা জিজ্ঞেস করেন, "তুমি কে?"

"আমি পাণ্ডা।" লোকটি উত্তর দেয়।

অবাক হবার কিছুই নেই। এ দরগা কোন বিশেষ ধর্মের তীর্থ নয়, সর্বমানবের মহাতীর্থ। তাই লোকটি আমাদের কাছে নিজেকে পাণ্ডা বলে পরিচয় দিয়েছে। আমাদেরই বা তাকে পাণ্ডা বলতে আপত্তি কোথায়?

লোকটি বলে, "আমার সঙ্গে চলুন, আমি সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে দেব।"

টাঙ্গাওয়ালাও তাকে সঙ্গে নিতে বলে। সে নাকি টাঙ্গা রেখে আমাদের সঙ্গে ভেতরে যেতে পারবে না। অতএব আমরা পাণ্ডা সাহেবকে অনুসরণ করি।

তোরণের সামনে এসে সে একবার থামে। বলে, "২৩ মিটার উঁচু এই প্রধান প্রবেশ তোরণটির নাম বুলন্দ্ দরওয়াজা। এখানে যে পাঁচটি দেখবার জিনিস আছে, তার মধ্যে এটি একটি।"

"আর চারটি কি।" অমিয়বাবু সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন করেন।

পাণ্ডাজী উত্তর দেয়, "খাজা মুইন-উদ্-দিন চিস্তির সমাধি, দুটি মুসজিদ ও মহফিল-খানা।"

"মহফিল-খানা কি?" দিদি বাংলায় জিজ্ঞেস করেন। পাণ্ডাসাব কিন্তু বুঝতে পারে তাঁর প্রশ্ন। তবে এবারে সে ইংরেজির আশ্রয় নেয়। উত্তর দেয়, "Assembly Hall."

আমি বুঝিয়ে দিই, "অনেকটা আমাদের জলসাঘরের মতো। মহফিল মানে গান-বাজনার আসর, যা থেকে মাইফেল কথাটার চল হয়েছে।"

আমরা তোরণ পেরিয়ে ভেতরে আসি। সামনে, খানিকটা দূরে শ্বেতপাথরের গম্বুজযুক্ত সুবিরাট সমাধি মন্দির। তোরণ থেকে শুরু করে সমাধি মন্দির পর্যন্ত এখানকার প্রায় সব কিছুই সম্রাট আকবর হয় নির্মাণ করেছেন, নয় তো সংস্কারসাধন করেছেন। কিন্তু ঐ সাদা গম্বুজটি তৈরি করে দিয়েছেন শাহ্জাহান। শ্বেতপাথরের প্রতি যে একটা আশ্চর্য আকর্ষণ ছিল তাজ-নির্মাতার।

তোরণের পরে একটি মসজিদ। পাণ্ডা বলে, "এই বেলেপাথরের মসজিদটিও সম্রাট আকবরের তৈরি, আর ঐ যে দুটো বিশাল দেগ দেখছেন..."

শব্দটি বোধহয় দিদির বোধগম্য হয় না। তিনি আমার দিকে তাকান। আমি বলি, "দেগ অর্থাৎ ডেক, মানে হাঁড়ি।"

"হাঁড়ি! অতবড় হাঁড়ি!" দিদি রীতিমত বিস্মিতা।

শুধু তিনি কেন, এ হাঁড়ি দেখে সবাই অবাক হবেন।

পাণ্ডাজী পুলকিত স্বরে শুরু করে, "জী দিদি, হাঁড়ি। একটাতে আঠাশ ও আরেকটাতে সত্তর মণ চাল একসঙ্গে রান্না করা হয়।"

"সত্তর মণ।"

"জী।"

"তা এত ভাত কে খায় রে বাপু!"

দিদির প্রশ্ন শুনে পাণ্ডা একটু হাসে। তারপরে উত্তর দেয়, "উর্স মানে খাজা সাহেবের জন্মোৎসবের সময় এখানে লক্ষাধিক ভক্তের সমাবেশ হয়।"

বাঁধানো পথ দিয়ে আমরা ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছি সেই সুরম্য সমাধিমন্দিরের দিকে। সহসা শঙ্করী পাণ্ডাকে প্রশ্ন করে, "আচ্ছা খাজা সাহেবের জন্মস্থান কোথায়?"

পাণ্ডা বলতে থাকে, 'খাজা সাহেবের পুরো নাম সৈয়দ-খাজা মুইন-উদ্-দিন হাসান সানজারী চিস্তি। তাঁর পিতার নাম খাজা সৈয়দ গিয়াসুদ্দিন ও মাতার নাম বিবি উম্মে আলবেরা। তাঁর জন্মসাল নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। তবে মনে হয় তিনি ১১৩৮ থেকে ১১৪২ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে ইরানের ইসফাহান শহরের সানজান মহল্লায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি হজরত আলীর পুত্র হজরত ইমাম হাসানের বংশধর।

"ইরানের খুরাসান শহরে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা হয়। খাজা সাহেবের বয়স যখন মাত্র চোদ্দ বছর, তখন তাঁর পিতৃবিয়োগ ঘটে। বাগদাদে তাঁর পিতার সমাধি রয়েছে। পিতার মৃত্যুর পরে বালক মুইন-উদ্-দিনের ভাগে পড়ে একটি পানিচাক্কি ও একফালি আঙ্গুর বাগান।"

"তিনি দরবেশ হলেন কেমন করে?" পাণ্ডা থামতেই শঙ্করী প্রশ্ন করে।

পাণ্ডা উত্তর দেয়, "একদিন দুপুরবেলা বালক চিস্তি যখন তাঁর বাগানে কাজ করছিলেন, তখন ইব্রাহিম কন্দ্‌ওয়ারী নামে একজন দরবেশ সেখানে উপস্থিত হলেন। বালক খাজা তাঁকে পরম সমাদরে বসতে দিলেন। তিনি শ্রান্ত দরবেশকে আঙ্গুর খেতে দিলেন। সন্তুষ্ট দরবেশ তাঁর ঝোলা থেকে একটুকরো রুটি বের করে নিজে এক কামড় খেয়ে বাকিটা বালককে খেতে দিলেন। আর সেই রুটি খাবার পরেই বালকের মনে এক আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা দিল। তিনি পানিচাক্কি ও বাগান বিক্রি করে দিয়ে দেশভ্রমণে বেরিয়ে পড়লেন। হজরত মুইন-উদ্-দিন বিশ বছর ধরে তাঁর গুরুর সঙ্গে মদিনা থেকে লাহোর পর্যন্ত ঘুরে বেড়িয়েছেন।"

"তিনি আজমীরে কবে এলেন?"

"প্রথমবার ১১৮৯ সালে আর দ্বিতীয়বার ১১৯১ সালে।"

"তখন তো পৃথ্বীরাজ আজমীরের রাজা?"

"জী, হ্যাঁ।"

"ঘোষদা।" শঙ্করী এবার বাংলায় আমাকে বলে, "১১৯১ সালে তরাইনের প্রথম যুদ্ধ আর পরের বছরে দ্বিতীয় যুদ্ধ এবং পৃথ্বীরাজের পরাজয়—তাই না?"

"হ্যাঁ।" উত্তর দিই।

"আচ্ছা, তিনি কি একা এসেছিলেন?" শঙ্করী আবার হিন্দিতে পাণ্ডাকে প্রশ্ন করে।

পাণ্ডা উত্তর দেয়, "একা আসবেন কেন? সে আমলে কি কেউ একা চলাফেরা করতেন?

তাঁর সঙ্গে নিশ্চয় ভক্ত এবং শিষ্যরা ছিলেন।"

"ঘোষদা," শঙ্করী বাংলায় বলে, "তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ঘুরের, মানে মহম্মদ ঘুরীর রাজ্যের দু-চারজন লোক থাকা খুব অস্বাভাবিক কি? তখন তো ইরান থেকে ভারতবর্ষে আসার পথে ঘুরের ভেতর দিয়ে আসতে হতো।"

"তুমি কি বলতে চাইছ, সরল খাজা সাহেব তাঁদেরই অনুরোধে ইতিহাসের সেই যুগসন্ধিক্ষণে ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী হিন্দুরাষ্ট্রের প্রধান কর্মকেন্দ্রে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন?" আমি কিছু বলতে পারার আগেই অমিয়বাবু প্রশ্ন করেন।

"হ্যাঁ। শঙ্করী উত্তর দেয়, "নইলে তিনি নিজের থেকে ধর্মপ্রচারের জন্য কেন হঠাৎ আজমীরে আসবেন? আজমীরে তো তখন কোন মুসলমান ছিলেন না এবং আজমীর হিন্দুদের তীর্থরাজ পুষ্কর থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত।

"এর থেকে তুমি কি সিদ্ধান্তে পৌঁছতে চাইছ?" এবারে দাদা শঙ্করীকে প্রশ্ন করেন।

"আমরা কি একথা মনে করতে পারি না যে খাজা সাহেবের আধ্যাত্মিক খাতির ছায়ায় আশ্রয় নেবার জন্য মোহম্মদ ঘুরীর কিছু গুপ্তচরই নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাঁকে ১১৮৯ ও ১১৯১ সালে আজমীরে নিয়ে এসেছিলেন? তাঁরা জানতেন সাধু ও পণ্ডিতদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল এবং উদার পৃথ্বীরাজ পরম সমাদরে খাজা-সাহেবকে বরণ করবেন তাঁর জন্মভূমিতে। তিনি ভাবতেই পারবেন না যে, অতবড় একজন দরবেশের সঙ্গে মোহম্মদ ঘুরীর কোন গুপ্তচর থাকতে পারে। আর শুধু পৃথ্বীরাজ কেন, সেকথা হয়তো খাজা সাহেবও বুঝতে পারেন নি।"

"তা তোমার এমন সন্দেহের কোন কারণ আছে কি?"

"নিশ্চয়ই।" শঙ্করী উত্তর দেয়। বলে, "তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের কাহিনী থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে ঘুরী যথাসময়ে পৃথ্বীরাজের শিবিরের সমস্ত সংবাদ পেয়েছিলেন। পৃথ্বীরাজ যে তাঁর মিথ্যে চিঠিকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছেন, রাজপুতরা যে তাঁর প্রস্তাবিত সন্ধির প্রতীক্ষা করছেন, তাঁরা যে সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত—এসব সংবাদ না জানতে পারলে, সেদিন অত সকালে অর্ধেকেরও কম শক্তি নিয়ে ঘুরী ওভাবে তাঁদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে সাহসী হতেন না।"

পাণ্ডা আমাদের বাংলা আলোচনা অনুধাবন না করতে পারলেও শঙ্করীকে চুপ করতে শুনে বুঝতে পারে তার বক্তব্য শেষ হয়েছে। তাই সে আবার খাজা সাহেবের পুণ্যময় জীবন-কাহিনী বলতে শুরু করে।

"হজরত মুইন-উদ্-দিন চিস্তি কিন্তু আজমীরে স্থায়ী হন বহু বছর বাদে। তিনি বাগদাদ থেকে গজনী লাহোর ও দিল্লী হয়ে পাঁচবার আজমীর আসেন এবং কিছুকাল এখানে বাস করে আবার বাগদাদে ফিরে যান। অবশেষে ১২১৯।২০ সালে দিল্লীর সুলতান শামস্-উদ্ দিন ইলতুৎমিস তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তারপরেই হজরত চিস্তি আজমীরে এসে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন।"

"আচ্ছা, খাজা সাহেব কি বিয়ে করেছিলেন?"

"জী। হ্যাঁ। তাঁর দুই বিয়ে।"

"কোন ছেলে-মেয়ে ছিল?"

"জী। প্রথম স্ত্রীর দুই ছেলে ও এক মেয়ে এবং দ্বিতীয় স্ত্রীর এক ছেলে।"

"এবারে তাঁর ধর্মমত সম্পর্কে কিছু বলুন।"

শঙ্করীর অনুরোধে পাণ্ডা বলতে থাকে, "হজরত মুইন-উদ্-দিন চিস্তি সুফি ধর্মমত প্রচার করে গিয়েছেন। তাঁর প্রচারের প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে তিনি ধনী-দরিদ্র, পণ্ডিত-মূর্খ, মুসলমান অমুসলমান কোন পার্থক্য করতেন না। তিনি সবাইকে সমান ভালোবাসতেন। সকলেই তাঁর উপদেশে উপকৃত হতেন, তাঁর আশীর্বাদে ধন্য হতেন।

"ফলে কিছুদিনের মধ্যেই ধর্ম ও অবস্থা নির্বিশেষে আজমীরবাসীরা তাঁর মানবতার মহান আদর্শে উদ্বুদ্ধ হলেন, তাঁর ঈশ্বরপ্রেমের পবিত্র মহিমায় মোহিত হলেন। ক্রমে তাঁর খ্যাতি সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল।

অবশেষে ১২৩৫ খ্রীস্টাব্দে তিরানব্বই, অনেকের মতে সাতানব্বই বছর বয়সে হজরত মুইন-উদ্-দিন চিস্তি এই মহাতীর্থে মহাপ্রয়াণ লাভ করেন। ইল্‌তুৎমিস্ প্রায় সঙ্গে সঙ্গে এই দরগা নির্মাণ শুরু করেন, কিন্তু শেষ করতে পারেন না। কারণ সে বছরে তিনিও মারা যান।

"তারপরে প্রায় তিন শ' বছর দরগা অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে থাকে! ষোড়শ শতকের প্রথম দিকে সম্রাট হুমায়ুন দরগার প্রাথমিক নির্মাণকার্য শেষ করেন। তবে সে দরগার সঙ্গে এ দরগার কোন মিল খুঁজে পাবেন না। আজকের এ দরগার প্রকৃত নির্মাতা সম্রাট আকবর। জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জাহান অবশ্য এর যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছেন।" একবার থেমে পাণ্ডাজী প্রশ্ন করে, "আপনারা জানেন সে সম্রাট আকবর বহুকাল অপুত্রক ছিলেন?"

আমরা মাথা নাড়ি।

পাণ্ডা বলে চলে, "তৎকালীন দরগার ইমাম সেলিম চিস্তির পরামর্শ মতো তিনি এখানে মানত করলেন। কিছুকাল পরেই সম্রাট পুত্রলাভ করলেন। তিনি সেলিম চিস্তির নামানুসারে ছেলের নাম রাখলেন সেলিম। মানত রক্ষা করার জন্য তিনি আগ্রা থেকে পায়ে হেঁটে এখানে এলেন এবং দরগার সংস্কার সাধনে মনোনিবেশ করলেন। সম্রাট আকবরের সেই পদযাত্রাকে অবলম্বন করে অঙ্কিত সে আমলের তিনখানি রঙিন চিত্র বম্বের 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌স মিউজিয়াম' এবং উত্তরপ্রদেশের 'রামপুর পাঠাগারে' সযত্নে রক্ষিত হয়েছে।

"সম্রাট আকবর প্রথম আজমীর আসেন ১৫৬১ খ্রীস্টাব্দে, রাজপুতনা জয়ের ব্যবস্থা করতে। ১৫৬৮ সালেও তিনি ঐ একই কারণে আজমীর আসেন। কিন্তু ১৫৭০ সালে তিনি এখানে আসেন খাজা সাহেবের কাছে তাঁর মানত রক্ষা করতে। এবং সেই থেকে ১৫৮২ সাল পর্যন্ত প্রতিবছর তিনি আজমীর এসেছেন শুধু দরগা দর্শনের জন্য। এই পুণ্যক্ষেত্রের প্রতি তাঁর একটা প্রবল আকর্ষণ ছিল। তাই চিতোর বিজয়ের পরে তিনি স্মারক স্বরূপ চিতোরগড় থেকে যে জয়ঢাক এবং বাতিদান নিয়ে এসেছিলেন, তা এই দরগাতেই নিবেদন করে গেছেন। আজও দরগার উত্তর-তোরণে গেলে আপনারা সেই স্মারক দেখতে পাবেন।"

এখানে বোধহয় সারাদিনই ভক্তদের ভিড় লেগে থাকে। শত শত যাত্রী আসছেন, দর্শন করছেন, চলে যাচ্ছেন। আবার দলে দলে নতুন যাত্রী আসছেন। এবং যাত্রীদের অধিকাংশই অমুসলমান।

পাণ্ডা আমাদের দরগার বারান্দায় নিয়ে আসে। মেঝেতে কার্পেট পাতা। তার ওপরে কয়েকজন লোক বসে আছেন। একজন দাড়িওয়ালা ভদ্রলোকের সামনে একটি কাঠের ক্যাশবাক্স। মনে হচ্ছে তিনি সেরেস্তাদার। আরেকজনের সামনে একখানি বড় খাতা।

দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক আমাদের বসতে বলেন। আমরা কার্পেটের ওপরে বসে পড়ি।

সেরেস্তাদারের জনৈক সহকারী পাণ্ডাকে দেখিয়ে বলেন, "এ আপনাদের হজরত মুইন-উদ্-দিন চিস্তির সমাধিক্ষেত্র দেখাতে নিয়ে যাবে। দরগায় ঢোকার আগে ছেলেরা মাথায় রুমাল বেঁধে নেবেন আর মেয়েরা মাথায় কাপড় দেবেন।"

আমরা মাথা নাড়ি।

সেরেস্তাদার বলেন, "দরগার রক্ষণাবেক্ষণের জন্য কিছু সাহায্য করুন।"

পাণ্ডার দিকে তাকাই। সে সেরেস্তাদারের বক্তব্য সমর্থন করে বলে, "কিছু দিয়ে দিন।"

পকেট থেকে একখানি দু'টাকার নোট বের করে সেরেস্তাদারের দিকে এগিয়ে ধরি। তিনি হাত সরিয়ে নেন। তিরস্কারের ভঙ্গিতে বলেন, "এত খরচ করে এত দূর থেকে আজমীরে এলেন, আর দরগায় মাত্র দুটো টাকা দিচ্ছেন! অন্তত দশটা টাকা দিন। তার কমে কেউ দেয় না। ইচ্ছে করলে ঐ খাতাটা দেখতে পারেন।"

তার সহকারী উর্দু লেখা খাতাখানি আমার সামনে মেলে ধরেন।

দাদা ব্যবসায়ী মানুষ। তিনি আমার অসহায় অবস্থাটা বুঝতে পারেন। বলেন, "ও খাতার লেখা আমরা বুঝতে পারছি না, আর তা বোঝারও দরকার নেই। আমরা তীর্থযাত্রী নই, ট্যুরিস্ট। বেড়াতে এসেছি।"

"অধিকাংশই তো বেড়াতে আসেন। তাদেরই সাহায্যে এই দরগা চলছে।" সেরেস্তাদার দাদার যুক্তি খণ্ডন করেন।

দরাদরি চলতে থাকে। অবশেষে পাঁচ টাকায় রফা হয়। রসিদ হাতে নিয়ে পাণ্ডার সঙ্গে দরগায় প্রবেশ করি।

আমরা মূল-সমাধিমন্দিরে আসি। ঘরখানির আয়তন খুব বড় নয়। কিন্তু ভারি সুন্দর। মসৃণ মূল্যবান পাথরে তৈরি। মন্দিরের মাঝখানে সেই মহামানবের সমাধি—সোনা ও রূপার পাতে মোড়া। চারিদিকে রেলিং, প্রায় আমাদের মাথা সমান উঁচু।

সেবাইত দর্শন করাচ্ছেন, মন্ত্রপাঠ করাচ্ছেন। অনেকটা আমাদের মন্দিরের মতো। শুধু ভাষা ভিন্ন। আর ভেতরটা তেমন অন্ধকার ও স্যাঁতসেঁতে নয়, তেমন চেঁচামেচি ও ধাক্কাধাক্কি নেই। ফুল ধূপ আর আতরের সুবাসে এখানে একটি স্বর্গীয় পরিবেশ রচিত হয়েছে।

আমার সারা শরীর একটা পুলকের শিহরন জেগে ওঠে। যেখানে, আমি এখন যেখানে দাঁড়িয়ে রয়েছি, ঠিক এইখানে হয়তো কতবার সম্রাট আকবর এসে দাঁড়িয়েছেন। এসেছেন জাহাঙ্গীর ও শাহ্‌জাহান। আজ তাঁরা কোথায়? কেউ নেই কিন্তু রয়েছে এই সমাধিমন্দির। একদিন আমি থাকব না, সেদিনও আজকেরই মতো শত-সহস্র ভক্তের আগমনে এই পুণ্যক্ষেত্র প্রতিদিন বন্দিত হবে। মহতের মৃত্যু নেই।

অবশেষে আমরা সেই মহামানবের সমাধিক্ষেত্রটি প্রদক্ষিণ করি। ভক্তি বিনম্রচিত্তে তাকে প্রণাম করে বলি—হে মহান, তুমি আমাদের আশীর্বাদ করো। আমরা যেন ধর্মীয় গোঁড়ামি আর সম্প্রয়াদিক সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে উঠতে পারি। এই উপমদেশের মাটি যেন আর সাম্প্রদায়িক শোণিতে কোনদিন কলঙ্কিত না হয়। তোমার মানবত্তাবোধ যেন বিশ্বের মানুষের মনে মূর্ত হয়ে ওঠে।

লজ্জা পেয়ে বলি "এই একটু চিতোরগড়ের কথা ভাবছিলাম আর কি।"

"স্বার্থপরের মতো একা একা না ভেবে আমাদের একটু আপনার ভাবনার অংশীদার করুন না। আমরা যে আপনার মতো বই মুখস্থ করে বেড়াতে বেরুইনি।" বৌদির কথার জের টেনে শঙ্করী আমাকে বলে।

হাসতে হাসতে উত্তর দিই' "কিন্তু কথা দিয়েছো, এর পরের বারে পড়াশুনা করে পথে বের হবে।"

"তা না হয় বেরুলাম। কিন্তু এবারের ভ্রমণটা যাতে না মাঠে মারা যায়, তার একটা ব্যবস্থা করুন।" বৌদি শঙ্করীর প্রস্তাব সমর্থন করে।

"কি শুনতে চাইছেন?"

সরকারদা বলেন, "আগে তো চিতোরগড় সম্পর্কে কিছু বলুন।"

আমি বলতে থাকি, "সেকালের চিতোরগড় শহর বলতে শুধু ঐ দুর্গনগরীকেই বোঝাতো, এখনকার মতো তখন সমতলে কোন জনপদ ছিল না। সুতরাং সেকালে দুর্গকে কেন্দ্র করেই নগর গড়ে উঠেছিল, দুর্গের ইতিহাসই নগরীর ইতিহাস।"

"বেশ তাই বলুন।"

"কথিত আছে মধ্যমপাণ্ডব ভীমসেন নাকি প্রথম এখানে দুর্গ নির্মাণ করেছিলেন। কিন্তু কালক্রমে সে দুর্গ ধ্বংস হয়ে যায়। ঐতিহাসিকরা অনেকেই অবশ্য এ অনুমানকে সত্য বলে মনে করেন না। তাঁরা বলেন, চিত্রং নামে জনৈক মোরি রাজপুত প্রথম ঐ দুর্গ তৈরি করেন আর তাই পরবর্তীকালে দুর্গনগরীর নাম হয় চিত্রকোট। দুর্গের দক্ষিণে একটি জলাশয় এখনও তাঁর নামটিকে বাঁচিয়ে রেখেছে। তাছাড়া মেবারের প্রাচীন মুদ্রায় চিত্রকোট নামটি পাওয়া গিয়েছে। ঐতিহাসিকদের মতে চিতোর শব্দটি চিত্রকোট শব্দের অপভ্রংশ।

"রাজস্থানি ইতিহাসের আবিষ্কারক কর্নেল জেম্‌স টড বলেছেন, রাণা রাজবংশের আদিপিতা বাপ্পা রাওয়াল ৭৩৪ খ্রীস্টাব্দে তৎকালীন মোরিরাজা মান সিংহকে বিতাড়িত করে এই দুর্গ অধিকার করেন। সেই থেকে ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্থাৎ মহারাণা প্রতাপ সিংহের পিতা উদয় সিংহের উদয়পুর প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত, চিতোর সিসোদিয়া রাজপুত রাজবংশের রাজধানী ছিল।"

"উদয় সিংহ তো আকবরের কাছে চিতোর হারিয়েছিলেন, তাই না?" আমি থামতেই বৌদি প্রশ্ন করেন।

"হ্যাঁ।" উত্তর দিই।

শঙ্করী বলে, "ঘোষদা, একটু বাপ্পার কথা বলুন না।"

আমি শুরু করি, "কর্নেল জেমস টডের 'Annals And Antiquities of Rajasthan' বই থেকে আমরা জানতে পারি যে বাপ্পা ৭১৩ খ্রীস্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি গুহিল বা গিহ্লোট বংশীয় একজন ক্ষত্রিয় রাজা। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা, গুহ শ্রীরামচন্দ্রের পুত্র লবের বংশধর। বাপ্পার বাবা নাগদিত্য হলেন গুহর অষ্টম পুরুষ। তিনি পাহাড়ী জনপদ ইদরের রাজা ছিলেন। তাঁকে ভীলরা হত্যা করেন। আত্মীয়-স্বজন বালক বাপ্পাকে নিয়ে ত্রিকুট পাহাড়ের কাছে নগেন্দ্র-নগরে চলে আসেন। কিন্তু সেখানে এক ঝুলন-পূর্ণিমায় বালক বাপ্পা খেলার ছলে স্থানীয় শোলাঙ্কি রাজার মেয়েকে বিয়ে করে বসেন। কথাটা যথাসময়ে জানাজানি হয়ে যায়। বাপ্পাকে

প্রাণভয়ে এক নির্জন গুহায় কিছুকাল পালিয়ে থাকতে হয়। এই সময় বলীয় ও দেব নামে দুজন ভীল সাথী সর্বদা তাঁর সঙ্গে ছিলেন। তাঁদের সাহায্যে বাপ্পা পরবর্তীকালে মেবারের সিংহাসনে বসতে সক্ষম হন। তাই আজও অভিষেকের সময় উদয়পুরের মহারাজারা ভীলদের রক্ততিলক ললাটে ধারণ করে থাকেন।

"তারপরে বাপ্পার জীবনে কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা ঘটে। অবশেষে বাপ্পা চিতোর আসেন। তৎকালীন চিতোরের মোরিরাজা মান সিংহ সম্পর্কে তাঁর মামা হতেন। তিনি তাঁকে পরম সমাদরে গ্রহণ করলেন। বাপ্পার বিচক্ষণতা ও বীরত্বে মুগ্ধ হয়ে রাজা মান সিংহ তাঁকে সামন্ত-সমিতির অধিনায়ক নিযুক্ত করলেন। ক্রমে ক্রমে বাপ্পা সামরিক বিভাগের সর্বে-সর্বা হয়ে বসলেন।

"রাজপরিবারের লোকজন এবং সামন্ত রাজারা সকলেই বাপ্পাকে জব্দ করবার সুযোগ খুঁজতে থাকলেন। আর ঠিক তখুনি এক প্রবল পরাক্রান্ত বিদেশী রাজা চিতোর আক্রমণ করলেন। সামন্তরা মহারাজা মানকে কোন সাহায্য করা তো দূরের কথা, তাঁরা তাঁকে বললেন—আপনার পেয়ারের সেনাপতি বাপ্পাকে বলুন মহারাজ, সে একাই শত্রুদের তাড়িয়ে দেবে।

"বাপ্পা কিন্তু তা-ই করলেন। আপন বীরত্ব ও বিচক্ষণতায় তিনি শত্রুকে পরাজিত করে চিতোর ফিরে এলেন। রাজা মান তাঁকে সস্নেহে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

"বাপ্পার কিন্তু তখন অভিনন্দন গ্রহণ করার মতো সময় ছিল না। কারণ তিনি খবর পেয়েছেন যে সেলিম নামে জনৈক মুসলমান হিন্দুরাজ্য গজনী অভিযানে দখল করে নিয়েছেন। বাপ্পা তখুনি গজনী অভিযানে বেরিয়ে পড়লেন। সেলিম তাঁর সে আক্রমণ রুখতে পারলেন না। একজন সূর্যবংশীয় সামন্তকে গজনীর সিংহাসনে বসিয়ে বাপ্পা চিতোরে ফিরে এলেন। অনেকে বলেন, বিজয়ের স্মারক স্বরূপ তিনি সেলিমের অসামান্যা সুন্দরী একটি যুবতী কন্যাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন। কারণ সুন্দরী নারীদের বেলায় বাপ্পার নাকি কোন ধর্মবিচার ছিল না।

"রাজা মান বিজয়ী বীর বাপ্পাকে সানন্দে চিতোরে বরণ করলেন বটে কিন্তু তিনি সেলিমের মেয়েকে ঘরে ঠাঁই দেবার জন্য তাঁকে তিরস্কার করলেন। মোহান্ধ বাপ্পা পিতৃতুল্য রাজার প্রতি ক্ষুব্ধ হলেন। ঈর্ষাপরায়ণ সামন্তগণ এমনি একটি সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিলেন। তাঁরা কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে চাইলেন। সেলিমের মেয়ের সহায়তায় বাপ্পাকে রাজা মানের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তুললেন। তাঁদের উদ্দেশ্য সফল হলো। অতীত বিস্মৃত হয়ে বাপ্পা একদিন তাঁর আশ্রয়দাতাকে বিতাড়িত করে চিতোরের সিংহাসন অধিকার করে নিলেন। নিজেকে হিন্দুমুকুট, হিন্দুসূর্য, রাজগুরু ও সার্বভৌম রাজা বলে ঘোষণা করলেন। মেবারের ইতিহাসে নবযুগের সূচনা হলো।"

একটু থেমে আবার বলি, "১৯০৮ সালে প্রকাশিত 'ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ার'-এ অবশ্য এ সম্পর্কে অন্যকথা বলা হয়েছে।"

"কি বলেছে?" বৌদি জিজ্ঞেস করেন।

উত্তর দিই, "বলা হয়েছে চিতোরের মহারাণারা কুশের বংশধর। এই বংশের আদিপুরুষ কনক সেন কাথিয়াওয়ারে বল্লবী নামে এক রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন। তাঁর বংশের শিলাদিত্য শত্রুর আক্রমণে নিহত হন। শিলাদিত্যের ছেলে গুহাদিত্য মেবারের দক্ষিণ-পশ্চিমে ইদর নামে এক পার্বত্য প্রদেশের রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁর বংশের নাম হয় গোহ্লেট কিংবা গাহ্লেট। এই

বংশের যষ্ঠপুরুষ হলেন দ্বিতীয় মহেন্দ্রজী অর্থাৎ বাপ্পা। আর উদয়পুরের বর্তমান মহারাজা বাপ্পার উনষাটতম পুরুষ।"

"বাপ্পা সম্পর্কে ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারে কি বলা হয়েছে ঘোষদা?"

"বলা হয়েছে---'He had his capital at Nagda, a few miles to the north of Udaipur city, and when he grew up, left it to seek his fortune at Chitor, where Raja Man Singh of the Mori clan of Rajputs was ruling. The story runs that he led the Chitor forces against the Muhammadans on their first invasion of India from Sind, and that, after defeating and expelling them, he ousted Man Singh in 734 A. D. and ruled in his stead, taking the title of Rawal.

বাপ্পার বর্শাটা নাকি ছিল প্রায় ত্রিশ ফুট লম্বা। অন্য কেউ তুলতে পারতেন না কিন্তু তিনি সেটি নিয়ে অনায়াসে চলাফেরা করতেন।

"কর্নেল টড বাপ্পা সম্পর্কে আর কি বলেছেন?"

"বাপ্পা নাকি খোরাসান ইস্পাহান কান্দাহার কাশ্মীর ইরান, তুরান ও কাফ্রিস্থান প্রভৃতি নানা দেশের রাজাকে পরাজিত করে তাঁদের কন্যাদের চিতোর এনে বিয়ে করেছিলেন। তাঁর মুসলমান রাণীদের গর্ভে একশ' ত্রিশটি সন্তান এবং হিন্দু রাণীদের গর্ভে আটানব্বুইটি সন্তান জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মুসলমান রাণীদের বংশধররা হলেন নৌসেরা-পাঠান আর হিন্দু রাণীদের সন্তানরা অগ্নি-উপাসক সূর্যবংশী।

"বাপ্পা নাকি তাঁর কিছু পুত্রকে সৌরাষ্ট্রে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আইন-ই-আকবরী গ্রন্থে বলা হয়েছে—আকবরের সময় বাপ্পাবংশের পঞ্চাশ হাজার বীর নানাস্থানে রাজত্ব স্থাপন করেছিলেন। টডের মতে বাপ্পার অন্তত শোয়া দু'শ সন্তান ছিলেন। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি বাণপ্রস্থ অবলম্বন করেছিলেন।"

"তার মানে সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন, এই তো!" মৃদু হেসে সরকারদা জিজ্ঞেস করেন।

"ঠিক তা নয়," আমি হাসতে হাসতে বলি, "ওঁরা বলেন, তিনি মেরুশৃঙ্গতলে মুনিবৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন।"

ইতিমধ্যে আমরা ভূপাল-ভবন ও বাঙালি-হোটেল ছাড়িয়ে এসেছি। এবারে কালেক্টরেটের সামনে এসে টাঙ্গা ডানদিকে মোড় নিল। অর্থাৎ ন্যাশনাল হাইওয়ে ছেড়ে আমরা সিটি রোড ধরে পুবে এগিয়ে চললাম।

"ছোট শহর।" সরকারদা হঠাৎ বলে ওঠেন।

"হ্যাঁ।" আমি বলি, "তবে এখন তো অনেক বড় হয়ে গেছে, আয়তন ২৪·৩১ বর্গকিলোমিটার। আগে আরও ছোট ছিল ১৯০১ সালে এ শহরে মাত্র ৭,৫৯৩ জন বাস করতেন।"

"এখন?" বৌদি জিজ্ঞেস করেন।

"এখন, মানে ১৯৭১ সালে এ শহরের জনসংখ্যা ছিল ২৫,৯১৭ জন। তাঁদের মধ্যে ১৪,৪২৫ জন পুরুষ ও ১১,৪৯২ জন নারী।"

"বাড়ি-ঘর ও পরিবারের সংখ্যা কত ছিল ঘোষদা?" মৃদু হেসে শঙ্করী প্রশ্ন করে।

"তখন এখানে ৫,১২২টি বাড়িতে ৫,৬২০ পরিবার বাস করতেন।"

"আচ্ছা, চিতোরগড়ের ভৌগোলিক আবস্থানটা একটু বলবেন?" শঙ্করী হাসতে হাসতে আবার প্রশ্ন করে।

"২৪°৫৩ উঃ অক্ষরেখা এবং ৭৪'৩৯ পূঃ দ্রাঘিমায় অবস্থিত এই শহর।"

আমাদের পেছনের টাঙ্গার সামনে বসেছেন দাদা ও সত্যেনদা, পেছনের সিটে দিদি ও মা। ওঁরা আমাদের কথাবার্তা সবই শুনতে পাচ্ছেন। এবারে দাদা জিজ্ঞেস করেন, "কী তোমার ঘোষদা পরীক্ষায় পাস করল?"

শঙ্করী সহাস্যে উত্তর দেয়, "হ্যাঁ"।

আমরা গাম্ভেরী নদীর তীরে এলাম। সেকালে এ নদীটি দুর্গনগরীর প্রতিরক্ষায় প্রচুর সাহায্য করেছে। একালে তার ওপরে চমৎকার বাঁধানো পুল—বাস যাতায়াত করে।

এই পুল কবে তৈরি হয়েছে জানি না। তবে ১৯০১ সালেও এখানে একটি ধূসর রঙের চুনাপাথরের পুল ছিল এবং সেটি নাকি চতুর্দশ শতাব্দীতে নির্মিত হয়েছিল।

গাম্ভেরী একটি নাতিদীর্ঘ নদী। মধ্যপ্রদেশ থেকে সৃষ্ট হয়ে এই জেলার নিমবাহেরা তহশিলকে অতিক্রম করে এখানে এসেছে। এখান থেকে চলে গিয়েছে ভের্দা, এই তহশিলের একটি গ্রাম। সেখানে গাম্ভেরী এ জেলার অন্যতম প্রধান নদী বেরাচে মিশেছে।

পুলের ওপর দিয়ে টাঙ্গার শোভাযাত্রা সোজা পুবে এগিয়ে চলেছে। এখান থেকে পাহাড়টির দূরত্ব এক কিলোমিটারও নয়। চিতোর দুর্গকে পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি এখন।

পুল পেরিয়ে বাসস্ট্যান্ড। পাশেই একটি রমণীয় উদ্যান। ডানদিকে ঘুরে ফোর্ট রোড ধরে টাঙ্গা এগিয়ে চলল। একটু বাদেই আমরা পাহাড়ের পাদদেশে পৌঁছব।

পাহাড়টি মোটেই উঁচু নয়। পাদদেশ থেকে মাত্র ১৫২ মিটার উঁচু পাহাড়ের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ভারতের শৌর্য ও স্বাধীনতা, বীরত্ব ও আত্মত্যাগের সর্বশ্রেষ্ঠ স্মৃতিমন্দির, চিতোরগড়—'Citadel of valour.'

ফোর্ট রোড বাঁদিকে মোড় ফিরেই চড়াই শুরু হলো। অর্থাৎ আমরা এখন পাহাড়ে উঠছি। মসৃণ পথ, আস্তে আস্তে উঁচু হয়েছে।

পাহাড়টির পাদদেশ জুড়ে ঘন জঙ্গল। শুনেছি এর পাদদেশের পরিধি প্রায় ১৩ কিলোমিটার আর উপরিভাগের পরিধি ১১ কিলোমিটারের মতো।

পদল পোল অর্থাৎ দুর্গনগরীর প্রথম তোরণে এলাম। তোরণটি যেমন মজবুত তেমনি সুন্দর। আবার অবস্থানটিও অপূর্ব—বহুদূর পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে।

সামনের টাঙ্গা থেকে উমাদি জিজ্ঞেস করেন, "ঘোষদা, এরকম ক'টি পোল পেরুতে হবে আমাদের?"

"সাতঠো।" আমি কিছু বলতে পারার আগেই বৃদ্ধ টাঙ্গাওয়ালা বলে ওঠে।

অবাক হই। জিজ্ঞেস করি, "তুমি বাংলা জানো?"

"থোড়া থোড়া। হামি যে বিশ বরষ কলকাত্তামে ছেল।"

"কি করতে?"

"ঘোড়াগাড়ি চালাতো।"

"চলে এলে কেন?"

"বস্ আউর ট্যাসকী বেশি হোলো, হামলোগ বে-কার হয়ে গেল।"

কি বলব? চুপ করে থাকি। এ তো সভ্যতার চিরন্তন সমস্যা। যান্ত্রিক অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ঘোড়া তো দূরের কথা, মানুষের মূল্যই কমে যাচ্ছে। অথচ পৃথিবীতে মানুষ বাড়ছে। পৃথিবীর কথা থাক্, ভারতের কথা ভাবা যাক্। ভারত বিশ্বের দ্বিতীয় জনবহুল রাষ্ট্র—চীনের জন সংখ্যা ভারতের চেয়ে বেশি কিন্তু চীন তো আয়তনেও অনেক বড়। তাছাড়া বার্ষিক জন্মহার ভারতের চীনের চেয়ে বেশি। চীনের জন্মহার ১৭ শতাংশ আর ভারতের ২·৩ শতাংশ। বুঝতে পারছি না কর্তৃপক্ষ পরিবার পরিকল্পনার মতো একটি অত্যাবশ্যক বিষয় নিয়ে এখনও ছেলেখেলা করছেন কেন?

কিন্তু ভারতের কথা এখন থাক্, ভারতগৌরব চিতোরগড়কে দেখা যাক্। প্রথম তোরণ থেকেই পথের পাশে শুরু হয়েছে অনতিক্রম্য ও দুর্ভেদ প্রস্তর প্রাচীর। প্রাচীরের পাশে পাশে সৈন্য চলাচলের পথ, মাঝে মাঝে সিঁড়ি ও চিলেকোঠা। সারা প্রাচীরে বন্দুকের নল বসাবার ফোকর।

চড়াই পথ হলেও টাঙ্গা ভালই চলেছে। কারণ পথের নতিমাত্রা বা ঢাল আগাগোড়া প্রতি ১৫ ইঞ্চিতে মাত্র ১ ইঞ্চি ক্রমোচ্চ। তার মানে ঘোড়া চলাচলের উপযোগী করেই নির্মিত।

একটুকরো বাঁধানো জায়গা দেখিয়ে টাঙ্গাওয়ালা বলে, "মহারাণা মিকুলের পৌত্র বাঘ সিংহের স্মৃতিবেদি। ১৫৩৪ সালে গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ যখন চিতোর আক্রমণ করেন, তখন বীরকেশরী বাঘ এখানেই শহীদ হন।"

দ্বিতীয় তোরণ ভৈরোঁ পোল পেরিয়ে এলাম। টাঙ্গা এগিয়ে চলেছে। আমরা ধীরে ধীরে ওপরে উঠছি।

পথের পাশে ছত্রী দেখিয়ে টাঙ্গাওয়ালা বলে, "প্রাতঃস্মরণীর বীর জয়মল ও পাট্টার স্মৃতিসৌধ। সম্রাট আকবরের চিতোর আক্রমণের সময় এখানেই জয়মল ও তাঁর ষোল বছরের সহকারী পাট্টা মৃত্যু বরণ করেন।"

মনে মনে ভেবে চলি সেই অমর উপাখ্যান—ইংরেজি ১৫৬৭। আকবর উদয়সিংহের চিতোর আক্রমণ করলেন। জয়মল ও পাট্টার নেতৃত্বে রাজপুতরা বহুগুণ শক্তিশালী মোগলবাহিনীকে চারমাস চিতোরে ঢুকতে দিলেন না। মরিয়া হয়ে আকবর আক্রমণের নেতৃত্ব নিজের হাতে নিলেন। নিজে গুলি করে জয়মলকে হত্যা করলেন।

কোন সুবিধা হলো না। ষোল বছরের পাট্টা এগিয়ে নেতার দায়িত্ব পালন করতে থাকলেন। বাধ্য হয়ে তাঁকেও মেরে ফেলতে হলো।

কৃতজ্ঞ রাজপুতরা তাঁদের পুণ্যস্মৃতি রক্ষার জন্য এই স্মৃতিমন্দির তৈরি করেছেন। স্বাধীনতার সেই সুমহান শহিদদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানিয়ে এগিয়ে চলি।

জয়মল ও পাট্টাকে হত্যা করার পরেও আকবর কিন্তু সেদিন সহজে চিতোর জয় করতে পারেন নি। চিতোরের প্রতিটি পুরুষ সেবারে এক একজন জয়মলে রূপান্তরিত হয়েছিল। আর নারীরা?

হ্যাঁ, তাঁরাও প্রত্যেক পদ্মিনীতে পরিণত হয়েছিল। তাঁরা জানতেন আকবর আলা-উদ্-দিন খিলজী নন। তবু তাঁরা তাঁকে বিশ্বাস করতে পারেন নি। নারীত্বকে পাশবিকতার হাত থেকে রক্ষা করার জন্য চিতোরের বীরাঙ্গণাগণ সেদিনও স্বেচ্ছায় জহরব্রতের অনুষ্ঠান করেছেন।

মহামতি আকবর মহাশ্মশান চিতোরের বুকে মোগল পতাকা প্রোথিত করেছিলেন।

আর তাই বোধহয় অনুতপ্ত আকবরকেও জয়মল এবং পাট্টার স্মৃতিরক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়েছিল। তিনি তাঁদের দুটি প্রস্তর মূর্তি তৈরি করিয়ে আগ্রা দুর্গের প্রধান তোরণে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অনেকে অবশ্য আকবরের এই মহানুভবতাকে রাজনৈতিক চাল বলে মনে করেন। তাঁদের মতে নিজের রাজপুত সৈন্যদের ফাঁকি দেবার জন্যই বিচক্ষণ আকবরকে মহানুভবতার মুখোশ পরতে হয়েছিল।

তৃতীয় তোরণ হনুমান পোলে পৌঁছে ঘোড়াদের কয়েক মিনিট বিশ্রাম দিতে হলো। এরা তো আর রাণাপ্রতাপের চেটক নয়।

চড়াই পথ, তেমন প্রশস্ত নয়। খানদুয়েক টাঙ্গা পাশাপাশি চলতে পারে কোন মতে। কিন্তু প্রতিটি তোরণের দুদিকে অনেকটা জায়গা সমতল ও সুপ্রশস্ত। কাজেই এখানে বিশ্রাম নিতে ঘোড়াদের অসুবিধে হচ্ছে না।

আবার এগিয়ে চলেছি। এখন পথের পাশে দু-সারি প্রাচীর। টাঙ্গাওয়ালা জানালো—ওপরের দিকে কোথাও কোথাও নাকি চার-সারি পর্যন্ত প্রাচীর আছে। অর্থাৎ সে আমলে এর চেয়ে দৃঢ়তর প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কিছু হওয়া সম্ভব ছিল না।

একে একে গণেশ, জোড়লা ও লক্ষ্মণ পোল পেরিয়ে আমরা দুর্গনগরীর শেষ তোরণ রাম পোলের সামনে উঠে এলাম। টাঙ্গাওয়ালারা আবার ঘোড়াদের দশ মিনিট বিশ্রাম মঞ্জুর করল। ভালই হলো, এই অবসরে টাঙ্গা থেকে নেমে স্বপ্নের চিতোরগড়কে একটু ভাল করে দেখে নেওয়া যাক্।

প্রথমেই নজর পড়ে তোরণটির দিকে। তোরণ তো নয়, একটি সুরক্ষিত ও সুরম্য মন্দির। তারা সারা গায়ে সুদৃশ্য পাথরের ওপর অপরূপ শিল্পকলা। বাইরের দিকে ১৪৮২ ও ১৬৪১ খ্রীস্টাব্দের দুটি শিলালিপি রয়েছে দেখতে পাচ্ছি।

মন্দিরও অবশ্য রয়েছে একটি—শ্রীরামচন্দ্রের মন্দির। চিতোরবাসীরা যে তাঁদের আদিপিতা রামচন্দ্রের নামে এই সর্বশ্রেষ্ঠ তোরণটির নাম রেখেছেন।

পাশেই পুররক্ষীদের নিবাস। স্তম্ভগুলির কারুকার্য দেখবার মতো। আর দেখবার মতো হলো তোরণটির অবস্থান। এখানে দাঁড়িয়ে নিচের মুল-পথটিকে পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। আর চিতোর শহরকে মনে হচ্ছে একখানি রঙিন ছবি।

রাম পোল থেকে দুর্গনগরীর দুটি প্রবেশপথ। একটি উত্তরদিকে আরেকটি দক্ষিণে।

উকিলবাবু ও সামন্তবাবুর সঙ্গে পরামর্শ করে সরকারদা একজন গাইড ঠিক করলেন। ভদ্রলোক মধ্যবয়সী, চিতোরের লোক। আগে সেনাবাহিনীতে কাজ করতেন। একাত্তর সালে পাকিস্তানি হামলার সময় জয়শলমীর সেক্টরে ছিলেন। অর্থাৎ তিনি যৌবনে তাঁর পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য রক্ষা করেছেন।

কিন্তু দেশরক্ষার মহান কর্তব্য পালনের পরেই দেশের আইনে বেকার হয়েছেন—রিটায়ার করেছেন। বয়সের বিচারে নয়, চাকরির নিয়মে। পেন্‌সনের টাকায় পেট চলে না। তাই সৈনিক থেকে গাইড হয়েছেন। জানি না এতে তাঁর পেট চলছে কি না।

ভদ্রলোক আমাদের টাঙ্গায় উঠতে দিলেন না। বললেন, "আমাকে ঘিরে দাঁড়ান। আপনারা আজ যে মহাতীর্থ দর্শন করতে এসেছেন, আগে তার সম্পর্কে কিছু কথা শুনে নিন।"

আমরা তাঁর নির্দেশ পালন করি। তিনি বলতে থাকেন, "চারিদিক দেওয়াল ঘেরা পাহাড়ের এই প্রায় সমতল উপরিভাগই দুর্গনগরী চিতোর—পদ্মিনী ও কর্ণাবতীর চিতোর, বাপ্পা কুম্ভ ও সংগ্রাম সিংহের চিতোর, রাণা প্রতাপের প্রিয় চিতোর।

"সিসোদিয়া রাজপুতদের এই প্রাচীন রাজধানী ভারতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে গৌরবময় দুর্গনগরী। স্বাধীনতার শত্রুরা, চরিত্রহীন অর্থপিশাচ ও সাম্রাজ্যবাদীরা, যুগে যুগে এখানে পৈশাচিক ধ্বংসলীলা চালিয়েছে কিন্তু চিতোরের গৌরবগাথাকে মুছে ফেলতে পারে নি। নারীমাংসলোলুপ সেই সব পররাজ্যগ্রাসীরা আজ ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত কিন্তু চিতোর আজও বিশ্ব ইতিহাসের এক উজ্জ্বল অধ্যায় রূপে অক্ষয় হয়ে আছে, চিরকাল থাকবে।

"আপনারা দেখছেন যে এটি একটি পাহাড়ের চূড়া হলেও মালভূমি বলাই উচিত হবে। এটি উত্তর থেকে দক্ষিণে প্রসারিত। দৈর্ঘ্য প্রায় পাঁচ কিলোমিটার এবং প্রস্থে পৌনে এক কিলোমিটারের মতো। আয়তন ৬৯০ একর অর্থাৎ প্রায় ২৭৯ হেক্টর। আপনারা এখন সমুদ্রসমতা থেকে ১৩৫০ ফুট ওপরে রয়েছেন।

"দুর্গনগরী চিতোর শুধু সুরক্ষিত ছিল না, ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানকার মাটি বেশ নরম। একটু বাদে দেখবেন যে এখানে জল আছে, ক্ষেত আছে ও মন্দির আছে। তাই এখানকার বাসিন্দারা বাইরের জগতে মুখাপেক্ষী ছিলেন না। সেকালে রাজস্থানে একটি জয়প্রিয় প্রবাদ ছিল—গড় হ্যাঁয় চিতোরগড়, আউর সব গড়ীয়া।"

"মানে?" সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করী প্রশ্ন করে।

গাইড উত্তর দেন, "Only Chitorgarh is the fort, rest are fortresses."

।। দশ ।।

ধুলো উড়িয়ে টাঙ্গায় শোভাযাত্রা চলেছে এগিয়ে। প্রায় সমতল পথ—দু-ধারেই ধ্বংসাবশেষ। মাঝে মাঝে ক্ষেত জলাশয় ও বাড়িঘর। সপ্তম থেকে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত যে জনপদ ভারতবর্ষের জনমানসে জাগ্র-যৌবনের প্রতীক হয়েছিল, সে আজ পরিত্যক্ত। পর্যটক ও কয়েকঘর গ্রামবাসী ছাড়া কেউ আর এখন চিতোরের পথে পদচারণা করেন না। অথচ আজও ঐসব ধ্বংসস্তূপের কাছে কান পাতলে শুনতে পাওয়া যাবে। বিশ্ব-ইতিহাসের সেই সর্বোত্তম ত্যাগ ও দেশপ্রেমের অবিস্মরণীয় কাহিনী—যে কাহিনীকে আদর্শে রূপান্তরিত করতে পারলে ভারত আবার অপরূপা হয়ে উঠবে।

বেলা পৌনে এগারোটার সময় অর্থাৎ স্টেশন থেকে রওনা হবার ঠিক একঘণ্টা পরে আমরা জৈন-মন্দিরের সামনে এলাম। রাজস্থানের প্রায় প্রতিটি জনপদেই জৈন-মন্দির আছে।

গাইড টাঙ্গা থেকে নেমে নতুন মন্দিরের দিকে না এগিয়ে উল্টোদিকে চলতে শুরু করেছেন। আমরা নীরবে তাঁকে অনুসরণ করছি। কিন্তু উকিলবাবুর পক্ষে নীরব থাকা সম্ভব হলো না। ঝোপ-ঝাড় ও কাঁটাগাছে ছাওয়া এবড়ো-খেবড়ো পাথুরে পথ পেরুতে যে কষ্ট হচ্ছে তাঁর মিসেসের। অতএব তিনি সওয়াল শুরু করেন, "ও মশাই, আপনি আমাদের এ কোথায় নিয়ে চলেছেন?"

"ঐ যে ওখানে," গাইড ইসারা করে একটি স্মৃতিস্তম্ভ ও ভগ্নমন্দির দেখিয়ে দেন।

"ও দুটো কি?" উকিলবাবু আবার প্রশ্ন করেন।

"কীর্তিস্তম্ভ ও প্রাচীন জৈন-মন্দির।" গাইড বলে চলেন, "দুর্গনগরীর পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত ইন্দো-সারাসেনিক স্থাপত্যকলায় নির্মিত এই স্তম্ভটি চিতোরের একটি প্রাচীনতম স্মারক। পণ্ডিতরা অনুমান করেন জীজা নামে জনৈক বাঘেরওয়াল মহাজন দ্বাদশ কি ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এটি নির্মাণ করেছেন। তবে স্তম্ভটির পাদদেশে ৮৯৫ খ্রীস্টাব্দের একটি শিলালিপি পাওয়া গিয়েছে।"

পাথর ছড়ানো মাটির টিবির ওপর দিয়ে আমরা কীর্তিস্তম্ভের সামনে এসে দাঁড়াই। চার পাশেই ঝোপ-ঝাড় এবং কাঁটাগাছ। স্তম্ভটির ভেতরের অবস্থা আরও খারাপ। ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও ঢুকতে সাহস পাচ্ছি না। অথচ ওপরে উঠবার সিঁড়ি রয়েছে। শুনেছি এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে ব্রিটিশ সরকার এটির সংস্কার সাধন করেছিলেন। তারপরে কীর্তিস্তম্ভ আর মানুষের হাতের স্পর্শ পেয়েছে কি না জানা নেই আমার। না পেয়ে থাকলে, কর্মক্ষমতা ও দূরদর্শিতার জন্য স্বাধীন দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক বিভাগের প্রশংসা করতে হবে বৈকি!

গাইড বলতে শুরু করেন, "পাঁচতলা এই স্তম্ভটি প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভদেব বা আদিনাথের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। এর উচ্চতা ২৩ মিটার। নিচের দিকের পরিধি ৯ মিটার আর ওপরে ৪ মিটার।

বুঝতে পারছি এটি দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের কীর্তি। কারণ স্তম্ভটি বাইরের দিকে চারিপাশে চারটি নগ্নমূর্তি রয়েছে। গাইড আমার অনুমান সমর্থন করেন। বলেন, "এই পাঁচ ফুট লম্বা চারিটি তীর্থঙ্কর আদিনাথের।"

কীর্তিস্তম্ভ দেখে আমরা আবার সেই টিবিটির ওপর দিয়ে হেঁটে চলেছি। সহসা শঙ্করী বলে, "আচ্ছা ঘোষদা, এই টিবির নিচে নিশ্চয়ই কোন ধ্বংসস্তূপ রয়েছে?"

"তাই তো মনে হচ্ছে।" আমি তার সিদ্ধান্ত সমর্থন করি।

"তাহলে খনন করা হচ্ছে না কেন?" বৌদি বলেন।

"বোধহয় অর্থদপ্তর ব্যয় অনুমোদন করেন নি।" সরকারদা গম্ভীর স্বরে বৌদিকে বুঝিয়ে দেন।

আমরা সশব্দে হেসে উঠি।

গাইডের সঙ্গে একটি ধ্বংসপ্রায় প্রাচীন মন্দিরের সামনে এসে উপস্থিত হয়েছি। ভগ্ন মন্দিরটির সারা গায়ে হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি এবং ফুল খোদিত। জৈনমন্দির হলেও মনে হচ্ছে স্থানীয় ভগ্ন হিন্দুমন্দিরের খোদিত পাথর এনে তৈরি করা হয়েছিল।

গাইড বলেন, "এটি চতুর্বিংশ জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের মন্দির।"

"মহাবীর তো জন্মেছিল ঠিক আড়াই হাজার বছর আগে?" শঙ্করী জিজ্ঞেস করে আমাকে।

উত্তর দিই, "না, আরও আগে। তিনি খ্রীস্টপূর্ব ৬১৮ কিংবা ৫৯৯ সালের চৈত্র শুক্লা ত্রয়োদশীতে বর্তমান মুজফফরপুর জেলায় কৌদিন্যপুর বা কুন্দগ্রামের রাজপরিবারে জন্মগ্রহণ করেন।"

"তাহলে আগামী বছর আমরা তাঁর আড়াই হাজার জন্মজয়ন্তী পালন করছি কেন? আগামী বছর তো তাঁর ২৫৯৪ কিংবা ২৫৭৫ জন্মজয়ন্তী পালন করা উচিত!"

শঙ্করীর এ প্রশ্নের যাঁরা উত্তর দিতে পারেন, তাঁরা কেউ উপস্থিত নেই এখানে। সুতরাং

আমরা নীরবে টাঙ্গায় ফিরে চলি।

টাঙ্গার শোভাযাত্রা আবার এগিয়ে চলেছে। গাইড ঠিকই বলেছেন, মাঝে মাঝেই জলাশয় এবং চাষের জমি দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু তিনি তখন একটা কথা বললেন না কেন? দুর্গনগরীর প্রধান তোরণ তিনটি—পশ্চিমে রাম পোল। পুবে সূরয পোল আর উত্তরে লাখোটা-বারি।

বিষ্ণু মন্দিরের সামনে এসে টাঙ্গা থামল। শুনেছি এই মন্দির এলাকার ভেতরেই রয়েছে ভারতীয় ভজনগানের জননী ভক্তিমতী মীরাবাঈয়ের মন্দির।

পথের ডানদিকে পাথরের মন্দির-তোরণ। তোরণে রাণা রাজবংশের প্রতীক একটি শতদল খোদিত।

আমরা ভেতরে আসি। বাঁধানো অঙ্গনের পরে নাট-মন্দিরের সিঁড়ি। ওপরে উঠে আসতেই গাইড বলেন "ইন্দো-আর্য স্থাপত্যকলায় নির্মিত এই মন্দিরটিকে আপনারা একটু মনোযোগ দিয়ে দর্শন করবেন। দেখুন এর ছাদটির বৈচিত্র্য—পিরামিডাকৃতি এবং কত আস্তে আস্তে উঁচু হয়েছে। আর শিখরটিকে লক্ষ্য করুন, কেবল উঁচু নয়—কি রকম নিরেট এবং অভঙ্গ। তবে এ মন্দিরের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য গর্ভ-গৃহ প্রদক্ষিণের পথটি। প্রখ্যাত পর্যটক ও প্রত্নতাত্ত্বিক জে. ফাগুসানের মতে এটি রাজস্থানের একটি শ্রেষ্ঠ প্রাচীন মন্দির।"

"কবে তৈরি হয়েছে?" উকিলবাবু প্রশ্ন করেন।

গাইড উত্তর দেন, "খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে। আলা-উদ্-দিন মন্দিরটির খুবই ক্ষতি করেছিলেন। মহারাণা সংগ্রাম সিংহ-এর সংস্কার সাধন করেন।"

আমরা সিঁড়ি বেয়ে নাট-মন্দির উঠে আসি। খোদাই কাজ করা পাথরের গোল এবং চৌকো থামের ওপরে ছাদটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। তিনদিক খোলা, একদিকে গর্ভ-মন্দির।

বিষ্ণু মন্দির হলেও ভেতরে রাধাকৃষ্ণ ও বলরামের বিগ্রহ। আলা-উদ্-দিন আদি-বিগ্রহ বিনষ্ট করার পরে সম্ভবত মীরাবাঈয়ের অনুরোধে সংগ্রাম সিংহ বিষ্ণুমূর্তির পরিবর্তে এই রাধাকৃষ্ণের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছেন।

কৃষ্ণ-ভগবানকে প্রণাম করে আমরা আবার নেমে আসি মন্দির-চত্বরে। পাথর বাঁধানো আঙ্গিনার ওপর দিয়ে ডানদিকে হেঁটে চলি। সাহাবাবু, সামন্তবাবু ও শঙ্করী ছাতা মেলেছে। ভালই করেছে—প্রচণ্ড রোদ। আমরা মীরাবাঈয়ের মন্দিরে চলেছি।

চারদিকে দেওয়াল ঘেরা একই মন্দির এলাকার ভেতরে দুটি মন্দির। ছোট হলেও মীরাবাঈয়ের মন্দিরটি ভারি সুন্দর। এটিরও গড়ন রেখ-দেউলের মতো। এবং ভুবনেশ্বর মন্দিরের প্রভাবটি সুস্পষ্ট।

সিঁড়ির ঠিক আগে বাঁদিকে মীরাবাঈয়ের গুরুদেব রুইদাস চামরের সমাধি মন্দির।

সাতধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে নাট-মন্দির। দু-পাশে ছ'টি করে বারোটি কারুকার্য খচিত গোলাকার স্তম্ভ। ছাদে দুটি গোলাকার গম্বুজ। চারিদিকে পাথরের রেলিং। মন্দিরটি ষোড়শ শতকে নির্মিত হয়েছে।

গর্ভ-মন্দিরে কোন বিগ্রহ নেই, রয়েছে একখানি বড় ও একখানি ছোট ছবি। বড়টি ভক্ত-গায়িকা মীরাবাঈয়ের আর ছোটটি তাঁর ভগবান গিরিধারীর। মীরাবাঈ নিশ্চয়ই চিতোর ছেড়ে যাবার সময় তাঁর ইষ্টদেবতা গিরিধারীকে সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন।

তিনি এখন কোথায় জানি না, কিন্তু জানি একদিন তিনি ছিলেন এখানে এই মন-মন্দিরে। আমরা তাঁকে প্রণাম করি। সেই সঙ্গে প্রণাম করি মহীয়সী মীরাবাঈকে—যিনি রাজরাণী হয়েও ভিখারিণীর মতো পথে পথে তাঁর প্রভু গিরিধর নাগরকে খুঁজে বেরিয়েছেন।

সহসা ভজন শুনে চমকে উঠি। চেয়ে দেখি মীরাবাঈয়ের ছবির সামনে বসে উমাদি আপনমনে গেয়ে চলেছেন—

'সাজন সুধ জ্যোঁ জানে ত্যোঁ লীজে হো।
তুমি বিন মেরে অওর ন কোঈ
কৃপা রাবরী কীজে হো।।
দিবস ন ভুখ রৈন নহি নিন্দা
যোঁ তন পল পল ছিজো হো।
মীরাকে প্রভু গিরধর নাগর
মিল বিছুড়ন নহি কীজে হো।।'

মীরার মন্দির থেকে ফিরে চলেছি টাঙ্গায়, কিন্তু আমরা তাঁরই কথা আলোচনা করছি। কথায় কথায় আমি সহযাত্রীদের কাছে সেই মহীয়সী সাধিকার মহাজীবনের কথা বলছি—

"সম্ভবত ১৫০৪ খ্রীস্টাব্দে মাড়বারের মেড়তা তালুকের কুড়কী গ্রামে এক বৈষ্ণব পরিবারে মীরার জন্ম হয়। তাঁর বাবা রাণা রতন সিং মাড়বারের একজন রাঠোর-সামন্ত। তিনি মেড়তার ভূস্বামী ছিলেন।

"ছোটবেলা থেকেই মীরা ছিলেন কৃষ্ণপ্রেমপরায়ণা। তিনি ছিলেন সুগায়িকা এবং অসাধারণ সুন্দরী। জ্ঞান হবার পর থেকেই তিনি নির্জনে একা থাকতে ভালবাসতেন।

"শৈশবে তাঁর প্রধান সাথী ছিলেন খুড়তুতো ভাই রায়মল্ল। তিনিও একজন ভক্তকবি ছিলেন। চিতোর অবরোধের সময় তিনি আকবরের গুলিতে দুর্গ প্রাকারে নিহত হন।

"কথিত আছে ছোটবেলায় মীরা একদিন জনৈকা প্রতিবেশিনীর বিয়ে দেখে কৌতূহলী হয়ে মা-কে জিজ্ঞাসা করেছিলেন—মা আমার স্বামী কে?

"সাংসারিক কাজে ব্যস্ত মা মেয়েকে বুঝ দেবার জন্য গৃহ-দেবতার বিগ্রহ দেখিয়ে বললেন—এই গিরিধারী তোমার স্বামী মা!

"বালিকা মীরা সেই দিন থেকে গিরিধারীলালকে স্বামীজ্ঞানে সেবা করতে থাকলেন। এবং শেষ নিঃশ্বাস ফেলবার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি তাঁর এই ধারণায় অবিচলিতা ছিলেন।

"অনেকে বলেন, মীরার বয়স যখন চার বছর, তখন একদিন একজন সন্ন্যাসী তাঁদের বাড়ি এলেন। তাঁর সঙ্গে নারায়ণশিলার একটি গিরিধারী মূর্তি ছিল। বালিকা মীরার সেই মূর্তিটি বড়ই পছন্দ হলো। তিনি সন্ন্যাসীর কাছে আবদার করলেন—ওটা আমাকে দাও।

"সন্ন্যাসী নানা কথা বলে শিশুকে ভোলাবার চেষ্টা করলেন। তাঁকে একাধিক খেলনা দিলেন। কিন্তু মীরার সেই এক কথা—ওটা আমাকে দাও।

"নিরুপায় সন্ন্যাসী কাউকে কিছু না বলে মেড়তা থেকে পালিয়ে গেলেন।

"কিন্তু যাবেন কোথায়? শিশু মীরা প্রয়োপবেশন-ব্রত গ্রহণ করলেন। অপরদিকে সেই সন্ন্যাসী স্বপ্ন দেখলেন, স্বয়ং গিরিধারী তাঁকে বলছেন—আমার সাধিকা মীরাকে বঞ্চিতা করে আমার এই মূর্তি নিজের কাছে রাখার তোর কোন অধিকার নেই। আগামীকাল সকালে তুই

নিজে গিয়ে মীরার হাতে এই মূর্তি দিয়ে আসবি।

"বলা বাহুল্য সন্ন্যাসী তাঁর ইষ্টদেবতার আদেশ অবহেলা করেন নি। মীরাবাঈও আজীবন সেই মূর্তির উপাসনা করে গিয়েছেন।

"একালে তো বটেই, সেকালেও রাজপুত মেয়েদের বাল্যবিবাহের প্রচলন ছিল না। কিন্তু মীরার গান ও রূপের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে মেবারের মহারাণা সংগ্রাম সিংহ বালিকা মীরাকে পুত্রবধূ করে মেবারে নিয়ে এলেন।"

শঙ্করীর প্রশ্নে থামতে হয় আমাকে। শঙ্করী জিজ্ঞেস করে, "কিন্তু মীরাবাঈ তো রাণা কুম্ভের স্ত্রী! কুম্ভ যে সংগ্রাম সিংহের অন্তত পঞ্চাশ বছর আগে চিতোরের রাণা ছিলেন!"

"হ্যাঁ। কুম্ভ বাপ্পার উনচল্লিশতম বংশধর আর সংগ্রাম বিয়াল্লিশ। কাজেই কুম্ভ এবং মীরাবাঈ সমসাময়িক হতে পারেন না। টড সাহেব প্রথম এই ভুলটি করেন। পরবর্তীকালের ঐতিহাসিকরা তাঁর মতকে মেনে নিয়ে সেই ভুলের বোঝা বাড়িয়ে তুলেছিলেন। কিন্তু কিছুকাল আগে প্রখ্যাত ঐতিহাসিক মুন্সী দেবীপ্রসাদ প্রমাণ করেছেন, সংগ্রাম সিংহ তাঁর বড় ছেলে এবং চিতোরের ভাবী রাণা কুনওয়ার ভোজরাজের সঙ্গে মীরার বিয়ে দিয়েছিলেন।

"বিয়ের পরে মীরা চিতোরে এলেন—পরম-বৈষ্ণব পরিবার থেকে শাক্তের সংসারে। শুরু হলো সাধিকা মীরার সাধনার পরীক্ষা। বলা বাহুল্য মীরাবাঈ সাফল্যের সঙ্গে সে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু সে-সব সাত বছর পরের কথা। এই সাত বছর মাত্র মীরার দাম্পত্য জীবন। কারণ ১৫২৭ সালে খানুয়ার যুদ্ধে তাঁর স্বামী শহিদ হয়েছিলে এবং তখন তাঁর বয়স তেইশ বছরের বেশি নয়।

"মীরার দাম্পত্য জীবন সম্পর্কে সামান্য সংবাদই আমরা জানতে পেরেছি। স্বামী তাঁকে খুবই ভালোবাসতেন। আর সে ভালোবাসার মুগ্ধ হয়ে মীরা তাঁর গিরিধারীকে বিস্মৃত হয়েছিলেন। স্বামী সোহাগিনী মীরা ভোগ বিলাসিতার প্রবাহে গা ভাসিয়ে দিয়েছিলেন।

"গিরিধারী কিন্তু মীরাকে ভুলতে পারলেন না। তিনি চরম আঘাত হেনে সাধিকাকে আবার তাঁর নিজের কাছে টেনে নিলেন। সপ্তম বিবাহবার্ষিকী উদ্‌যাপন করতে পারার আগেই মীরাকে বৈধব্যের বেশ ধারণ করতে হলো।

"বৈধব্যের কঠোর স্পর্শ মীরাকে তাঁর বিস্মৃত জীবন-দেবতার কথা স্মরণ করিয়ে দিল। তিনি এবারে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে গিরিধারীর চরণে উৎসর্গ করলেন। রাজরাণীর সকল সম্পদ ও সুখ বিসর্জন দিয়ে তিনি রাজপ্রাসাদ থেকে চলে এলেন এই মন্দিরে।

"ভোগসর্বস্ব ও নাস্তিক দেবর বিক্রমদেব (কর্নেল টডের মতে বিক্রমজিৎ) তখন মেবারের মহারাণা। তিনি প্রথমে সুন্দরী ও যুবতী মীরার চরিত্র নষ্ট করার চেষ্টা করলেন। ব্যর্থ হয়ে তাঁর নামে কলঙ্ক রটালেন। তারপরে নানাভাবে নির্যাতন করে তাঁর সাধনা ও ভজন রচনায় বিঘ্ন ঘটাতে চাইলেন।

"বলা বাহুল্য মীরা নীরবে সে নির্যাতন সইলেন শুধু শক্তি সঞ্চয়ের জন্য মাঝে মাঝে তাঁর জীবন-দেবতাকে জানালেন—

'হে রী ম্হাসূ হরি বিন রহ্যো ন জায়।
সাসূ লড়ে মেরী ননদ খিজারে, রাণা রহ্যো রিসাঁয়।।

পহরো ভীরাখ্যো চৌকী বিঠায়ো তালা দিয়ো জড়ায়।
পূর্ব জন্মকী প্রীত পুরাণী, সো ক্যু ছোড়ী জায়।।
মীরাকে প্রভু গিরিধর নাগর আওর ন আরে ম্হাঁরী দায়।।'

—হে সখী, আমি যে হরি বিনা থাকতে পারি না। শাশুড়ী কোন্দল করেন, ননদ গঞ্জনা দেন। রাণা তো বিরক্ত হয়েই আছেন। তিনি প্রহরী বসিয়েছেন, দুয়ারে তালা দিয়েছেন। কিন্তু আমার এই পূর্ব জন্মের পুরনো প্রেমকে আমি কেমন করে ভুলব? হে মীরার প্রভু গিরিধর নাগর, তোমাকে ছাড়া যে আমার আর কাউকেই ভাল লাগে না।

"একদিন ননদ উদাবাঈ এসে তাঁকে বললেন—রাণা রাজবংশের একজন তরুণী বিধবা হয়ে সাধুসঙ্গের নামে তুমি যা কাণ্ড করছ, তাতে যে আমাদের জাত যায়।

"মীরা এ অপবাদ মাথায় তুলে নিলেন কিন্তু তিনি সাধুসঙ্গ এবং গিরিধারীর ভজন বন্ধ করলেন না।

"উদাবাঈ প্রথমে লোভ দেখিয়ে, তারপরে তিরস্কার করে এবং অবশেষে ভয় পাইয়ে মীরাকে তাঁর সাধনচ্যুত করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কোন ফলই হলো না। মীরার মন তখন 'হরি ভায়ো রে,' সে মন আর পার্থিব জীবনের মাঝে ফিরে আসতে পারে না।

"কিন্তু রাণাই বা একজন সামান্য বিধবার এই অবহেলা কেমন করে সহ্য করেন? তিনি মীরাকে মেরে ফেলতে চাইলেন। একদিন হরিচরণামৃত বলে একপাত্র বিষ মীরার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। মীরা পরমভক্তিতে সেই বিষ গলায় ঢেলে দিলেন। ভগবানের অসীম করুণায় ভক্তের হাতে হলাহল অমৃতে রূপান্তরিত হলো।

"তাহলেও এই ঘটনার পরে মীরার মন শ্বশুরগৃহের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠেছিল। রাজরাণী মীরা চিরকালের মতো রাজপ্রাসাদ ছেড়ে রাজপথে নেমে এলেন। কিন্তু তিনি কোথায় যাবেন?

"প্রথমে পিত্রালয়ে গেলেন। সেখানে পিতা স্বর্গবাসী, রায়মল্লও তখন মেড়তায় ছিলেন না। সুতরাং দুঃখিনী মীরার পিতৃগৃহে ঠাঁই হলো না। তিনি বৃন্দাবনের পথে রওনা হলেন।

"বৃন্দাবনের পথে মীরা বনাস নদীর তীরে কিছুকাল অতিবাহিত করেন। সেখানেই তাঁর সাধনা সফল হয়।

"মনের মন্দিরে ভক্তির অনির্বাণ দীপ জ্বালিয়ে মীরাবাঈ বৃন্দাবনে পৌঁছলেন। প্রেমধর্মের অন্তহীন যমুনায় স্নান করে তিনি পূর্ণত্ব লাভ করলেন।

"মধু-বৃন্দাবনের পথে পথে পরিক্রমা করে মীরা কৃষ্ণলীলাস্থল দর্শন শেষ করলেন। তারপরে তিনি আবার ফিরে এলেন বৃন্দাবনে। কৃষ্ণসেবা সাধুসঙ্গ ও ভজন রচনার ভেতর দিয়ে মীরার মধুময় জীবন মন্দাক্রান্ত তালে বয়ে চলল। অল্পদিনেই তিনি সারা ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধিকা ও ভজন রচয়িতার স্বীকৃতি পেলেন। আর সে স্বীকৃতি আজও অমলিন।

"শেষ জীবনে মীরা বৃন্দাবন থেকে দ্বারকায় চলে গেলেন।

"এদিকে মীরা চিতোর ত্যাগ করে আসার পরেই গুজরাটের বাহাদুর শাহ (১৫৩৪ খ্রীঃ) চিতোর ধ্বংস করেছিলেন। মেবারবাসীরা তখুনি বুঝতে পেরেছিলেন মহারাণী মীরাই ছিলেন চিতোরের রাজলক্ষ্মী। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও তাঁরা তখন মীরাকে খুঁজে পান নি।

"১৫৬৭ সালে আকবরের চিতোর অধিকারের পরে উদয়সিংহ উদয়পুরে মহানগরীর

রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন। সেখানেই তিনি সংবাদ পেলেন মীরাবাঈ কিছুদিন হলো দ্বারকায় গিয়েছেন। তাঁকে ফিরিয়ে আনতে জনৈক ব্রাহ্মণকে তিনি দ্বারকায় পাঠালেন। সেটি ১৫৬৯ সালের কথা।"

"আচ্ছা, ঘোষদা, মীরাবাঈ তো উদয় সিংহের বৌদি ছিলেন?"

শঙ্করীর আকস্মিক প্রশ্নে থামতে হয় আমাকে। বলি, "হ্যাঁ। তবে মীরার স্বামী ভোজ সিংহ উদয় সিংহের চেয়ে বয়সে অনেক বড় ছিলেন।"

শঙ্করী আর কোন কথা জিজ্ঞেস করে না। আমি আবার বলতে থাকি—"মীরাবাঈ ব্রাহ্মণের অনুরোধ শুনে কি করবেন, বুঝে উঠতে পারলেন না। জীবন দেবতার কাছ থেকে নির্দেশ দেবার জন্য তিনি রণছোড়জীর মন্দিরে প্রবেশ করে গাইতে থাকলেন—

'সাজর্ন সুধ জ্যোঁ জানে ত্যোঁ লীজে হো।
তুম বিন মেরে অওর ন কোঈ
কৃপা বাবরী কীজে হো।।...

'ভক্ত-গায়িকা তাঁর প্রাণের ঠাকুরকে বললেন—হে প্রিয়, তুমি যদি আমাকে সত্যই শুদ্ধ মনে করো, তাহলে আমাকে বুকে তুলে নাও। তুমি তো জানো প্রভু, তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। দয়া করে তুমি আমাকে নিজের করে নাও। আমার যে দিনে মুখে অন্ন রোচে না, রাতে চোখে ঘুম আসে না, পলে পলে প্রাণ যাচ্ছে। হে মীরার প্রভু গিরিধর নাগর, তুমি একবার আমার সঙ্গে মিলিত হও এবং তারপরে আর কখনই আমাকে তুমি ছেড়ে দিও না।

"রণছোড়জী তাঁর সাধিকার সে আবেদনে সাড়া দিয়েছিলেন। কারণ তারপরে আর কেউ কোনদিন মীরাবাঈকে মন্দির থেকে বেরিয়ে আসতে দেখেন নি। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যে মতো মীরাবাঈও তাঁর ভগবানের দেহে লীন হয়ে গেলেন। প্রেমময়ী মীরা প্রেমময়ী শ্রীকৃষ্ণের শাশ্বত প্রেমের মাঝে অনন্তকালের জন্য শাশ্বতী হয়ে রইলেন।"

মীরাবাঈয়ের মন্দির থেকে আমরা বিজয়স্তম্ভে এলাম। এটি চিতোরের সর্বশ্রেষ্ঠ স্মরণী—মহারাণা কুম্ভের অক্ষয় কীর্তি।

গোড়ায় চারিদিকে প্রায় দশ ফুট উঁচু বাঁধানো পাথরের চাতাল। রেলিং দিয়ে ঘেরা। কীর্তিস্তম্ভের মতো পরিত্যক্ত ও অবহেলিত নয়। ভেতরে সিঁড়ি আছে। হাতে সময় থাকলে অনায়াসে ওপর থেকে ঘুরে আসা যেতো। চিতোরের চেহারাটা ভাল করে দেখে আসতে পারতাম।

গাইড বলতে শুরু করেন, "আপনারা জানেন যে মহারাণা কুম্ভ একজন মহাবীর ছিলেন। তিনি মেবারকে এক শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন। মেবারে মোট ৮৪টি দুর্গ আছে, কুম্ভ একাই তার ৩২টি নির্মাণ করেছেন। এবং তাঁর নির্মিত কুম্ভমেরু মেবারের সর্বশ্রেষ্ঠ দুর্গ।

"রাণা কুম্ভ রণচর্চা এবং কাব্যচর্চায় সমান দক্ষ ছিলেন। তিনি শ্রীজয়দেবের গীতগোবিন্দ নিয়মিত পাঠ করতেন। এই অমর ভক্তিকাব্যের তিনি এক অপূর্ব পরিশিষ্ট রচনা করেছেন। এর থেকে আমরা তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাই।

"১৪৪০ খ্রীস্টাব্দে মহারাণা কুম্ভ মালবের সুলতান মোহম্মদ খিলজি ও গুজরাটের সুলতান কুতুব-উদ্-দিন. শাহের যৌথ আক্রমণ প্রতিহত করেন। সেই বিজয়ের স্মারক স্বরূপ নির্মাণ

করেন এই জয়স্তম্ভ। কেউ বলেন ১৪৪২ থেকে ১৪৪৯ খ্রীষ্টাব্দ এই আট বছর, আবার কেউ বা বলেন ১৪৫৮ থেকে ১৪৬৮ সাল, প্রায় এগারো বছর ধরে এটি নির্মিত।

"স্তম্ভটির গোড়া ৯ মিটার চওড়া। ১৪ মিটার চওড়া একটি বর্গ ক্ষেত্রাকার জগতী বা মঞ্চের ওপর এটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। স্তম্ভটি ৯ তলা এবং ৩৭ মিটার উঁচু। ওপরে উঠবার জন্য ভেতরে ১৫৭ খানি সিঁড়ি আছে। এর বৈশিষ্ট্য হলো গোড়া এবং মাথা চওড়া, মাঝখানটা সরু। আপনারা এখান থেকেই প্রতি তলায় চারিদিকে চারটি করে ছোট ছোট আচ্ছাদিত অলিন্দ দেখতে পাচ্ছেন। দেখছেন পদ্মফুল সহ সারা গায়ে অপরূপ কারুকার্য।"

আমরা মাথা নাড়ি। গাইড বলতে থাকেন, "ভেতরে গেলেও দেখতে পাবেন। ওপরে উঠবার সিঁড়ির চারিপাশে, দেওয়ালের অলঙ্করণও ভারি সুন্দর। সেখানে রয়েছে সুপরিচিত হিন্দু দেব-দেবীদের মূর্তি, বিভিন্ন ঋতুর বর্ণনা এবং কিছু অস্ত্র-শস্ত্র ও বাদ্যযন্ত্রের খোদাই করা নকশা। আশ্চর্য-সুন্দর তাঁদের স্থাপত্যকলা এবং অদ্ভুত তাদের উজ্জ্বলতা। প্রত্যেকটির তলায় নাম অথবা বিষয়-বস্তু লেখা রয়েছে। তিনতলায় এবং আটতলায় আরবীতে 'আল্লাহ' শব্দটি খোদাই করা আছে। ওপরতলায় একখানি পাথরে প্রথম হামীর থেকে কুম্ভ পর্যন্ত মেবারের সমস্ত রাণাদের নাম খোদাই করা রয়েছে। প্রতিটি মূর্তি এবং অলঙ্করণ নিখুঁত এবং মূল-নকশার সঙ্গে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

"কর্নেল টডের মতে এই স্তম্ভটিকে ভারতে একমাত্র কুতব-মিনারের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। তবে এর চেয়ে উঁচু হলেও কুতব-মিনারের স্থাপত্য কলা অনেক নিম্নমানের। ফার্গুসান এই স্তম্ভটির নির্মাণ কৌশল ও সৌন্দর্যকে রোমের ট্র্যাজানের (Trajan) চেয়ে উন্নততর রুচির পরিচায়ক বলে বর্ণনা করেছেন।" আর কথাটা যে মিথ্যে নয় আমি নিজেও তা পরখ করে এসেছি।

মহারাণা কুম্ভের কথা ভাবতে ভাবতে বিজয়স্তম্ভ থেকে টাঙ্গায় ফিরে চলেছি। গাইড বলেছেন সেই মহাবীরের কথা। বলেছেন—রাণা কুম্ভ বাপ্পা রাজবংশের উনচল্লিশতম রাজা। তাঁর বাবার নাম মোকলজী। তাঁর মা মাড়বাররাজের বোন। পিতার মৃত্যুর পরে মামার সহায়তায় তিনি ১৪৩৮ খ্রীস্টাব্দে চিতোরের (পৈতৃক) সিংহাসনে বসেন। তাঁর সুশাসনে মেবারের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকল। তিনি মেবারকে এক শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন।

১৪৪০ খ্রীস্টাব্দে মালব ও গুজরাটের সুলতানরা ঈর্ষান্বিত হয়ে চিতোর আক্রমণ করলেন। রাণা এক লক্ষ পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য এবং চোদ্দশ' হাতী নিয়ে আক্রমণকারীদের সম্মুখীন হলেন। শত্রুপক্ষ পরাজিত হলো। তাঁর সৈন্যরা মালবরাজ মোহম্মদ খিলজীকে বন্দী করে নিয়ে এলেন। কিন্তু কুম্ভ তাঁকে মুক্ত করে দেশে পাঠিয়ে দিলেন। যাবার সময় তাঁকে প্রচুর উপহার দিলেন। কুম্ভের এই উদারতার কথা আবুল ফজল তাঁর গ্রন্থে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন।

আমরা আসার পথে হনুমান পোলের যে কবাটজোড়া দেখে এলাম, সে জোড়া নাকি কুম্ভ নিকটবর্তী নাগররাজ্য জয়ের স্মারক স্বরূপ চিতোর নিয়ে এসেছিলেন।

মাড়বাররাজের সহায়তায় তিনি সিংহাসনে বসলেও, মামার মৃত্যুর পরে মালবের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খারাপ হয়ে ওঠে। এই মনোমালিন্যের কারণ ঝালবার সর্দারের জনৈকা সুন্দরী কন্যা। এই মেয়েটির সঙ্গে তৎকালীন মাড়বাররাজের বিয়ে হয়েছিল। কিন্তু মেয়েটির সৌন্দর্যের খ্যাতি

শুনে কুম্ভ তাঁকে জোর করে চিতোর নিয়ে এসে বিয়ে করলেন। মাড়বাররাজ মনে মনে কুম্ভের ওপরে অসন্তুষ্ট হলেও, তিনি প্রকাশ্যে তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করতে সাহসী হন নি।

কুম্ভ পঞ্চাশ বছর চিতোরে রাজত্ব করেছেন। দুর্ভাগ্যের কথা চিতোরের এই পুরুষসিংহ তাঁর এক পাষণ্ডপুত্র উদার হাতে নিহত হন।

বিজয়স্তম্ভ থেকে আমরা গোমুখকুণ্ডে এলাম। এখানেও গোমুখী! পুলকিত হয়ে উঠি। গোমুখী থেকেই যে শুরু হয়েছে আমার লেখক-জীবন। কিন্তু সেকথা বলা যাবে না কাউকে। সহযাত্রীরা কেউ আমার প্রকৃত পরিচয় জানেন না। কুণ্ডু স্পেশালের কর্ণধার ফকিরবাবু আমার আনুরোধ রেখেছেন—ম্যানেজার থেকে সহযাত্রী পর্যন্ত কারও কাছে তিনি আমার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করেন নি।

কুণ্ডটি পথ থেকে অনেকটা নিচুতে। আমরা সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসি নিচে—ছোট কুণ্ডটির কাছে। কুণ্ডের ওপারে উঁচু পাহাড়। খাড়া ওপরে উঠে গিয়েছে। তারই ভেতর থেকে একটি স্বচ্ছ ও শীতল জলধারা এসে কুণ্ডে পড়ছে। পড়ছে একটি পাথরের গরুর মুখের মধ্যে দিয়ে। গাইড বলেন—এখানে নাকি সারা বছর এমনি জল পড়ে। প্রতিবার অবরোধের [illegible] র্গ রক্ষায় এই কুণ্ড প্রভূত সাহায্য করেছে।

কুণ্ডের উত্তরদিকে একটি জৈনমন্দির—তেইশ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত।

মন্দিরে রয়েছে একটি সুড়ঙ্গ। গাইড বলেন, "এটি মহারাণা কুম্ভের প্রাসাদে যাবার সংক্ষিপ্ত পথ। সেখানে রাজবাড়ির মেয়েরা এই পথে কুণ্ডে স্নান করতে আসতেন।"

"যাবেন নাকি একবার?" অমিয়বাবু জিজ্ঞেস করেন আমাকে।

প্রশ্নটা তিনি বাংলায় করেছেন। কাজেই গাইড ঠিক বুঝতে পারেন না। তিনি হিন্দীতে জিজ্ঞেস করেন, "কিছু বললেন স্যার?"

"হ্যাঁ।" অমিয়বাবু উত্তর দেন, "হামলোক ইয়ে সুড়ঙ্গসে জানে সাক্‌তা?"

"নহী?"

"কাহে?"

"বহুকাল চলাচল না করায় সুড়ঙ্গের ভেতরে সাপ-খোপের আড্ডা হয়েছে। তাছাড়া কুম্ভের প্রাসাদও ভেঙে গিয়েছে।" গাইড বুঝিয়ে দেন ব্যাপারটা।

"আমরা সে প্রাসাদ দেখতে যাবো না?"

"হ্যাঁ।"

"কখন?"

"কিছুক্ষণ বাদে।"

"গোমুখীকুণ্ডের মতো চিতোরে আর কোন কুণ্ড আছে কি?" এবারে সরকারদা জিজ্ঞেস করেন।

গাইড উত্তর দেন, "জী। হাতিকুণ্ড আর কাতন-বাওরী।"

"কোথায়?"

"খানিকটা দূরে।"

"আমরা সে দুটি দেখব না?" বৌদি বলেন।

"না।" গাইড জবাব দেন, "সে দুটি খুবই সাধারণ। শুধু আপনাদের সময় নষ্ট হবে।"

টাঙ্গা আবার চলেছে এগিয়ে। আমার দেখা-দেখি আজ অনেকেই গাইড বুক কিনে ফেলেছেন। তবে তার সবচেয়ে সদ্ব্যবহার করছেন উকিলবাবু। গাইডকে তিনি নিজের টাঙ্গায় নিয়েছেন। বই দেখে দেখে দেখে বারবার বেচারীকে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করে তুলছেন।

আর মুশকিল হয়েছে ঠাকুরমাদের নিয়ে। তাঁরা আমাকে ডায়েরি লিখতে দেখলেই পাশে এসে দাঁড়ান। নীরবে আমার খাতার দিকে তাকিয়ে থাকেন কিছুক্ষণ তারপরে হঠাৎ বলে ওঠেন, "ভাল কইরা লেইখ্যা লও। যা ল্যাখতে আছো, আমাগো কিন্তু লেইখ্যা দিতে হইব হেয়া আগেই কইয়া রাখলাম।"

এখন মাথা নেড়ে কোনমতে নিষ্কৃতি পাচ্ছি বটে কিন্তু যাত্রা শেষ হবার সময় কি বিপদে পড়তে হবে, তা অনুমান করে উঠতে পারছি না।

গোমুখীকুণ্ড থেকে রওনা হয়ে মিনিট দশেক বাদে সমীধেশ্বর মহাদেব মন্দিরের সামনে এসে টাঙ্গা থেকে নেমে পড়ি। বেলা বারোটা বেজে বিশ মিনিট হয়েছে।

পথের ধারে মন্দির। বেশ সুন্দর, অনেকটা খাজুরাহো মন্দিরের মতো। ভেতরে আসি।

মালবরাজ ভোজ প্রথম এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। পরে রাণা মোকল ১৪২৮ খ্রীস্টাব্দে এই মন্দিরের প্রভূত সংস্কার সাধন করেন। মন্দিরের প্রত্যেকটি দেওয়াল কারুকার্যখচিত— ভারতীয় স্থাপত্যকলার অপরূপ নিদর্শন।

গাইড বলেন, "এই তিনখানি শিলালিপি দেখছেন, তার মধ্যে এইখানি হচ্ছে সবচেয়ে পুরানো!"

আমরা শিলালিপিখানি দেখি। কিন্তু কেউ কোন প্রশ্ন করতে পারার আগেই উকিলবাবু সওয়াল শুরু করেন, "কবেকার এই শিলালিপি?"

"জী, ১১৫০ খ্রীস্টাব্দের।" গাইড সবিনয়ে উত্তর দেন।

উকিলবাবু আবার প্রশ্ন করেন, "কার কথা লেখা রয়েছে এতে?"

"মহারাজা কর্ণপালের।"

"তিনি কে?"

"গুজরাটের চালুক্য রাজা। কথিত আছে আজমীররাজ অর্ণোরাজের সঙ্গে যুদ্ধে জিতে তিনি চিতোরগড় দর্শনে আসেন। তখুনি এই শিলালিপিটি স্থাপন করেন।"

আর সময় নষ্ট না করে গাইডকে ছাড়াই গর্ভ-মন্দিরে আসি। ত্রিমুখী মূর্তি—ভারি সুন্দর। সশ্রদ্ধ চিত্তে প্রণাম করি।

টাঙ্গার শোভাযাত্রা চলেছে এগিয়ে। মেয়েটার কথা মনে পড়ছে আমার—শ্রীর কথা। সে যে টাঙ্গা চড়তে বড়ই ভালোবাসে। অথচ আজ সে আসতে পারে নি চিতোরে। আর এই না আসতে পারার জন্য সম্পূর্ণ দায়ী আমি। মা-সাবিত্রী, কেন তুমি অকারণে শাস্তি দিচ্ছ আমাকে? তুমি শ্রীকে তাড়াতাড়ি ভাল করে দাও মা!

"ডানদিকের ঐ বড় বাড়িটা কি কোন মন্দির?"

বৌদির প্রশ্নে বাস্তবে ফিরে আসি। পথের পাশে, অনেকটা উঁচুতে, বেশ বড় একটি মন্দির।

"জী।" গাইড বৌদির প্রশ্নের উত্তর দেন, "চিতোরেশ্বরী, তার মানে কালী মন্দির।"

কয়েক মিনিট বাদেই কালীবাড়ির সামনে টাঙ্গা থামে। পথ থেকে বত্রিশ ধাপ সিঁড়ি ভেঙে আমরা মন্দির-তোরণে উঠে আসি।

তোরণ পেরিয়ে পাথর বাঁধানো অঙ্গন। আঙ্গিনার ঠিক মাঝখানে একটি বটগাছ। তার শীতল ছায়ায় সারা মন্দিরটি স্নিগ্ধ হয়ে আছে।

আমরা নাট-মন্দিরে উঠে এলাম। কারুকার্যখচিত লাল পাথরের চৌকো স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ছাদটি। তিনটি ঘণ্টা ঝুলছে। আমার সহযাত্রীরা সেগুলির সদ্ব্যবহারে লেগে যান।

গাইডকে ঘিরে দাঁড়াই। তিনি বলতে থাকেন, "পণ্ডিতরা অনুমান করেন, প্রথমে এ মন্দিরটি সূর্যমন্দির ছিল, পরে কালীমন্দির হয়েছে। এটি চিতোরের প্রাচীনতম মন্দির, সম্ভবত খ্রীস্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে নির্মিত।"

"অষ্টম শতাব্দী! তার মানে বারোশ' বছরের পুরনো মন্দির?" সবিস্ময়ে দাদা প্রশ্ন করেন।

"জী।" গাইড উত্তর দেন। "অবশ্য তখন এটি সূর্যমন্দির ছিল।"

"কালীমন্দির কবে হয়েছে? "শঙ্করী জিজ্ঞেস করে।

"আকবরের আক্রমণের পরে।"

"তার মানে শ'চারেক বছর আগে?"

"জী।" একবার থামেন গাইড। তারপরে আবার বলেন, "তবে এ মন্দিরের মেঝে, উঠোন এমনকি এই স্তম্ভগুলি পর্যন্ত, সবই রাণাযুগের আগে তৈরি। রাণারা শুধু মাঝে মাঝে মন্দিরটির সংস্কার করেছেন।

"মুসলমান হানাদাররা অন্ততপক্ষে তিনবার এই মন্দিরের ওপরে আঘাত হেনেছে, তবু আপনারা মন্দিরগাত্রে এবং প্রদক্ষিণপথের দু'পাশে কিছু অশ্চর্য সুন্দর খোদাই কাজ দেখতে পাবেন। নবরাত্রির সময় অর্থাৎ এপ্রিল-মে মাসে এখানে বিরাট মেলা বসে। হাজার দশেক লোকের সমাগম হয়।"

গাইডের বক্তব্য শেষ হলে আমরা গর্ভ-মন্দিরের সামনে আসি। শুধু স্তম্ভ কিংবা দেওয়ালে নয়, কাঠের দরজার ওপরেও ভারি সুন্দর খোদাই কাজ।

গর্ভ-মন্দিরে দুটি বিগ্রহ—শ্বেতপাথরের অম্বিকা ও কষ্টিপাথরের কালী—চিতোরেশ্বরী। আমি সশ্রদ্ধ অন্তরে প্রণাম করি। প্রার্থনা করি—মা, তুমি আমার শ্রীকে তাড়াতাড়ি ভাল করে তোলো আর মানসীকে শান্তিদান করো।

প্রণাম ও পূজা শেষে সহযাত্রীরা অনেকেই নাট-মন্দিরের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন—চিতোরগড়কে দেখছেন। এখান থেকে যে চারিদিকের দৃশ্য বড় সুন্দর।

আমিও তাঁদের পাশে আসি। কিন্তু না, আমি চিতোরের দৃশ্য উপভোগ করতে পারি না, আমি ভেবে চলি চিতোরেশ্বরীর কথা। ভাবি—করালবদনা লোলরসনা মুণ্ডমালা শোভিতা মহাকালীর সেই অন্তহীন ক্ষুধার কথা—

কুলবধূ পদ্মিনীকে কেড়ে নিয়ে যাবার জন্য দিল্লীর বিগত-যৌবন সুলতান আলা-উদ্-দিন চিতোর আক্রমণ করেছেন। মেবারের প্রায় সমস্ত বড় বীরই মুক্তিযুদ্ধে প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। মহারাণা লক্ষ্মণ সিংহ বুঝতে পারছেন, চিতোরকে রক্ষা করা সম্ভব হবে না। তবু নারীর ইজ্জত ও মাতৃভূমির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য তিনি চিতোরেশ্বরীকে শেষ রক্তবিন্দু অঞ্জলি দিতে বদ্ধপরিকর।

এই সময় একদিন তিনি যখন রাজশয্যায় নিদ্রাহীন রাত্রি অতিবাহিত করছেন, তখন সহসা তাঁর কানে এক ভয়ানক কণ্ঠস্বর ভেসে এলো—ম্যাঁয় ভুখা হুঁ।

চমকে উঠলেন মহারাণা। এ কার কণ্ঠস্বর? কে ক্ষুধার্ত? চিতোরেশ্বরী!

কণ্ঠস্বর আবার হেঁকে ওঠে—আমি ক্ষুধার্ত। ম্যাঁয় ভুখা হুঁ...।

—এত রক্তপান করেও কি তোর খিদে মেটে নি মা? রাণা লক্ষ্মণ সিংহ কেঁদে ফেলেন।

—না। দৈববাণী হয়—তোর বারোটি ছেলেকে না খাওয়া পর্যন্ত আমার খিদে মিটবে না।

পরদিন লক্ষ্মণ সিংহ রাজসভায় এসে সামন্তদের সব কথা বললেন। তাঁরা হেসে উঠলেন। বললেন—এ আপনার মনের ভুল মহারাণা। যুদ্ধের ভাবনায় অস্থির আপনার মন। তাই আপনি অর্থহীন স্বপ্ন দেখেছেন।

কিন্তু সেদিন রাতেও রাণা একই কণ্ঠস্বর শুনলেন। কণ্ঠস্বর তাঁকে বললো—এক-এক করে তোর প্রত্যেক পুত্রকে তিনদিনের জন্য সিংহাসনে বসতে হবে। চতুর্থদিন সকালে যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে তারা প্রাণ দেবে। এই ভাবে তোর বারোটি ছেলের রক্তপান করলে আমার রক্ততৃষ্ণা মিটবে—চিতোর রক্ষা পাবে।

চিতোরেশ্বরীর নির্দেশমতো মহারাণার প্রথম পুত্র অরি সিংহ প্রাণ বিসর্জন দিলেন। দ্বিতীয় পুত্র অজয় সিংহের পালা এলো। লক্ষ্মণ সিংহ অজয়কে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। তিনি তাঁকে গিহ্লোট বংশের ভাবী রক্ষক নির্বাচিত করলেন। অজয়ের বদলে তৃতীয় পুত্রকে যুদ্ধে পাঠালেন।

এইভাবে একে একে অজয় সিংহের দশ ভাই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। অরি সিংহের মতো তাঁরাও পিতার আদেশে আলা-উদ্-দিনের রোষানলে আত্মাহুতি দিতে পিতৃভক্তির এক নতুন নজির স্থাপন করলেন। কিন্তু তাঁদের কথা ও কাহিনী নিয়ে কোন নতুন রামায়ণ লেখা হলো না আজও।

শুধু তাই নয়, তাঁদের প্রাণদানের পরেও চিতোরেশ্বরীর খিদে মিটল না। আলা-উদ্-দিন চিতোর অধিকার করলেন।

কিন্তু চিতোরেশ্বরী নারীমাংসলোলুপ সুলতানের কামনাকেও পূর্ণ করতে দেন নি : ততক্ষণে রূপসী পদ্মিনীর ফুলের মতো সুন্দর শরীরটি অঙ্গারে পরিণত। তিনি মরদেহ ত্যাগ করে অমরলোকে মহাপ্রস্থান করেছেন—দেহাতীত প্রেমের দিব্যজ্যোতিতে ভাস্বর হয়ে উঠেছেন, তাঁর সতীত্ব স্বর্গের সম্পদ হয়ে উঠেছে।

।। এগারো ।।

পথ ফুরিয়ে গেল। টাঙ্গা থেকে নেমে পড়তে হলো।

ঝোপঝাড় ও কাঁটাগাছের পাশে দিয়ে একটি পাথুরে পায়ে-চলা পথ, আমরা গাইডকে অনুসরণ করছি। পদ্মিনীর প্রাণের চিতোরের দুপবস্থা দেখে মনটা ভারী হয়ে উঠছে। গোরা ও বাদলের চিতোর, কুম্ভ ও সংগ্রামের চিতোর জয়মল ও পাট্টার চিতোরের প্রতি কি আশ্চর্য উদাসীনতা আমাদের। প্রাচীন কীর্তির সংস্কার সাধন তো দূরের কথা, পর্যটকদের যাতায়াতের পথটুকু পরিষ্কার পর্যন্ত করা হচ্ছে না।

সরকারদার প্রশ্নের উত্তর গাইড জানালেন, "আমরা এখন মহাসতী পদ্মিনীর প্রাসাদে

চলেছি।"

আবার সেই ভাবনাটা পেয়ে বসে আমাকে। পদ্মিনী সম্পর্কে আধুনিক ঐতিহাসিকদের ভাবনা। শ্রদ্ধেয় কালিকারঞ্জন কানুনগো তাঁর 'রাজস্থান কাহিনী' বইতে এ সম্পর্কে বলেছেন—

'মহামতি টড সাহেব উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে (১৮২৯খ্রীঃ) রাজস্থানের ইতিহাস উদ্ধার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, তখন রাজপুতনার ইতিহাস অজ্ঞানতা অন্ধকারে আচ্ছন্ন।...টড সাহেব আঁধারে হাতড়াইয়া যাহা কিছু পাইয়াছেন কুড়াইয়া সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি নিজ হইতে মনগড়া কিছু লিখেন নাই ; কিন্তু ভাট ও কবিদের মনগড়া কথায় তাঁহার ইতিহাস ভর্তি করিয়াছেন।...

'মহামহোপাধ্যায় গৌরীশঙ্কর হীরাচাঁদ ওঝা মহাশয় চল্লিশ বৎসর অক্লান্ত পরিশ্রমে...হিন্দীতে "রাজপুতানেকা ইতিহাস" লিখিয়া মহামতি টডকে উৎসর্গ করিয়াছে।...

'টডের রাজস্থানের ভুল সংশোধন এবং নতুন আলোকপাত করিয়া এই শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত যেমন গবেষণা চলিয়াছে, ভবিষ্যতে সেরূপ গৌরীশঙ্করজীর ইতিহাসকে আধার করিয়া ঐতিহাসিক অনুসন্ধান চলিবে।...

'পদ্মিনী উপাখ্যানের উৎপত্তিস্থল মেবারভূমি নয়, অযোধ্যা প্রদেশ—যেখানে কবি মালিক মহম্মদ জ্যায়সী এই কাব্য (পদ্মাবত) রচনা করেন।...

'মধ্যপ্রদেশের রতন সেন নামে কোন রাজার পদ্মিনী-স্ত্রী বিষয়ক কোন কাহিনী অযোধ্যায় প্রচলিত ছিলা মুসলমান কবি উহাকে মুসলমান ইতিহাসের এক পরিচ্ছেদের কাঠামো নূতন ভাবে গড়িয়া তুলিয়াছেন।...

"...পদ্মবত" "তারিখ-ই-ফিরিশতা" এবং টডের রাজস্থানের বর্ণনার যদি কোন মূল থাকে তবে তারা এটুকু—আলাউদ্দীন ছয় মাস অবরোধের পর চিতোর দুর্গ দখল করেন। চিতোরের রাজা লক্ষ্মণ সিংহ রতন সিংহ প্রভৃতি অনেক সামন্তের সহিত এ যুদ্ধে মারা যান।...রাণী পদ্মিনী বহু স্ত্রীগণের সহিত অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করেন। এই প্রকারে চিতোর দুর্গে অল্পদিনের জন্য মুসলমান অধিকার স্থাপিত হয়—বাকী সমস্ত কথা বহুধা কল্পনামুলক।'

অতীতের ভাবনা হারিয়ে যায়, ফিরে আসি বর্তমানে। আমরা পদ্মিনীর প্রাসাদে প্রবেশ করছি।

তোরণটি টিকে আছে কোনমতে আর সেই তোরণ থেকেই শুরু হলো শুরকির পথ। ডানদিকে পদ্মিনীর স্বামী রতন সিংহের প্রধান প্রাসাদটির চিহ্নমাত্র অবশিষ্ট নেই। থাকা সম্ভবও নয়। চিতোর জয় করেও পদ্মিনীকে না পাবার পরে, নিশ্চয়ই আলা-উদ্-দিনের সমস্ত রাগ গিয়ে পড়েছিল ঐ প্রাসাদের ওপর। শুনেছি এই ভগ্নস্তূপের পাশেই জয়মল এবং পাট্টার বাড়ি ছিল। সেটিও আজ প্রায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত।

খানিকটা এগিয়ে বাঁদিকে একটি ছোট দোতলা বাড়ি। এটিই পদ্মিনীর প্রাসাদ বলে পরিচিত। গাইড বলছেন—জল-মহল। এই বাড়িতে বসেই আলা-উদ্-দিন আয়নায় পদ্মিনীকে দেখেছিলেন। আর তাই হয়তো তিনি এ বাড়িটি ভেঙে ফেলতে পারেননি। নিষ্ঠুর হলেও ব্যর্থ-প্রেমিক তো বটেই।

দোতালায় উঠে আসি। আসি সেই ঘরে, সেই আয়নাখানির সামনে—ঠিক যেখানে বসে

আলা-উদ্-দিন পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব দেখেছিলেন।

"বাড়ির পাশে সেই জলাশয়। ওপারে বাঁধানো ঘাট। কেউ ঐ ঘাটে বসলে তার প্রতিবিম্ব পড়ে এই আয়নায়। স্বামীর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করার জন্য পদ্মিনীও সেদিন ঐ ঘাটে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। আলা-উদ্-দিন এই ঘরে বসে তার ছায়া দেখেছিলেন। আর তারপরেই কায়াকে পাবার প্রবল আগ্রহ দেখা দিয়েছিল তাঁর মনে।"

গাইড সহযাত্রীদের কাছে কর্নেল টড বর্ণিত সেই কাহিনী বলছেন। আধুনিক ঐতিহাসিকরা যা-ই বলুন না কেন, টডের 'এনালস্ অ্যান্ড এন্টিকুইটিস অব্ রাজস্থান'-এর জনপ্রিয়তা কোনদিন কমবে না। অমিও তাই গাইডের পাশে এসে দাঁড়াই। শুনতে থাকি সেই অপূর্ব আত্মত্যাগের ইতিহাস—

"শ্রীজয়সিংহের নাবালক লক্ষ্মণ সিংহ চিতোরের রাণা হলেন। নাবালক ভাইপোর অভিভাবক রূপে কাকা ভীম সিংহ (আধুনিক মতে রতন সিংহ) রাজ্য শাসন করতে থাকেন। ভীম সিংহের স্ত্রী পদ্মিনী ছিলেন অসাধারণ রূপসী তাঁর রূপের কথা শুনে দিল্লীর দুশ্চরিত্র সুলতান আলা-উদ্-দিন খিলজীর রূপ-লালসা লকলক করে উঠল।

পদ্মিনীকে পাবার আশায় তিনি চিতোর আক্রমণ করলেন। কিন্তু বহু চেষ্টার পরেও চিতোর জয় করতে পারলেন না। তখন তিনি ভীম সিংহের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন—একবার আপনার স্ত্রীকে দেখেতে পেলেই, আমি দিল্লী ফিরে যাবো।

বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে পদ্মিনী ভীম সিংহকে এই প্রস্তাবে সম্মত হবার পরামর্শ দিলেন। ভীম সিংহ তখন আলা-উদ্-দিনকে জানালেন—যদি আয়নায় আমার স্ত্রীকে দেখলে আপনার আশা মেটে, তবে সে ব্যবস্থা করতে পারি।

কামুক সুলতান সম্মত হলেন। সামান্য কয়েকজন দেহরক্ষী নিয়ে আলা-উদ্-দিন অগণিত রাজপুত সৈন্য পরিবেষ্টিত চিতোর দুর্গে এলেন। তিনি জানতেন, রাজপুতরা অতিথিকে কখনও আঘাত করে না।

ভীম সিংহ আলা-উদ্-দিনকে এই প্রাসাদে নিয়ে এলেন। এই কক্ষে বসে, ঐ আয়নার তিনি পদ্মিনীর প্রতিবিম্ব দেখলেন। কিন্তু সেই অপরূপাকে দেখবার পরে তার কামনাবহ্নি প্রশমিত হওয়া তো দূরের কথা, আরও বহুগুণ বর্ধিত হলো। ধূর্ত সুলতান মুখে অবশ্য পরম সন্তোষের ভাব ফুটিয়ে তুললেন।

সরল ভীম সিংহ স্বাভাবিক সৌজন্যবোধ থেকে সুলতানকে দুর্গের পাদদেশে তাঁর শিবিরে পৌঁছে দিতে গিয়েছিলেন। আর বিশ্বাসঘাতক আলা-উদ্-দিন সেখানেই তাঁকে বন্দী করলেন। প্রতারক সুলতানের আদেশে ফরমান জারি করা হলো—একমাত্র পদ্মিনীর পরিবর্তেই ভীম সিংহকে মুক্তি দেওয়া হবে। খবরটা যথাসময়ে পদ্মিনীর কাছে পৌঁছল। তিনি শুধু রূপসী ছিলেন না ছিলেন অসাধারণ বুদ্ধিমতী। তিনি আলা-উদ্-দিনের শর্ত মেনে নিতে রাজি হলেন। তাঁর কাছে খবর পাঠালেন—আমি উপযুক্ত মর্যাদার সঙ্গে আপনার অন্দর-মহলে যেতে রাজি আছি। তবে তার আগে আমি আমার স্বামীর সঙ্গে শেষবারের মতো কিছুক্ষণ নিভৃতে কথা বলতে চাই। আমার সঙ্গে কয়েকজন সহচরী ও পরিচারিকা দিল্লী যাবে। এবং চিতোরের মেয়েরা চিরবিদায় জানাবার জন্য সাতশ' শিবিকায় করে আমাকে আপনার শিবির পর্যন্ত এগিয়ে দিয়ে আসবে। তাঁদের নিরাপত্তার নিমিত্ত পত্রপাঠ আপনাকে চিতোরের অবরোধ

তুলে নিতে হবে।

আহ্লাদে আটখানা আলা-উদ্-দিন সে প্রস্তাবে সম্মত হলেন। তিনি চিতোরের অবরোধ তুলে নিলেন। পদ্মিনীর সঙ্গে সাতশ' দোর-দেওয়া শিবিকা সুলতানের শিবিরে এলো।

আলা উদ্-দিনের অনুমতি নিয়ে পদ্মিনী ভীম সিংহের সঙ্গে শেষ দেখা করতে গেলেন। একটু বাদেই শিবিকার শোভাযাত্রা ফিরে চলল দুর্গের দিকে। সুলতান ভাবলেন, রাজপুত মেয়েরা পদ্মিনীকে পৌঁছে দিয়ে চিতোরগড়ে ফিরে যাচ্ছেন।

আধঘণ্টা অতিবাহিত হবার পরেও পদ্মিনী ফিরে আসছে না দেখে আলা-উদ্-দিন ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তবু তিনি আরও কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন। কিন্তু একসময় তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। তিনি ছুটে গেলেন ভীম সিংহের তাঁবুতে। দেখলেন তাঁর প্রাণের পদ্মিনী সেখানে নেই। সেই সঙ্গে ভীম সিংহও উধাও হয়েছেন।

রাগে ফেটে পড়লেন সুলতান। আদেশ দিলেন—যেমন করে পারো ধরে আনো ওদের।

কিন্তু সম্রাটের সেই গ্রেপ্তারী বাহিনীকে বেশিদূর এগোতে হলো না। রাজপুত রমণীদের পরিবর্তে প্রতি শিবিকা থেকে ছ'জন করে সশস্ত্র রাজপুত যোদ্ধা বেরিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল তাঁদের ওপরে। আর সেই অবসরে পদ্মিনী ভীম সিংহকে নিয়ে নিরাপদে ফিরে এলেন এই প্রাসাদে।

ভীম সিংহের প্রাণরক্ষার জন্য সেদিন বহু রাজপুত বীরকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। কিন্তু আলা-উদ্-দিনের ক্ষতি হয়েছিল অনেক বেশি। সে ক্ষতির পরে সেবারে আর চিতোর জয় করা সম্ভব হলো না তাঁর পক্ষে। তিনি দিল্লী ফিরে গেলেন।

পরের বারে তিনি চিতোর জয় করেছিলেন সত্য। কিন্তু এই যুদ্ধে জীবন তুচ্ছ করে গোরা এবং বারো বছরের বাদল যে বীরত্ব দেখিয়েছিল, তা আজও ইতিহাসে অক্ষয় হয়ে আছে।

আমাদের টাঙ্গার শোভাযাত্রা ফিরে চলেছে রামপোলের দিকে। যাবার পথে আমরা কুম্ভ-শ্যাম, শিঙ্গারচৌরী, সাত-বিশ, দেওরা ও যন্ত শঙ্কর শিব মন্দির এবং রাণা কুম্ভের প্রাসাদ দেখব।

শঙ্করীর পরামর্শে দাদা এবারে গাইডকে আমাদের টাঙ্গায় এনে তুলেছেন। উকিলবাবু মনে মনে একটু অসন্তুষ্ট হলেও প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারেন নি।

বৌদি ও শঙ্করী গাইডের কাছ থেকে দর্শনীয় মন্দির সমূহের বিশদ বিবরণ সংগ্রহ করছে। গাইড বলছেন—"কুম্ভ-শ্যাম মন্দিরটি জয়স্তম্ভের উত্তরদিকে অবস্থিত। রাণা কুম্ভ ১৪৪৮ খ্রীস্টাব্দে এটি নির্মাণ করেন। মন্দিরটি বরাহ ভগবানের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। মন্দিরের সামনে একটি ভারি সুন্দর গরুড় মূর্তি দেখতে পাবেন।"

"আচ্ছা, মোকলজী মন্দিরটি কি রাণা কুম্ভ তাঁর পিতার স্মৃতি রক্ষার জন্য তৈরি করেছেন?" গাইড থামতেই সরকারদা প্রসঙ্গ পরিবর্তন করেন।

"অনেকে তাই বলেন।" গাইড উত্তর দেন। "আবার অনেকে বলেন, রাণা কুম্ভের পিতা মোকলজী নিজেই নির্মাণ করেছেন।"

"তেমন বড় মন্দির তো নয়?" শঙ্করী বলে।

"না। আকারে তেমন বড় নয়—পুব-পশ্চিমে ২২ মিটারের মতো লম্বা আর উত্তর দক্ষিণে ১৮ মিটার চওড়া। তবে ভারি সুন্দর মন্দির। উত্তর দক্ষিণ ও পশ্চিমে তিনটি দরদালান ও প্রবেশদ্বার। পশ্চিমেরটি প্রধান তোরণ। মন্দিরের মাঝখানে একটি চতুষ্কোণ কক্ষ। ওপরে খিলান করা গোল ছাদ। ক্রমে সরু হয়ে চূড়ায় পরিণত। প্রধান কক্ষটির পাশেই গর্ভ-মন্দির।

"মন্দিরের সর্বত্র প্রস্তরখোদিত মূর্তি। কোথাও বাজনদারের দল—ঢোল করতাল বাঁশী ও নাগড়া বাজাচ্ছে। কোথাও বিচারক বিচার করছেন, কোথাও বা কোন যোদ্ধা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ঘরে ফিরেছেন—শিশু সন্তানকে কোলে নিয়ে স্ত্রী তাঁকে অভ্যর্থনা করছেন।"

"আচ্ছা, শিঙ্গারচৌরী কি জৈন-মন্দির?"

"জী!" গাইড দাদার প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলতে থাকেন, "ছোট হলেও স্থাপত্যকলায় সমৃদ্ধ মন্দির। ষোড়শ জৈন তীর্থঙ্কর শান্তিনাথের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। এই মন্দিরের বৈশিষ্ট্য, এর গর্ভ-মন্দিরটি মাঝখানে। তার চারিদিকে চারটি দরদালান আর উত্তর ও দক্ষিণে দুটি তোরণ।"

"কে নির্মাণ করেছেন?" শঙ্করী জিজ্ঞেস করে।

"মন্দিরের একটি শিলালিপি থেকে জানা যায় যে রাণা কুম্ভের কোষাধ্যক্ষের ছেলে ভেলকা ১৪৪৮ খ্রীস্টাব্দে এই মন্দিরটি নির্মাণ করেন। মন্দিরের বাইরেব দেওয়ালে খোদিত দেব-দেবী, পশু-পক্ষী এবং কয়েকজন নৃত্যরতা নর্তকীর মূর্তি দেখবার মতো।"

"সাত-বিশ ব্যাপারটা কি বলুন তো?" গাইড থামতেই সরকারদা প্রশ্ন ছাড়েন।

গাইড হেসে বলেন, "সাতাইস, I mean twenty plus seven i.e. twenty seven. একই এলাকার ভেতরে স্থাপত্যকলায় সুসমৃদ্ধ সাতাশটি মন্দির রয়েছে।"

"এবারে যন্তশঙ্কর শিবমন্দিরের কথা বলুন।" শঙ্করী ফরমাস করে।

গাইড বলতে থাকেন, "এটিও অপরূপ খোদাই কাজ করা একটি মন্দির। এর সিলিং এবং দেওয়ালগুলি দেখে আপনাদের খুবই ভাল লাগবে।"

"ঠিক কথা বনবীরের তৈরি সেই পাঁচিলটা তো দেখতে পেলাম না।" এবারে আমি জিজ্ঞেস করি।

একটু হেসে গাইড বলেন, "যাবার সময় দেখেছেন, খেয়াল করেন নি। তবে আবার সেটি দেখতে পাবেন।"

"কোথায়?"

"শিঙ্গারচৌরীতে।"

"বনবীরের পাঁচিল কি ব্যাপার ঘোষদা?" শঙ্করী জিজ্ঞেস করে।

"বনবীর যখন শুনতে পেলেন, উদয় সিংহ মারা যান নি এবং যুবক বয়সে পদার্পণ করে তিনি সসৈন্যে চিতোর অধিকার করতে আসছেন, তখন বনবীর এই প্রাচীর তৈরি করে নিজেকে নিরাপদ করতে চেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, তাঁর সে আশা পূর্ণ হয় নি। উদয় সিংহ চিতোরগড় অধিকার করে নিয়েছিলেন এবং বনবীরকে পালিয়ে যেতে হয়েছিল। তবে দুর্গকে দু'ভাবে বিভক্ত করা তাঁর সেই প্রাচীরটি নাকি এখনও রয়েছে।"

কুম্ভ-প্রাসাদের সামনে এসে টাঙ্গা থামল। পথের বাঁদিকে অনেকটা উঁচুতে অনেকখানি জায়গা জুড়ে পরিত্যক্ত এবং প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদ।

সিঁড়ির সামনে পুরাতত্ত্ব বিভাগের সাইনবোর্ড—"The place named after Rana Kumbha (A. D 1433—68) who made enormous additions to an earlier palace is typical of Rajput civic architecture. The palace complex is entered through the Badi Pol and Tripolia Gateways. Among the numerous structures within the enclosure are the Genda Hathi (elephant shed), Diwan-I-Am (audience Hall), Suraj Goekhar, palace

for offering prayers to the the Sun, Heir-apparent's palace Zenana and Siva temples. The first Jauhar by Padmini is said to have been performed in a subterranean passage...'

সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে ভগ্নপ্রায় প্রাসাদের অনেকগুলি বড় বড় ঘর পেরিয়ে আমরা প্রথমেই সেই পুণ্যতীর্থে আসি—মহাসতী পদ্মিনীর সেই আত্মাহুতি মন্দিরের দ্বারদেশে।

গাইড বলেন, "সাম্প্রতিক খননকার্যের ফলে এই প্রাসাদের নিচে এক বিরাট হলঘর আবিষ্কৃত হয়েছে, এটি তারই একটি প্রবেশ পথ। অনুমান করা হয় মহাসতী পদ্মিনী চিতোরের অন্যান্য মা ও মেয়েদের নিয়ে এই পথ দিয়ে নেমে গিয়ে নিচের সেই হলঘরের কোন স্থানে জহরব্রত উদ্‌যাপন করেছিলেন।"

কর্নেল টডের সেই হৃদয়স্পর্শী বর্ণনাটি মনে পড়েছে আমার—'The funeral pyre was lighted within the 'great subterranean retreat' in chambers impervious to the light of the day and the defenders of chitor beheld in procession the Queens their own wives and daughters, to the number of several thousands. The fair Padmini closed the throng...They were conveyed to the cavern, and openion closed upon them, leaving them to find security from dishonour in the devouring element.'

কিন্তু কত সহজে সেদিন তাঁরা সেই মর্মান্তিক পরিণতির হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে পারতেন। আলা-উদ্-দিন তো শুধু পদ্মিনীকে চাইছিলেন। এবং অনুমান করি পদ্মিনীকে পেলে বিগত-যৌবন সুলতান তাঁকে সুখেই রাখতেন। এবং চিতোর ও তার হাজার হাজার নারী-পুরুষের জন্য পদ্মিনী নাকি সেদিন সুলতানের সে প্রস্তাবে সম্মত হয়েছিলেন। কিন্তু চিতোরবাসীরা তাঁর সে সিদ্ধান্ত অনুমোদন করেন নি। একটি নারীর ইজ্জতের জন্য সেদিন চিতোরের হাজার হাজার মানুষ হাসিমুখে প্রাণদান করেছিলেন।

আর ব্যর্থ আলা-উদ্-দিন? শ্মশানপুরী চিতোরের শাসনভার তাঁর পুত্র খিজির খানের হাতে তুলে দিয়ে দিল্লী ফিরে গিয়েছিলেন। কারণ যুবক খিজির পিতার এই মহতী অভিযানে তাঁকে যথাসাধ্য সাহায্য করেছিলেন। তারই স্বীকৃতি স্বরূপ সুলতান চিতোরের নতুন নাম রেখেছিলেন খিজিরাবাদ। বলা বাহুল্য সে নাম দীর্ঘস্থায়ী হয় নি।

সূর্যমন্দির ও রাজসভা দেখে আমরা এখন হাতিশালার ভেতর দিয়ে চলেছি। হাতিশালটি সত্যই দেখবার মতো—বিরাট উঁচু ছাদ, সারি সারি হাতি বাঁধার জায়গা। কয়েক শ' হাতি অনায়াসে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম করতে পারত এখানে।

শুধু হাতিশালা নয় কিন্তু এটি, পাশেই ঘোড়াশাল। কয়েক হাজার ঘোড়া বাঁধার ব্যবস্থা রয়েছে। এতবড় আস্তাবল আর কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না।

আমার পাশে পথ চলতে চলতে সহসা শঙ্করী জিজ্ঞেস করে, "আচ্ছা ঘোষদা, অনেকে আলা-উদ্-দিনের চিতোর অবরোধকে অ্যাগামেম্ননয়ের ট্রয় অবরোধের সঙ্গে তুলনা করে থাকেন।"

"তাঁরা ভুল করেন।" আমি উত্তর দিই।

"কেন?"

"অ্যাগামেম্নন ট্রয় অবরোধ করেছিলেন তাঁর ভাই স্পার্টার রাজা মেনেলাউসের স্ত্রী হেলেনকে উদ্ধার করবার জন্য। তিনি ট্রয় অবরোধ করে ছিলেন ট্রয়ের রাজকুমার প্যারিসের বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি দিতে। সে মেনেলাউসের আতিথ্যের সুযোগ নিয়ে তাঁর সুন্দরী রাণী হেলেনকে নিয়ে পালিয়েছিল। কিন্তু হেলেন স্বেচ্ছায় তার সঙ্গী হয়েছিল। কাজেই মহাকবি হোমারের ইলিয়াড মহাকাব্যের মহানায়ক অ্যাগামেম্ননের সঙ্গে পরস্ত্রীলোভী আলা-উদ্-দিনের কোন তুলনা করতে যাওয়া নেহাতই বাতুলতা।"

আমরা প্রাসাদের ভেতর দিয়ে পথ চলেছি। চলতে চলতে নানা কথা মনে পড়েছে আমার। কতো আত্মত্যাগ আর বীরত্বের সাক্ষী এই প্রাসাদ, কত বিশ্বাসঘাতকতা আর নিষ্ঠুরতা ঘটেছে এর ঘরে ঘরে। আমার মনে পড়ছে ধাত্রী পান্নার কথা—সেই মহীয়সী সেবিকার কর্তব্যনিষ্ঠার বিস্ময়কর কাহিনী ভাবতে ভাবতে এগিয়ে চলি—

১৫২৭ খ্রীস্টাব্দে ১৬ই মার্চ খানুয়ার যুদ্ধে মহারাণা সংগ্রাম সিংহ বাবরের কাছে পরাজিত হলেন। রাণা সঙ্গ তাঁর কয়েকজন অনুচরের সহায়তায় যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পালিয়ে আসতে পারলেন বটে, কিন্তু ভগ্নহৃদয়ের মহারাণা তারপরে মাত্র দু'বছর বেঁচেছিলেন।

বড় ছেলে অর্থাৎ মীরাবাঈয়ের স্বামী কুনওয়ার ভোজ রাজ সংগ্রাম সিংহের আগেই ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। তাই তাঁর মৃত্যুর পরে মেজছেলে রত্ন সিংহ রাজা হলেন। কিন্তু তিনি কয়েক বছরের মধ্যেই এক মেয়েঘটিত ব্যাপার নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে অসিযুদ্ধে প্রাণ বিসর্জন দিলেন। সামন্তরা সংগ্রামের সেজছেলে বিক্রমজিৎকে সিংহাসনে বসালেন।

বিক্রম কিন্তু রাণা হয়েই ধরাকে সরা জ্ঞান করতে শুরু করলেন। তিনি সামন্তদের অপমান করতে থাকলেন। মদ আর মেয়েমানুষ নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে আরম্ভ করলেন। এমন কি বড় বৌদি মীরাবাঈকে পর্যন্ত রেহাই দিলেন না।

তাঁর পাপের বোঝা পূর্ণ হলো। সামন্তদের সঙ্গে রাণার মনোমালিন্যের সংবাদ পেয়ে গুজরাটের সুলতান বাহাদুর শাহ ১৫৩৪ খ্রীস্টাব্দে চিতোর আক্রমণ করলেন। অর্থাৎ আলা-উদ্-দিনের অবরোধের ২৩১ বছর পরে আবার চিতোর অবরুদ্ধ হলো। আলা-উদ্-দিন ১৩০৩ সালে চিতোর জয় করেছিলেন।

লাব্রীখাঁ নামে বাহাদুরের একজন গোলন্দাজ সৈনিক ছিল। সে বারুদের সাহায্যে দুর্গপ্রাকারের খানিকটা অংশ ভেঙে ফেলতে সমর্থ হলো।

চিতোর রক্ষার আর কোন আশা নেই দেখে, স্বামীর পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে রাজমহিষী জহরবাঈ রণসজ্জায় সজ্জিত হয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। বহু শত্রুকে নিহত করে নিজে প্রাণ দিলেন।

সামন্তরা সংগ্রাম সিংহের ছোটছেলে শিশু উদয়কে বুন্দির রাজা শূরতানের আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিলেন। রাজমাতা (সংগ্রাম সিংহের পত্নী) কর্ণাবতী তেরো হাজার রাজপুত রমণীকে নিয়ে জহরব্রত উদযাপন করলেন।

আত্মাহুতির আগে কর্ণাবতী হুমায়ুনের কাছে সাহায্য চেয়ে একখানি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। হুমায়ুন ছিলেন কর্ণাবতীর রাখীভাই। বিপদের সময়ে রাজপুত মেয়েরা তাঁদের রাখীভাইকে স্মরণ করেন। তাঁরা পশমের ডোর দিয়ে অথবা মূল্যবান রত্নহারের রাখী বানিয়ে রাখীভাইকে

পাঠান। রাখীভাইরাও ধর্মভগ্নীর ইজ্জত রক্ষা করতে জীবনপণ সাহায্য করতে দ্বিধা করেন না।

কিন্তু হুমায়ুন কর্ণাবতীকে কোন সাহায্যই করতে পারলেন না। কারণ তাঁর কাছে সংবাদ পৌঁছবার আগেই বাহাদুর চিতোর ধ্বংস করে ফেলেন। তাই হুমায়ুন সোজা গুজরাটে চললেন। ফলে বাহাদুর মাত্র পনেরোদিন চিতোরে থাকতে পারলেন। নিজের রাজ্য রক্ষা করতে তাঁকে গুজরাটে ছুটতে হলো।

কোনই লাভ হলো না। কারণ বাহাদুর গুজরাটে পৌঁছতে পারার আগেই হুমায়ুন গুজরাট দখল করে নিলেন। বাহাদুর প্রাণভয়ে পালিয়ে গেলেন। হুমায়ুন বিক্রমজিৎকেই গুজরাট ও চিতোরের রাজা ঘোষণা করে দিল্লী ফিরে গেলেন।

হুমায়ুনের করুণায় বিক্রমজিৎ আবার চিতোরের সিংহাসনে বসতে পারলেন। কিন্তু এত বড় বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়েও তাঁর স্বভাব বদলালো না। তিনি আবার সামন্তদের সঙ্গে কলহ শুরু করে দিলেন। বাধ্য হয়ে সামন্তরা তাঁকে সিংহাসনচ্যুত করলেন। বিক্রম অবশ্য রাজপ্রাসাদেই বাস করতে থাকলেন।

কিন্তু সংগ্রাম সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র উদয় সিংহের বয়স তখন মাত্র ছ'বছর। তাই সামন্তরা পৃথ্বীরাজের উপপত্নীর ছেলে বনবীরকে উদয়ের অভিভাবক নির্বাচিত করলেন। বনবীর উদয়ের হয়ে যোগ্যতার সঙ্গে রাজ্যশাসন করতে থাকলেন।

অনতিকাল পরেই কিন্তু বনবীর লোভাতুর হয়ে উঠলেন। নানা গুণের অধিকারী হয়েও তিনি সে লোভকে জয় করতে পারলেন না। তাই তিনি বিক্রমজিৎ এবং উদয়কে হত্যা করবার মতলব আঁটলেন। তিনি রাতের অন্ধকারে প্রথমেই বিক্রমকে হত্যা করলেন। তারপরেই ছুটে চললেন উদয়ের ঘরে।

মাতৃহারা উদয়কে যে ধাত্রী লালন-পালন করতেন তাঁর নাম ছিল পান্না। তিনি রাজকুমারকে নিজের ছেলের চেয়ে বেশি ভালোবাসতেন। পান্না বনবীরেব এই দুরভিসন্ধির কথা শুনেছিলেন। তাই তিনি সর্বদা উদয়কে আগলে রাখতেন বুকের মাঝে।

সেদিন রাতে উদয়কে খাইয়ে পান্না তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিয়েছেন। উদয়ের মাথার কাছে বসে তিনি হাওয়া দিয়ে তাঁকে ঘুম পাড়াচ্ছিলেন। এমন সময় মৃত্যুপথযাত্রী বিক্রমের অন্তিম আর্তনাদ তাঁর কানে ভেসে এলো।

পান্না বুঝতে পারলেন এবারে বনবীর এঘরে আসবে। তিনি তাড়াতাড়ি উদয়কে কোলে নিয়ে ছুটে গেলেন পাশের নাপিত বাড়িতে। নাপিতকে বললেন—তুমি রাজকুমারকে নিয়ে তাড়াতাড়ি দুর্গের বাইরে চলে যাও। আমি একটু বাদেই আসছি।

প্রাসাদে ফিরে এসে পাশের ঘর থেকে পান্না উদয়ের সমবয়সী নিজের ছেলেকে নিয়ে এলেন। তাকে রাজপুত্রের পোশাক পরিয়ে উদয়ের বিছানায় শুইয়ে দিলেন।

অবুঝ শিশু ব্যাপারটা বুঝতে পারল না। মাকে জিজ্ঞেস করেও জানতে পারল না কিছু শুধু দেখতে পেল—মার দু'চোখের কোল বেয়ে অশ্রু নেমে এসেছে।

রাজপুত্রের কোমল বিছানায় শুতে তার কিন্তু ভালই লাগল। একটু বাদেই সে নিদ্রায় কোলে ঢলে পড়ল।

কিছুক্ষণের মধ্যেই রক্তাক্ত ছুরি হাতে বনবীর এসে দাঁড়ালেন দরজার সামনে। জিজ্ঞেস করলেন—উদয় কোথায়?

দরজার পাশে সরে এলেন পান্না। কিন্তু কোন কথা বলতে পারলেন না। যতই কর্তব্যপরায়ণা হোন্, তিনি যে মা। মা হয়ে নিজের ছেলের বুকে ছুরি বসাবেন!

ধৈর্যহীন বনবীর আবার হেঁকে উঠলেন—বল্, উদয় কোথায়?

আর দেরি করলে শেষ বক্ষা করা যাবে না। পান্না মুখ তুললেন না, চোখও খুললেন না, শুধু হাত দিয়ে নিজের ছেলেকে দেখিয়ে দিলেন একবার।

বনবীরের তখন যাচাই করে দেখবার মতো মনের অবস্থা ছিল না। তাছাড়া পান্না নিজের ছেলেকে এমনভাবে চাদর দিয়ে ঢেকে রেখেছিলেন যে বনবীরের কোন সন্দেহই হলো না। সে ছুটে গিয়ে ছুরিখানা সেই শিশুর বুকে বিঁধিয়ে দিল।

নিরপরাধ শিশু কিছু বুঝতে পারার আগেই তার মাতার কর্তব্যনিষ্ঠার বলি হলো।

নিজের ছেলের জন্য চোখের জল ফেলবার অবকাশও ছিল না পান্নার। বনবীর চলে যেতেই তিনি বেরিয়ে এলেন প্রাসাদ থেকে। দুর্গের বাইরে এসে নাপিতের কাছ থেকে প্রভুপুত্রকে কোলে তুলে নিলেন। তারপরে ছুটলেন নিরাপদ আশ্রয়ের আশায়। বহু কষ্টের পরে পান্না সে আশ্রয় খুঁজে পেয়েছিলেন। কিন্তু সেকথা এখন থাক্।

।। বারো ।।

গতকাল সন্ধ্যায় সিনেমা দেখেছি—চিতোরগড়ের সিনেমা। হলের নাম—অপ্সরা। ছবির নাম—যেইসা কো তেইসা। টিকেটের দাম—২·০৫ পয়সা।

বেলা চারটে নাগাদ আমরা চিতোর দুর্গ থেকে গাড়িতে ফিরে এসেছিলাম। আসার পথে সিনেমা-হলটি দেখে কৌতূহলী হয়ে উঠেছিলাম। আর ঠিক তখুনি সাহাবাবু বলে ফেললেন, "গাড়ি তো সেই শেষরাত সাড়ে তিনটেয়। সন্ধেবেলা সিনেমা দেখবেন নাকি?"

বললাম, "আমার কোন আপত্তি নেই।"

দেখা গেল সেজদি, শঙ্করী এবং বিউটিরও কোন আপত্তি নেই। শঙ্করী অবশ্য যায় নি শেষ পর্যন্ত। গাড়িতে ফিরে শ্রীর জ্বর কমে নি দেখে সে মত পরিবর্তন করেছিল।

সাহাবাবু সেজদি ও বিউটির সঙ্গে আমি চিতোরগড়ের সিনেমা দেখে এসেছি। সেই সঙ্গে সঞ্চয় করেছি কিছু নতুন অভিজ্ঞতা। যেমন শো চলার সময় 'হল'-এ পায়রা ওড়ে, দর্শকরা বিড়ি-সিগারেট খায় সর্বদা চা-ওয়ালারা হাঁকডাক করে এবং কুকুর ঘুরে বেড়ায়।

সিনেমা হলটি শহরের শুরুতে। তার মানে স্টেশন থেকে মাইলখানেক দূরে। টাঙ্গায় করে আমরা রাত প্রায় দশটা নাগাদ স্টেশনে ফিরে এসেছি। এসে দেখেছি শ্রীর জ্বর একটুও কমে নি, সে বেহুঁশের মতো পড়ে আছে।

মনের অবস্থা যাই হোক, মুখে পূর্ণিমা কিন্তু তার হাসি হারিয়ে ফেলে নি। সে-ই আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছে। বলেছে, "আপনি অযথা চিন্তা করবেন না ঘোষদা, বাচ্চাদের মাঝে মাঝে একটু-আধটু জ্বর হয়। কাল উদয়পুরে গিয়ে ডাক্তার দেখাবো।"

নিশ্চিন্ত হবার কোন কারণ ছিল না। সুতরাং আমার দুশ্চিন্তা কমে নি। তবে চুপ করে রয়েছি। কি বলব? আমার জন্যই যে শ্রী এত কষ্ট পাচ্ছে।

গাড়িতে তখন আরও একটা দুশ্চিন্তা বিরাজ করেছিল। ম্যানেজার উদয়পুর থেকে ফিরে আসে নি। তাহলে কি সে 'বাস'-এর ব্যবস্থা করতে পারে নি? আমরা কি নাথদ্বার ও হলদিঘাট

দর্শন করতে পারব না?

না, বেশিক্ষণ ভাবতে হয় নি ম্যানেজারের জন্য। ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সে ফিরে এসেছে। আর গাড়িতে উঠেই সানন্দে ঘোষণা করেছে, "মা-বাবা, দাদা দিদি, মাসিমা-পিসিমা ও ঠাকুরমারা, বাস পাওয়া গিয়েছে। কাল সকাল সাড়ে ছ'টায় আমাদের মাওলী জংশনে নেমে পড়তে হবে।"

সুতরাং আজ ভোর চারটেয় উঠতে হয়েছে। একে যাত্রীর অনুপাতে বাথরুমের সংখ্যা কম তার ওপরে ম্যানেজার না থাকায় কাল বিকেলে কর্তৃপক্ষ গাড়িতে জল দেয় নি। টাকা না দিলে জলদাতারা কখনই আমাদের জলদান করে না। কিন্তু কাল অহীন টাকা দিয়েও জল ভরাতে পারে নি।

আমাদের এই যাত্রার জন্য ফকিরবাবু পঞ্চাশখানি টিকেট কিনেছেন। কিন্তু সৌজন্য তো দূরের কথা, স্টেশন কর্তৃপক্ষদের কর্তব্য পালন করতেই দেখলাম না এখন পর্যন্ত। এতগুলো পরদেশী ভদ্রসন্তান তাঁদের দেশ দেখতে এসেছেন, এ বোধটুকুও নেই। ওঁদের আচরণে মনে হয় আমরা যেন অনাহুত ভিক্ষুক। সবচেয়ে বড় কথা রেলওয়ে বোর্ডের আদেশ পালনেও তাঁদের কোন নৈতিক দায়িত্ব আছে বলে মনে হয় না।

যাক্ গে, যেকথা বলেছিলাম। আজ সকাল সাড়ে ছ'টার কয়েক মিনিট পরেই আমাদের ট্রেন মাওলী জংশনে পৌঁছেছে। পূর্ণিমা ও শ্রী ছাড়া আমরা সবাই নেমে পড়েছি গাড়ি থেকে। মাসিমা অবশ্য পূর্ণিমাকেই যেতে বলেছিলেন আমাদের সঙ্গে। শ্রীকে নিয়ে গাড়ির সঙ্গে তিনিই উদয়পুর চলে যেতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পূর্ণিমা রাজি হয় নি। বলেছে, 'না, মা! নাথদ্বার বিখ্যাত তীর্থ, এবেলা তুমি যাও। বিকেলে বরং আমি উদয়পুর দেখব, তুমি গাড়িতে থাকবে।"

"তুমি দিদিমাদের সঙ্গে চলে যাও না মা!' ক্ষীণকণ্ঠে শ্রী বলে উঠেছে।

আমরা তার দিকে তাকিয়েছি। পূর্ণিমা জিজ্ঞেস করেছে, "তুমি কার কাছে থাকবে মা-মণি?"

"কেন বাণেশ্বরদার কাছে।"

মুহূর্তে আমার চোখের পাতা ভিজে উঠেছে। কোন রকমে সামলে নিয়েছি নিজেকে। ভেবেছি—এতটুকু মেয়ে, কিন্তু কি আশ্চর্য বিবেচনা। অথচ মা-সাবিত্রীর কি অবিচার ওর প্রতি! নিজেকেও ধিক্কার দিয়েছি সেই সঙ্গে।

উদয়পুর-মাড়ওয়ার-চিতোরগড় রেলপথের একটি বড় জংশন মাওলী। তবে জনপদটি মোটেই জনবহুল নয়। জায়গাটি খুবই ছোট—সামান্য কিছু বাড়িঘর ও গুটিকয়েক দোকান নিয়ে মাওলী। প্ল্যাফর্মে নামতেই একটি লোক এগিয়ে এসে পাঁচুকে নমস্কার করে। নিশ্চিন্ত হই—বাস এসে গিয়েছে।

কন্ডাক্টারের সঙ্গে লের-লাইন পেরিয়ে বড় রাস্তায় আসি। বাসে উঠি।

ঠিক সাতটায় বাস ছাড়ল। মসৃণ ও সুন্দর পিচঢালা পথ। পথের পাশে রুক্ষ প্রান্তর—কাঁটাগাছ ও ঝোপঝাড়ে ছাওয়া উঁচুনিচু প্রান্তর—মরুভূমির প্রথম সংস্করণ।

রেলপথের পাশে পাশে মোটরপথ। রেলপথটি গিয়েছে মাড়ওয়ার—মাওলী থেকে ১৫২ কিলোমিটার। এই পথে রেলে ১৫ কিলোমিটার গিয়ে নাথদ্বার রেল স্টেশন। স্টেশন থেকে শহর অবশ্য অনেকটা দূর—প্রায় ১১ কিলোমিটার। উদয়পুর থেকে নাথদ্বার ৪৮ কিলোমিটার আর মাওলী থেকে ২২·৪ কিলোমিটার।

"মামু!"

না। শ্রী নয়, বিউটি ডাক দেয় আমাকে। শ্রী আজ আসতে পারে নি সঙ্গে। সে মায়ের সঙ্গে উদয়পুর চলে গিয়েছে।

বিউটি বলে, "মামু আপনি তো কর্নেল টডের কথা বললেন না!"

গতকাল চিতোরগড়ে সিনেমা দেখে ফেরার সময় কথায় কথায় বলেছিলাম আজ ওকে আমি টডের জীবনী বলব। প্রতিশ্রুতিটা আমি ভুলে গেলেও ভোলে নি আমার কলেজ পড়া ষোড়শী ভাগনী।

সুতরাং শুরু করতে হয়, "লন্ডনের আইলিংটন পল্লীতে ১৭৮২ খ্রীস্টাব্দের ২০শে মার্চ জেম্‌স টড জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবার নামও জেম্‌স টড। মায়ের নাম মেরী। মাত্র সতেরো বছর বয়সে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন ক্যাডেট হয়ে তিনি ১৭৯৯ সালের মার্চ মাসে বাংলায় আসেন। ১৮০০ সালের ৯ই জানুয়ারি তিনি কমিশন পান এবং ২৯শে মে চতুর্দশ বেঙ্গল রেজিমেন্টের একজন লেফ্‌টন্যান্ট পদে নিযুক্ত হন।

"১৮০৫ সালে তিনি সিন্ধিয়া রাজসভার ইংরেজ রেসিডেন্টের একজন দেহরক্ষী নিযুক্ত হন। এই সময় তাঁকে সিন্ধিয়ার মহারাজার সঙ্গে মধ্য-ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করতে হয়। তার ওপরে আবার ১৮১২ থেকে ১৮১৭ সাল পর্যন্ত তাঁকে গোয়ালিয়রে থাকতে হয়েছিল। সে সময় তিনি প্রচুর ভ্রমণ করেছেন। ভ্রমণকালে টড আত্মতুষ্টির জন্য সর্বদা জরিপকার্য এবং যথাসম্ভব ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব সংগ্রহ করতেন।

"১৮১৫ সালে টড গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংসকে রাজপুতনাসহ মধ্যভারতের একখানি মানচিত্র উপহার দেন। এই মানচিত্রেই তিনি 'সেন্ট্রাল ইন্ডিয়া' কথাটির প্রথম ব্যবহার করেন। ১৮১৭ সালে হেস্টিংস যখন পিণ্ডারীদের বিরুদ্ধে অভিযান চালান, তখন এই মানচিত্র ও স্থানীয় অঞ্চল সম্পর্কে টডের অভিজ্ঞতা অমূল্য বলে বিবেচিত হয়েছিল।

"১৮১৮ সালে রাজস্থানের রাজন্যবর্গ ইংরেজদের সঙ্গে প্রতিরক্ষা মৈত্রীতে (Protective alliance) আবদ্ধ হবার পরে টড পশ্চিম রাজস্থানের রাজনৈতিক প্রতিনিধি (Political Agent) নিযুক্ত হলেন। রাজস্থানের রাজারা তখন আত্মকলহে লিপ্ত। তার ওপরে ছিল বর্গীর আক্রমণ। ফলে শাসন ব্যবস্থা বলতে কিছুই আর অবশিষ্ট ছিল না। চুরি ডাকাতি লেগেই থাকত। সীমান্তের গ্রাম ও শহরগুলির সব জনশূন্য হয়ে গিয়েছিল।

"টড এক বছরেরও কম সময়ে রাজস্থানে শান্তি ফিরিয়ে আনলেন। তাঁর সুশাসনে চুরি ডাকাতি বন্ধ হলো। প্রায় তিনশ' শহর এবং গ্রামের মানুষ নিশ্চিন্তে বাড়ি-ঘরে ফিরে গেলেন।

"শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার পরে টড ব্যবসা-বাণিজ্যের দিকে মনোবিনেশ করলেন। আন্তঃরাজ্য শুল্ক (Transit Duties) তুলে দেবার পরে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকল। এর আগে আর কখনও রাজস্থানের এমন আর্থিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটেনি। ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা, হিন্দু-মুসলমান সকলেই টডকে ভালোবেসে ফেললেন। কর্নেল জেম্‌স টড রাজস্থানের সবচেয়ে জনপ্রিয় মানুষে পরিণত হলেন।

"এই জনপ্রিয়তা কিন্তু তাঁর নিজের সর্বনাশ ডেকে আনল। ঈর্ষাপরায়ণ ব্রিটিশ কর্মচারীদের প্ররোচনায় বড়লাট তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখতে শুরু করলেন। ভাবলেন—টড নিশ্চয়ই রাজস্থানি রাজাদের সঙ্গে কোন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত রয়েছেন, নইলে রাজারা তাঁকে এত ভালোবাসবে

কেন?

"টডের ক্ষমতা সঙ্কুচিত করা শুরু হলো। অকৃতজ্ঞ কর্তৃপক্ষের আচরণে বিরক্ত হয়ে টড পদত্যাগ করলেন। কর্তৃপক্ষ কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের ভুল বুঝতে পারলেন কিন্তু স্বাস্থ্যের জন্য তিনি আর কাজে যোগ দিতে পারলেন না। অবশেষে ১৮২২ সালের জুন মাসে তিনি চাকরিতে ইস্তাফা দিয়ে দেশে রওনা হলেন। ক্ষীণস্বাস্থ্য নিয়েও বম্বে যাওয়ার পথে সারা পশ্চিম-ভারত পর্যটন করলেন। এই পর্যটনের কথা তিনি 'Travels in Western India' বইতে লিপিবদ্ধ করে গিয়েছেন। বইটি তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়েছে।

"১৮২৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে টড বম্বে থেকে দেশে রওনা হলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র একচল্লিশ বছর। তিনি বাইশ বছর এদেশে ছিলেন। কিন্তু তারই মধ্যে একক প্রচেষ্টায় তিনি রাজস্থান ও রাজস্থানের মানুষের জন্য যা করে গিয়েছিলেন, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। অনেকের ধারণা টড শুধু একজন ঐতিহাসিক। কিন্তু টডের প্রকৃতি পরিচয় তিনি একজন সুদক্ষ সেনাপতি, দূরদৃষ্টিসম্পন্ন রাজনীতিবিদ, বিচক্ষণ রাজ্যশাসক, বুদ্ধিমান অর্থনীতিবিদ এবং সর্বোপরি উদার মানবপ্রেমিক ছিলেন।

"আজ ঐতিহাসিকেরা টডের ইতিহাসের কোন কোন কাহিনীকে ভুল বলছেন। কিন্তু দেড়শ' বছর আগে তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত একক প্রচেষ্টায় যে ইতিহাস রচনা করেছেন, তা বিস্ময়কর। একটি কথা আমাদের কখনই ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে তাঁর আগে রাজস্থানের কোন ইতিহাস ছিল না। এবং এযুগের ঐতিহাসিকরা তাঁর ইতিহাসকে অবলম্বন করেই তাঁদের গবেষণা চালিয়েছেন। টডের ইতিহাস না থাকলে, তাঁরা বোধ হয় রাজস্থানি ইতিহাসের ওপর কোন আলোকপাত করতে সমর্থ হতেন না।

"আমি ঐতিহাসিক নই, একজন নগণ্য পর্যটক। আমার কাছে কর্নেল টডের সবচেয়ে বড় পরিচয় তিনি একজন ক্লান্তিহীন পর্যটক ছিলেন। এদেশে তাঁর বাইশ বছরের কর্মজীবনে প্রায় বিশ বছরই তিনি ভ্রমণ করেছেন। আর এজন্য তাঁকে যে দৈহিক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে, তা যে কোন শ্রেষ্ঠ পর্যটকের ভ্রমণকাহিনীকে ম্লান করে দেবে। তাঁর 'Annals And Antiquities of Rajasthan' সেই পর্যটনেরই সফল ফসল।

"দেশে ফিরে টড তাঁর জীবনের বাকি দিনগুলো প্রধানত রাজস্থানের ইতিহাস রচনায় ব্যয় করেন। তবে তারই মধ্যে ১৮২৬ সালে তিনি বিয়ে করে ফেললেন। তখন তাঁর বয়স চুয়াল্লিশ বছর। তাঁর বিহাহিত জীবন মাত্র ন' বছরের। এই সময়ে তাঁর দুটি পুত্র এবং একটি কন্যা জন্মলাভ করে।

"দেশে ফিরেও টড ব্রিটিশ প্রতিরক্ষা দপ্তরেই চাকরি করেছেন। তিনি ১৮২৪ সালে মেজর এবং ১৮২৬ সালে লেঃ কর্নেল পদে উন্নীত হন। তবে তিনি কিছু কাল রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারিক ছিলেন।

"১৮২৯ সালে তাঁর রাজস্থান ইতিহাসের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় খণ্ড বের হয় তিন বছর পরে ১৮৩২ সালে। অর্থাৎ বিশ বছরের পর্যটন ও অভিজ্ঞতার ঝুলিকে গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করতে তাঁর প্রায় দশ বছর সময় লেগেছিল ১৮৩৫ খ্রীস্টাব্দের ১৭ই জানুয়ারি মাত্র তিপ্পান্ন বছর বয়সে রাজস্থানের এই অকৃত্রিম পরদেশী সখা অমরলোকে মহাপ্রয়াণ করেন।"

"ডানদিকে তাকিয়ে দেখুন নাথদ্বার রেলস্টেশন দেখা যাচ্ছে।"

ম্যানেজারের কথায় আমাদের আলোচনা থেমে যায়। আমরা ডানদিকে তাকিয়ে নাথদ্বার স্টেশন দেখি। যাঁরা রেলে চড়ে নাথদ্বার দর্শনে আসেন, তাঁরা এখান থেকে বাস ধরেন। নাথদ্বার স্টেশনকে ডাইনে রেখে আমাদের বাস দুর্বার বেগে নাথদ্বার শহরের দিকে ছুটে চলেছে।

বোধ হয় শ্রীকে ফেলে আসার জন্যই শঙ্করীর মনটা ভাল নয়। তাই সে এতক্ষণ চুপ করেছিল। কিন্তু এবারে হঠাৎ নির্বাক শঙ্করী সবাক হলো। বলল, "ঘোষদা! চুপ করে আছেন যে বড়?"

একটু হেসে বলি, "সেই বাস ছাড়ার পর থেকে এতক্ষণ দেখি এক নাগাড়ে বকবক করে গেলাম।"

"তাই বলে এখন চুপ করে থাকার অধিকার কে আপনাকে দিল?"

"আর কেউ যদি দিয়েও থাকে, তুমি যে দাও নি সে সম্পর্কে আমার কোন সন্দেহ নেই।"

"তাহলে?"

"কি বলতে হবে বল?"

"কি আবার? নাথদ্বারের কথা।"

"বেশ বলছি।"

"বলুন।"

আমি শুরু করি, "নাথদ্বার উদয়পুর জেলার দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর। উদয়পুরের ৪৮ কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে বনাস নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। উদয়পুর-আজমীর জাতীয় সড়ক এই শহরের ওপর দিয়ে গিয়েছে। ১৯৭১ সালের আদমশুমারি অনুসারে নাথদ্বারের স্থায়ী জনসংখ্যা ১৮,৮৯৩ জন। তাঁদের মধ্যে ৯৮৯৮ জন পুরুষ এবং ৮৯৯৫ জন নারী। ৩৮০৬টি বাড়িতে ৩৮৯৩টি পরিবার বাস করেন। শহরের আয়তন ১৭.৫৫ বর্গকিলোমিটার।"

"অবস্থানের কথা তো বললেন না মামু?"

চমকে উঠি! না, শ্রী নয় বিউটি। শ্রী অসুস্থ, যে আজ আসে নি আমাদের সঙ্গে। কিন্তু কেউ মামু বলে ডাকলেই যে আমার তার কথা মনে পড়ে। সে-ই তো সেদিন গাড়িতে আমাকে প্রথম মামু বলে ডাক দিয়েছিল।

"ও মামু! কি ভাবছেন অমন মনে মনে? বলুন না নাথদ্বারের অবস্থানের কথা।" বিউটি তাগিদ দেয়।

আমি বলি, "২৪°৫৬' উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭৩°৪৯' পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত এই শহর।"

"আচ্ছা ঘোষদা, নাথদ্বার নামটা তো শ্রীনাথজীর নাম থেকেই?"

"হ্যাঁ। তাঁর মন্দিরকে কেন্দ্র করেই যে গড়ে উঠেছে শহরটি।"

"কি রকম?" দাদা জিজ্ঞেস করেন।

"শ্রীনাথজীর বিগ্রহটি দ্বাদশ শতাব্দীর। কথিত আছে শ্রীবল্লভাচার্য ব্রজমণ্ডলের কোনখানে এই শ্রীবিগ্রহ প্রাপ্ত হন। তিনি ১৪৯৫ সালে একটি ছোট মন্দিরে সেই বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৫১৯ সালে শ্রীনাথজীকে গোবর্ধন শহরে নিয়ে যাওয়া হয়।

"প্রায় দেড়শ' বছর পরে আওরঙ্গজেব যখন আবুচ্ছন্নবিকে ব্রজমণ্ডল ধ্বংস করতে পাঠান, তখন বল্লভাচার্যের বংশধরগণ বিভিন্ন বিগ্রহ নিয়ে ১৬৭১ সাল পর্যন্ত রাজস্থানের পথে ও প্রান্তরে পালিয়ে বেড়াতে থাকেন। অবশেষে তাঁদের এই দুর্ভাগ্যের কথা মহারাণা রাজসিংহের কানে

আসে। তিনি ১৬৫২ সালে উদয়পুরের সিংহাসনে বসেন।

"রাজসিংহ বল্লভাচার্যের তিনজন বংশধরকে মেবারে আমন্ত্রণ জানালেন। তাঁরা দ্বারকানাথ ও শ্রীনাথজীর বিগ্রহ নিয়ে মহারাণার সঙ্গে দেখা করলেন। রাজসিংহ কাঁকরোলির কাছে আসোতিয়া গ্রামে দ্বারকানাথের প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা করলেন আর শ্রীনাথজীর জন্য এখানে সুরক্ষিত শহর ও মন্দির নির্মাণ করে দিলেন। তখন এই গ্রামের নাম ছিল সিয়ার। সেই মন্দিরকে কেন্দ্র করেই পরবর্তীকালে গড়ে উঠেছে নাথদ্বার শহর। এই শহরে প্রাণীহত্যা নিষিদ্ধ। আগে এখানে কাউকে কয়েদ করবার নিয়ম পর্যন্ত ছিল না। হয়তো বা তার কোন কারণও ঘটত না। এখন নিশ্চয়ই সে নিয়ম রহিত হয়ে গিয়েছে।"

"আচ্ছা ঘোষ, কাঁকরোলি কোথায়?" এবারে সত্যেনদা জিজ্ঞেস করেন।

উত্তর দিই, "উদয়পুর থেকে ৬৪ কিলোমিটার উত্তরে রাজসামান্দা বা রাজসমুদ্র হ্রদের তীরে। রাণা রাজসিংহ দুটি পাহাড়ের মাঝে ১৮৩ মিটার লম্বা ও ৬৪ মিটার চওড়া একটি বাঁধ দিয়ে রাজস্থানের এই অন্যতম শ্রেষ্ঠ হ্রদটি তৈরি করেছেন। হ্রদের আয়তন ৭ ৭ বর্গকিলোমিটার। বাঁধটির নাম নৌচোকি বাঁধ আর শহরের নাম রাজনগর। সমস্ত বাঁধটি শ্বেতপাথরে বাঁধানো। জলে নামার জন্য তিনটি কারুকার্যময় তোরণযুক্ত ঘাট রয়েছে। ১৬৬২ থেকে ১৬৭৬ সাল, এই পনেরো বছর ধরে বাঁধটি নির্মিত হয়েছে। এই বাঁধের ওপরেই রয়েছে ভারতের সবচেয়ে বড় সংস্কৃত শিলালিপি। পাঁচিশখানি পাথরে খোদিত এই কবিতার শিলালিপিটির নাম রাজপ্রশস্তি। মহারাণা রাজসিংহ ১৬৭৫ সালে এটি খোদাই করান। এতে মেবারের ইতিহাস লেখা রয়েছে।"

"ঘোষদা, কিছু যদি মনে না করেন তো একটা কথা জিজ্ঞেস করি।" অমিয়বাবু সবিনয়ে আমাকে জিজ্ঞেস করেন।

"মনে করব কেন? কি বলবেন বলুন।"

"নির্ভয়ে বলব?"

"নিশ্চয়ই।"

"অভয় দিচ্ছেন?"

"হ্যাঁ।"

"আচ্ছা আমাদের এই যাত্রা মানে কুণ্ডু কোম্পানির এই ভ্রমণ কি প্রমোদভ্রমণ?"

"না। এটা তীর্থযাত্রা।" আমি উত্তর দিই।

"তাহলে সত্যেনদার প্রশ্নটার এমন ঘুরিয়ে জবাব দিচ্ছেন কেন?"

"ঘুরিয়ে জবাব দিচ্ছি!" আমি বিস্মিত। সত্যেনদাসহ সহযাত্রীরা প্রায় সকলেই অবাক হয়ে গিয়েছেন। শুধু বৌদি ও সরকারদা মৃদু হাসছেন। তাঁরা অমিয়বাবুকে আমাদের চেয়ে ভাল চেনেন।

অমিয়বাবু বলেন, "ঘুরিয়ে নয় তো কি? আপনাকে জিজ্ঞেস করা হলো কাঁকরোলির কথা আর আপনি সমানে রাজসামান্দার কথা বলে যাচ্ছেন।"

সহযাত্রীরা হো হো করে হেসে ওঠেন আর আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচি। হেসে বলি, "আমাদের এ যাত্রা প্রমোদ-ভ্রমণ না হলেও রাজসামান্দার কথা না বলে কাঁকরোলির মন্দিরের কথা বলা যাবে না।"

"কারণ?"

"কারণ, দ্বারকাধীশের মন্দিরটি যে ঐ হ্রদেরই তীরে এবং বাঁধের ওপরে অবস্থিত।"

দাদা বলেন, "নাথদ্বার থেকে দূরত্ব কত?"

"মাত্র ১৬ কিলোমিটার।"

"তাহলে আমরা সেখানে যাচ্ছি না কেন?" অমিয়বাবু প্রশ্ন করেন।

"হলদিঘাট যাচ্ছি বলে।" এবারে ম্যানেজার উত্তর দেন। "দু জায়গায় গেলে আর উদয়পুর দেখাই হবে না।"

"কিন্তু কাঁকরোলি না দেখলে নাকি নাথদ্বার দর্শনের পুণ্য হয় না!"

"শুনেছি পাণ্ডারা এরকম একটা কথা বলে থাকেন।" আমি অমিয়বাবুর প্রশ্নের উত্তর দিই।

"তাহলে?"

হেসে বলি, "তাহলেও আমরা হলদিঘাট যাবো। কারণ কাঁকরোলি গেলে কিছু বাড়তি পুণ্য লাভ করা যাবে আর হলদিঘাট না দর্শন করলে রীতিমত পাপ হবে।"

অমিয়বাবু আর কিছু বলতে পারেন না। তিনি বাইরের দিকে তাকান। পথের প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েছে। আমরা এখন একটি ছায়াশীতল সবুজ উপত্যকার ওপর দিয়ে চলেছি। সামান্য দূরে বাড়ি ঘর দেখাতে পাচ্ছি। নাথদ্বার এসে গিয়েছে।

পথের পাশে একটা দেওয়াল ঘেরা জায়গা দেখিয়ে পাঁচুবাবু বলে, "এই হলো শ্রীনাথজীর গোশালা, দু-তিন হাজার গোরু আছে।"

"এত দুধ খায় কে?" দাদা জিজ্ঞেস করেন।

"কেন তীর্থযাত্রী ও মন্দিরের কর্মচারীরা!"

"কত কর্মচারী আছেন?"

"অন্তত হাজার দুয়েক।"

"দু হাজার!"

"হ্যাঁ। বিরাট ব্যাপার। মন্দিরে গেলে বুঝতে পারবেন। ১৯০১ সালে বার্ষিক আয় ছিল ছ-সাত লক্ষ টাকা। এখন তার অন্তত দশগুণ বেড়েছে।"

"সেকি মশায়, এ তো অবিশ্বাস্য ব্যাপার!" অমিয়বাবু বলে ওঠেন।

কিন্তু ম্যানেজার আর কিছু বলার সুযোগ পায় না। বাস থেমে যায়। ম্যানেজার একবার বাইরে তাকিয়েই বলে ওঠে, "এই যে, আমরা গোবিন্দচক পৌঁছে গিয়েছি।"

বাস থেকে নামি, বেশ জম-জমাট জায়গা। পাঁচটি পথের সঙ্গম। তবে আমরা যে পথটি দিয়ে এসেছি, সেটি ছাড়া আর কোনটি বাস চলাচল করবার মতো প্রশস্ত নয়। বাকি চারটি পথকেই গলি বলা যেতে পারে।

গলি হলে কি হবে, দু-দিকে সারি সারি দোতলা তেতলা বাড়ি। নিচের তলায় পথের দু-পাশেই দোকান-পাট। কাপড়-চোপড়, বাসন-খেলনা, চা দুধ ও মিঠাই, বাসনপত্র মালা ও চুড়ির দোকান।

বাস থেকে নামতেই পাণ্ডাজীর সঙ্গে দেখা। তিনি যথা সময়ে ফকিরবাবুর চিঠি পেয়েছেন। কাজেই গত চারদিন রোজই বাস স্ট্যাণ্ডে এসে আমাদের খোঁজ করেছেন। কয়লার অভাবে ট্রেন 'ক্যানসেল্ড' হয়ে যাওয়ায় আমাদের চারদিন দেরি হয়ে গিয়েছে। পাঁচুবাবু তাকে সেকথা

জানায়।

পাণ্ডাজীর সঙ্গে আমরা হাঁটতে থাকি মন্দিরের দিকে। বেশ জনবহুল পথ। তবে গাড়ি-ঘোড়ার ঝামেলা নেই। গোবিন্দচকের পরে আর গাড়ি আসতে দেওয়া হয় না।

পথটা আস্তে আস্তে উঁচু হয়ে গিয়েছে। সামনে একটা তোরণ দেখতে পাচ্ছি, দু'পাশের দেওয়ালে দুটি পাথরের হাতী খোদাই করা—বেশ বড়। ভেতরে পথের ঠিক মাঝখানে লোহার রেলিং ঘেরা তুলসীমঞ্চ। পাণ্ডাজী বলেন, "ঐটেই মন্দির তোরণ কিন্তু এখন দর্শন বন্ধ। মন্দির খুলবে পৌনে ন'টার সময়, মাত্র মিনিট বিশেকের জন্য। আগে ধর্মশালায় চলুন, একটু বিশ্রাম করে মন্দিরে আসবেন।"

আমরা ডানদিকের রাস্তাটি ধরে এগিয়ে চলি। পথের পাশে ছোট একটি মন্দিরের সামনে নাচ-গান হচ্ছে। ঠাকুরমারা ছুটে গেলেন সেদিকে, ভিড়ের মাঝে মিশে গেলেন।

বাধ্য হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় আমাদের। কারণ পাণ্ডাজী ছাড়া আর কেউ ধর্মশালা চেনেন না। ম্যানেজার তার 'স্টাফ' নিয়ে এগিয়ে গিয়েছে। ব্রেকফাস্টের ব্যবস্থা করতে হবে যে।

একটু বাদেই ঠাকুরমারা ফিরে আসেন। কিন্তু যাঁরা গিয়েছিলেন আর যাঁরা ফিরে এলেন, তাঁরা যেন এক নন। চন্দনকাঠের ভস্ম এবং আবিরে রাঙ্গা হয়ে এসেছেন তাঁরা। পরশুদিন দোল পূর্ণিমা। এখানে আজই হোলি আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। তবে যাত্রীদের কাউকে ওঁরা রং দিচ্ছেন না, নিজেরা নিজেরাই হোলি খেলছেন। ঠাকুরমারা সম্ভবত সেই হোলির মধ্যে পড়ে গিয়েছিলেন। তাহলেও তাঁদের কোন ক্ষতি হয় নি বরং লাভই হয়েছে। আবির মনে দাগ কাটলেও পোশাকে কোন স্থায়ী দাগ রাখতে পারে না আর চন্দন-ভস্মের গন্ধটি বড়ই মিঠে।

পাণ্ডাজী বলেছেন, শ্রীনাথজী ছাড়া নাকি আরও সাতটি বিখ্যাত বিগ্রহ আছেন এখানে। কিন্তু আমরা বোধ হয় তাঁদের দর্শন করতে সময় পাব না। ম্যানেজার দশটায় বাস ছাড়বেন। তার মধ্যে আবার ব্রেকফাস্ট সারতে হবে এবং সহযাত্রীদের কেনাকাটা পর্ব রয়েছে। যাক্ গে, আগে তো শ্রীনাথজীকে দর্শন করে নিই। যাঁর জন্যে এখানে আসা। আমরা এখন তাঁর কাছেই চলেছি।

পাথর বাঁধানো চড়াই পথ ধরে আমরা মন্দিরে চলেছি। শুধু উকিলবাবু আসেন নি সঙ্গে। তিনি মন্দির দর্শন করেন না। তাই ধর্মশালাতে বসে বিশ্রাম করছেন।

লোহার দরজাযুক্ত অত্যন্ত মজবুত তোরণ পেরিয়ে আমরা মন্দির-চত্বরে এলাম। একদিকে তোরণ আরেকদিকে মন্দির, বাকি-দুদিকে সারি সারি ঘর। মাঝখানে পাথর বাঁধানো প্রশস্ত চত্বর। সেখানে ফুলের মেলা বসেছে। সব ফুল নয়, শুধুই গোলাপ। শ্রীনাথজীকে ফুলের ডালি দিতে হয়। দাম খুবই সস্তা, পাঁচিশ পয়সার ডালিতে গোটা বিশেক গোলাপ পাওয়া যায়। সহযাত্রীরা অনেকেই ফুলের ডালি কিনে মন্দিরের গদিতে প্রসাদের জন্য টাকা জমা দিলেন। শুনেছি প্রসাদে খাজা গজা প্যাড়া লাড্ডু রাবড়ি ও মালাই প্রভৃতি থাকে। দুপুর পর্যন্ত থাকব না বলে আমরা কেউ ভোগের জন্য টাকা জমা দিলাম না। শ্রীনাথজীর ভোগ ভারত বিখ্যাত। ভাত ডাল আট-দশ রকমের তরকারি, পরমান্ন ও চাটনি। তাই তার নাম রাজভোগ।

মাঝখানে মন্দির, চারিদিকে বাড়ি। লোকালয় নয় মন্দিরের বাড়ি। পাণ্ডাজীর সঙ্গে আমরা তারই একটি বাড়ির দোতলায় উঠে আসি। প্রথমেই এলাম সোনা ও রুপোর যাঁতার কাছে। এই যাঁতা দিয়ে শ্রীনাথজীর মশলা পেষাই হয়।

যাঁতা দেখে পরের ঘরটিতে আসি। সঙ্গে সঙ্গে ঘিয়ের গন্ধে আমোদিত হয়ে উঠি। ঘরের

মাঝে একটা ঘি বোঝাই বিরাট চৌবাচ্চা। এই ঘি দিয়ে শ্রীনাথজীর ভোগ রান্না হয়।

নিচে নেমে এসে মন্দির চত্বর পেরিয়ে আরেকটি বাড়িতে আসি। দর্শন করি শ্রীবল্লভাচার্যের গদি।

তাঁকে প্রণাম করে পাশের বাড়িতে এলাম। নিচের তলায় একখানি ঘরে শ্রীনাথজীর ভোগের জন্য গম ভাঙা হচ্ছে। গোরুটির দু-চোখ বাঁধা। পাশে একই ধরনের আরেকটি গোরু ও তেলের কল রয়েছে। সেটি এখন বন্ধ।

পাণ্ডজীর সঙ্গে দোতলায় উঠে আসি। বিরাট একখানি হলঘরের দোরগোড়ায় এসে দাঁড়াই। ফুলের গন্ধে ভরে উঠেছে চারিদিক। ঘরের মাঝে বিরাট এক ফুলের স্তূপ। প্রায় পঞ্চাশজন নারী-পুরুষ শ্রীনাথজীর জন্য মালা গাঁথছেন। ফুলের ডালি জমা দিয়ে আমরা বেরিয়ে আসি ঘর থেকে।

সবজি ও ফলের ঘর দেখি। একই ব্যাপার—সারা ঘর জুড়ে তরি-তরকারি ও ফলের স্তূপ। তীর্থযাত্রীরা স্বেচ্ছায় এসে কিছুক্ষণ করে তরকারি কিংবা ফল কেটে দিচ্ছেন।

পাশের ঘরটিও দেখবার মতো। পঁচিশ-ত্রিশজন মহিলা পান বানিয়ে চলেছেন কিন্তু পান-সুপারির স্তূপ ছোট হচ্ছে না। কেমন করে হবে? দশটি পান বানাবার ভেতরে বিশজন যাত্রী এসে স্তূপকে আরও বড় করে দিচ্ছেন।

তারপরে আসি দুগ্ধ-ভাণ্ডারে। দলে দলে যাত্রী এসে দুধ দিয়ে যাচ্ছেন। দৈনিক নাকি বিশ মণ দুধের পরমান্ন রান্না হয় আর উৎসবের সময় তো কথাই নেই।

অন্নকুটের সময় উৎসব হয় এখানে। প্রায় পঞ্চাশ হাজার যাত্রীর সমাগম হয়। তখন বেশ বড় মেলা বসে নাথদ্বারে।

অবশেষে পাণ্ডাজীর সঙ্গে তেতলায় উঠে আসি। মন্দিরশীর্ষটি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এখান থেকে। সিঁদুরমাখা পদ্মাকৃতি শিখরকলসের ওপরে শ্রীকৃষ্ণের সুদর্শনচক্র। পাশে একটি পতাকাদণ্ডে শ্রীনাথজীর পতাকা উড়ছে—লাল কমলা ও গেরুয়া রঙের বিরাট বিরাট কয়েকটি পতাকা।

তবে মন্দিরের উপরিভাগটি দেখে বিস্মিত না হয়ে পারছি না। খোলার চাল।

পাণ্ডাজী মৃদু হাসেন। বলেন, "শুধু চাল নয়, মূল মন্দিরটিও কাঁচা গাঁথুনির। এবং শ্রীনাথজীর স্বপ্নাদেশেই এরকম মন্দির তৈরি হয়েছে। আমরা শ্রীনাথজীকে মূল্যবান অলঙ্কার পরিয়েছি, তার মাথার ওপরে জরি ও রেশমের চন্দ্রাতপ টাঙিয়েছি। কিন্তু তিনি মাটির ঘরে বাস করেন। তিনি যে মাটির মানুষের ভগবান—দরিদ্রের নারায়ণ।"

নিচে নেমে পুস্তকালয়ে আসি। এটি একদিকে যেমন 'ফ্রি রিডিং রুম' ও 'লাইব্রেরি' আরেকদিকে তেমনি 'বুক স্টল'। মন্দির কর্তৃপক্ষ নিজেরাই নাথদ্বার সম্পর্কীয় পত্র-পত্রিকা ও পুস্তক প্রকাশ এবং বিক্রয় করেন। দুর্ভাগ্যের কথা বিক্রয় কেন্দ্রটি এখন বন্ধ। খুলবে সেই বেলা এগারোটায়। ম্যানেজার ততক্ষণে আমাদের নিয়ে নাথদ্বার থেকে চম্পট দেবে।

শ্রীনাথজীর কোন চিহ্ন না নিয়েই আমাদের বিদায় নিতে হবে নাথদ্বার থেকে। বই কিনতে পারলাম না, ছবিও তুলতে পারব না। ছবি তোলা তো দূরের কথা এঁরা ক্যামেরা নিয়ে মন্দিরে ঢুকতে পর্যন্ত দেন না। ভারতের অধিকাংশ বড় মন্দিরেই দেখেছি এই নিয়মটি প্রচলিত আছে। আজও এর কারণটা বুঝে উঠতে পারলাম না।

পুস্তকালয় থেকে পাণ্ডাজীর সঙ্গে নাট-মন্দিরে আসি। ছোট নাট-মন্দির। বহু দর্শনার্থী

দাঁড়িয়ে রয়েছেন। আমরাও তাঁদের সামিল হই।

গর্ভ-মন্দিরের সামনে পর্দা ঝুলছে। আমরা সেই পর্দার দিকে তাকিয়ে শ্রীনাথজীকে স্মরণ করার চেষ্টা করছি। তাঁকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে এই শহর। তাঁরই জন্য যুগে যুগে আমার মতো লক্ষ লক্ষ ভক্ত ছুটে এসেছেন এখানে—এই মন্দির-নগরী নাথদ্বারে।

মন্দিরের অধ্যক্ষ মহারাজ গোঁসাই এই জনপদের জমিদার। তিনি বল্লভাচারী সম্প্রদায়ের প্রধান পরিচালক। এই শহরটি ছাড়াও শ্রীনাথজী মন্দিরের প্রচুর সম্পত্তি রয়েছে। মেবার বরোদা ভরতপুর বিকানীর করৌলী কোটা প্রতাপগড় ও আজমীর জেলার ত্রিশখানি গ্রাম এই মন্দিরের সম্পত্তি। রাজস্ব আদায় থেকে শান্তিরক্ষা পর্যন্ত সব কিছুই মহারাজ গোঁসাইকে দেখাশোনা করতে হয়।

অবশেষে আবরণ উন্মোচিত হয়। পুলকিত দর্শনার্থীরা বিস্ময়ে ও অনন্দে চিৎকার করে ওঠেন—শ্রীনাথজী কি জয়, দ্বারকাধীশ কি জয়, কৃষ্ণ-ভগবান কি জয়!

জয় জয় আর জয়। যতদিন জগৎ থাকবে ততদিন এই জয়ধ্বনি জেগে রইবে। অথচ যারা এই জয়ধ্বনিকে স্তব্ধ করার জন্য রক্তের বন্যা বইয়েছে, তারা আজ কোথায়? আওরঙ্গজেব নেই কিন্তু শ্রীনাথজী আসেছন। তিনি থাকবেন চিরকাল।

গর্ভ-মন্দিরটি ছোট। ঠিক কেন্দ্রস্থলে শ্বেতপাথরের কারুকার্যখচিত সিংহাসনে কষ্টিপাথরের দণ্ডায়মান মূর্তি—দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণ। অনেকটা নাচের ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন—একখানি হাত ওপরদিকে ও আরেকখানি নিচে প্রসারিত। অপরূপ মূর্তি। কালোর যে এত রূপ হতে পারে এর আগে জানা ছিল না আমার। আমি সেই পরমসুন্দরকে প্রণাম করি। প্রার্থনা করি। বলি—ঠাকুর, তোমার সেই প্রিয় পৃথিবী আজ আবার অসুন্দর হয়ে উঠেছে, পুনরায় তোমার আবির্ভাবে বিশ্বসংসার ধন্য হয়ে উঠুক। তুমি আবার জগৎটাকে সুন্দর করে গড়ে দাও।

পূজারীর হাতের ঘণ্টা নড়ে উঠল, তাঁর সহকারীর কাঁসর বেজে উঠল, নহবৎখানা থেকে সানাইয়ের সুর এলো ভেসে। শুরু হলো আরতি—শ্রীনাথজীর ভোগারতি। আমরা অপলক নয়নে তাকিয়ে রয়েছি সেই অপরূপের দিকে। আমার হৃদয় অনির্বচনীয় আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমি সুন্দরের স্পর্শ লাভ করলাম। আমার প্রাণ ও মন পবিত্র হলো। আমি ধন্য হলাম।

।। তেরো ।।

নাথদ্বার থেকে বাস ছাড়ল সকাল ঠিক সাড়ে দশটায়। সেই আজমীর-উদয়পুর 'হাইওয়ে' ধরেই আমরা উদয়পুরের দিকে এগিয়ে চলেছি।

বাসের ভেতরে গল্পের গুঞ্জন। সবাই তৃপ্ত—পরমতৃপ্ত। হবারই কথা, এমন মনোহর দেবভূমি দর্শন সত্যিই সৌভাগ্যের।

আমরা নাথদ্বার শহরের ভেতর দিয়ে চলেছি। শহরের প্রায় চারিদিকেই পাহাড়। উপত্যকাটি এমন সুরক্ষিত বলেই হয়তো সেদিন সিয়ার গাঁয়ে এসে শ্রীনাথজীর রথের চাকা মাটিতে বসে গিয়েছিল। কারণ অন্তর্যামী শ্রীনাথজী জানতেন—যেখানে তাঁর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হবে, সেখানেই অদূর ভবিষ্যতে গড়ে উঠবে ভারতবিখ্যাত দেবালয় আর তা ধ্বংস করতে পরধর্মদেষী সম্রাটদের সৈন্যদল আসবে ছুটে। তিনি জানতেন—তাতে তাঁর কিছুই এসে যাবে না। অস্ত্র দিয়ে কখনও ভক্তির ফল্গুধারায় বাঁধ দেওয়া যায় না। সুলতান মাহমুদ সোমনাথকে

ধ্বংস করতে পারেন নি, আওরঙ্গজেবও নাথদ্বারকে ধ্বংস করতে পারবে না। তবু ভক্তদের শ্রম লাঘবের জন্য সর্বইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রা শ্রীকৃষ্ণ এই সুরক্ষিত উপত্যকাকেই তাঁর বিচরণভূমিরূপে নির্বাচিত করেছিলেন।

খবর পেয়ে ছুটে এসেছিলেন মহারাণা রাজসিংহ। মাটিতে বসে-যাওয়া রথের চাকা দেখে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন শ্রীনাথজী এখানেই অবস্থান করতে চান।

রাজসিংহ মন্দির নির্মাণ করে মহাসমারোহে শ্রীনাথজীকে সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। সেদিন থেকেই সিয়ার গ্রামের নাম হলো নাথদ্বার।

বড় রাস্তা দিয়ে মাত্র মাইলখানেক এগিয়েই আমাদের বাস ডানদিকের কাঁচা রাস্তা ধরল। ম্যানেজার জানালেন, "এখানে থেকে হলদিঘাট ২২.৪ কিলোমিটার আর হলদিঘাট থেকে উদয়পুর ৬৬ কিলোমিটার। হলদিঘাট দর্শন করে আবার এখানে এসে আমাদের উদয়পুরের রাস্তা ধরতে হবে। পথে পড়বে কৈলাসপুরী, সেখানকার একলিঙ্গজী মেবারের রাণাদের গৃহদেবতা।"

একটু এগিয়ে পথের ডানদিকে একটি দেওয়ালঘেরা জায়গা দেখিয়ে ম্যানেজার বলেন, "শ্রীনাথজীর বাগান ও ক্ষেত। চমৎকার ধান হয় এখানে।"

পথের দু-ধারেই ধূসর পাহাড়ের আঁকাবাঁকা রেখা আরাবল্লীর দুর্ভেদ্য গিরি-প্রাচীর। ঐ প্রাচীরের অন্তরালে থেকে মহারাণা প্রতাপ বিশ বছর তৎকালীন পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিশালী ঐশ্বর্যশালী সম্রাটের সমস্ত আক্রমণকে প্রতিহত করে মেবারের স্বাধীনতা অক্ষুণ্ণ রেখেছেন।

কিন্তু মহারাণা প্রতাপের সেই বীরত্বের কাহিনী স্মরণ করতে হলে আমাকে যে তাঁর পিতা উদয়সিংহের কথা ভেবে নিতে হবে। সেকথাই ভেবে চলি—

পান্নার নির্দেশে সেই নাপিত উদয়কে কাঁধে নিয়ে বীরা নদীর তীরে অপেক্ষা করছিল। বনবীর তাঁর পুত্রকে হত্যা করে চলে যাবার পরেই পান্না ছুটে এলেন সেখানে। পুত্রহারা মা প্রভুপুত্রকে কোলে তুলে নিলেন। তারপরে ছুটলেন সিংহরাও রাঘজীর ছেলে দেবলরাও সিংহরাওয়ের কাছে।

কোন লাভ হলো না। বনবীরের ভয়ে দেবলরাও উদয়কে আশ্রয় দিলেন না। পান্না নিরাশ হলেন না। তিনি দুঙ্গরপুরের সামন্তরাজা ঐশকর্ণের কাছে গিয়ে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। ঐশকর্ণও একই কারণে পান্নাকে ফিরিয়ে দিলেন।

পান্না তবু হার মানলেন না। শ্রান্তিহীনা ধাত্রী কমলমীরের কুম্ভমেরু দুর্গে গিয়ে আশা শা-র করুণা ভিক্ষা করলেন। তিনিও প্রথমে উদয়কে আশ্রয় দিতে রাজি হচ্ছিলেন না। কিন্তু তাঁর মায়ের আদেশে তিনি শেষ পর্যন্ত পান্নার অনুরোধ রক্ষা করতে বাধ্য হলেন। আশা শা-র ভাগনের পরিচয়ে উদয় সেখানে বড় হতে থাকল।

কথাটা কিন্তু দীর্ঘকাল গোপন রইল না। উদয় তারুণ্যে উপনীত হবার পরেই একদিন পান্না শোনিগুরু সর্দারের কাছে উদয়ের প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সর্দারজী কমলমীর মেবারের সমস্ত সর্দার ও সামন্তদের-এক সম্মেলন আহ্বান করলেন। ধাত্রী পান্নার আত্মত্যাগ ও প্রভুভক্তির কথা শুনে তাঁরা তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। সেই সভাতেই মেবারের প্রধান সামন্তরা উদয়ের ললাটে রাজটীকা পরিয়ে দিলেন। সংগ্রাম সিংহের বংশ লোপ পায় নি শুনে মেবারের মানুষ পুলকিত হয়ে উঠলেন। আর এই পুলকের শিহরন শেষ হবার

আগেই শোনিগুরু রাওপ্রমার নিজের মেয়ের সঙ্গে উদয়ের বিয়ে দিলেন। মাহোলী ও মালজী নামে দুজন শোলাঙ্কি সর্দার ছাড়া মেবারের সমস্ত সর্দার ও সামন্তরা সে বিয়েতে উপস্থিত হয়েছিলেন।

সহায়-সম্বল ও আত্মীয়-স্বজনহীন বনবীর চিতোরের তোরণ আগলে বসে রইলেন। কিন্তু সামন্তদের সাহায্যে সংগৃহীত মাত্র একহাজার সৈন্য নিয়ে উদয় সিংহ অনায়াসে চিতোর অধিকার করে নিলেন। বনবীর তাঁর প্রণনাশের চেষ্টা করলেও উদয় কিন্তু তাঁকে প্রাণে মারলেন না।

পরিবার পরিজন ও নিজের সম্পত্তি নিয়ে বনবীর দাক্ষিণাত্যে চলে গেলেন। বর্তমান নাগপুরের ভোসলারা তাঁরই বংশধর।

১৫৪১-৪২ খ্রীস্টাব্দে উদয় সিংহ চিতোরের সিংহাসনে বসলেন। এবং অনতিকাল পরেই সামন্তরা বুঝতে পারলেন তাঁর মতো অপদার্থ শিশোদীয়কুলে আর জন্মায় নি। জীবন সম্পর্কে তাঁর কোন বোধ নেই। মদ এবং মেয়েমানুষ ছাড়া তাঁর কিছুই ভাল লাগে না।

তাই উদয় সিংহ সম্পর্কে লিখতে বসে কর্নেল টড মন্তব্য করেছেন যে, মেবারের রাণাদের তালিকায় উদয় সিংহের নামটি না থাকলেই ভাল হতো।

উদয় সিংহ শুধু চরিত্রহীন ছিলেন না, রাজনীতির কোন জ্ঞানও তাঁর ছিল না। তিনি ভবিষ্যতের কথা না ভেবেই আকবর কর্তৃক বিতাড়িত মালবরাজ বজ বাহাদুরকে চিতোরে আশ্রয় দিলেন। ১৫৬৭ সালের অক্টোবর মাসে আকবর চিতোর আক্রমণ করলেন। এবং তিনি চিতোর পৌছাবার আগেই উদয় সিংহ সপরিবারে চিতোর থেকে পালিয়ে এলেন। উদয়পুরে রাজধানী স্থানান্তরিত করলেন।

তাহলেও চিতোর অধিকার করতে আকবরকে প্রচুর বেগ পেতে হলো। ১৫৬৮ সালের ২২ শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত অর্থাৎ জয়মল ও পাট্টাকে মেরে ফেলার আগে পর্যন্ত আকবর চিতোর দুর্গে প্রবেশ করতে পারেন নি। শুধু তাই নয়, জয়মল ও পাট্টাকে মেরে ফেলার পরেও কাজটা খুব সহজ হয় নি। শহিদাস, রাবৎদুদা, প্রমার ও ঝালাপতি প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় বীরদের মৃতদেহের ওপর দিয়েই রক্তাক্ত পায়ে সম্রাটকে শ্মশানপুরী চিতোরে পৌঁছতে হয়েছিল।

কর্নেল টডের মতে—আলা-উদ্-দিন এবং বাহাদুরের চেয়ে আকবর চিতোরের অনেক বেশি ক্ষতিসাধন করেছেন। তিনি তখনকার চিতোরের প্রায় সমস্ত দেবালয় ও প্রাসাদ ধ্বংস করে ফেলেছিলেন। তাই কর্নেল টডের মতে চিতোর বিজয়ীদের মধ্যে আকবরই নৃশংসতম।

টড আরও বলেছেন—রাজপুতরা প্রত্যেকেই পৈতা ব্যবহার করেন। চিতোর জয়ের পরে সম্রাটের আদেশে মোগলসৈন্যরা মৃত রাজপুত বীরদের গা থেকে নাকি পৈতা খুলে নিয়ে ওজন করেছিল। ওজন হয়েছিল সাড়ে ৭৪ মণ। তখন ৪ সেরে এক মণ ধরা হতো। তার মানে মৃত রাজপুত বীরদের পৈতার ওজন হয়েছিল ২৯৮ সের। অর্থাৎ অন্তত হাজার পঞ্চাশ মানুষ মেরে আকবর চিতোর জয় করতে পেরেছিলেন এবং তাঁর এই জয়লাভের ফলে আরও হাজার কয়েক রাজপুত নারী জ্বলন্ত চিতায় আত্মাহুতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

সম্রাটের সভাসদ আবুল ফজল বলেছেন যে, এই যুদ্ধে নাকি ত্রিশ হাজার রাজপুত প্রাণ বিসর্জন দিয়েছিলেন। তাঁর হিসেবকে সত্য বলে ধরে নিলেও সেই হত্যালীলার কথা ভেবে

শিউরে না উঠে পারা যায় না। কারণ চিতোরগড়ের আয়তন মাত্র ৬৯০ একর। ১৯০৮ সালেও এই ক্ষুদ্র জনপদের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৫০৫০ জন। কাজেই মনে হয় চিতোর রক্ষার জন্য মেবারের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে যে-সব রাজপুত বীর তখন চিতোরে এসেছিলেন, তাঁদের প্রায় সবাইকে হত্যা করার পরেই সম্রাট আকবর চিতোর অধিকার করতে পেরেছিলেন।

চিতোর জয়ের পর থেকেই নাকি আকবরের আদেশে চিঠির খামের ওপরে ৭৪॥৹ সংখ্যাটি লিখে দিতে হতো। উদ্দেশ্য প্রাপক ছাড়া আর কেউ সে চিঠি খুললে চিতোর ধ্বংস করার পাপের ভাগীদার হবে।

অনেকে বলেন অখণ্ড এবং ঐক্যবদ্ধ ভারত প্রতিষ্ঠার জন্যই মহামতি আকবর সেদিন চিতোর আক্রমণ করেছিলেন। কথাটা বিশ্বাসযোগ্য নয়, কারণ আকবর বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করলে উদয় সিংহ হাত সরিয়ে নিতেন বলে মনে হয় না। তাছাড়া বুদ্ধিমান আকবর হুমায়ুন ও কর্ণাবতীর সম্পর্কের সূত্র ধরেও মেবারের সঙ্গে একটা প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারতেন। উদয় সিংহ সুযোগ পেলে আকবরের সখ্যতা প্রত্যাখ্যান করতেন বলে মনে হয় না। উপরন্তু চিতোর আক্রমণ করে আকবর তাঁর পিতার মহান আদর্শকে অপমান করেছেন। সুতরাং চিতোরের নৃশংসতা নিঃসন্দেহে মহামতি আকবরের চরিত্রকে কলুষিত করেছে।

সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্যই আকবর সেদিন চিতোর আক্রমণ করেছিলেন আর তিনি ইচ্ছে করেই অমন নৃশংস হয়েছিলেন। তিনি ভয় দেখিয়ে রাজপুতনার ওপর নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। খানিকটা সফলও যে না হয়েছিলেন, তা নয়। কারণ চিতোর জয়ের পরেই ভয় পেয়ে রণথম্বর কালিঞ্জর, বিকানীর ও জয়শলমীরের রাজারা তাঁদের সুন্দরী মেয়েদের উপঢৌকন দিয়ে সম্রাটের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করেছিলেন।

কিন্তু আকবরের আসল উদ্দেশ্য সফল হয় নি। মেবার কখনও তাঁর অধীনতা স্বীকার করে নি। উদয় সিংহ দুর্বল এবং চরিত্রহীন হলেও কাপুরুষ ছিলেন না। অত্যন্ত প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও তিনি আকবরের বশ্যতা স্বীকার করেন নি।...

"বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখুন, আমরা হলদিঘাট এসে গিয়েছি।"

পাঁচুবাবুর কথায় উদয়সিংহের ভাবনা হারিয়ে যায়, আমি প্রতাপের হলদিঘাটে ফিরে আসি। তাড়াতাড়ি বাইরে তাকাই। দূরের আরাবল্লী এগিয়ে এসেছে কাছে, খুবই কাছে—একেবারে পথের পাশে। দুই পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটি সঙ্কীর্ণ স্রোতস্বিনী—মেবারের মহিমময়ী বনাস নদী। তারই তীর ছুঁয়ে পথ। সেই পথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে আমাদের বাস।

ক্ষেত-খামার শেষ হয়েছিল কিছুক্ষণ আগেই। এবারে বড় বড় গাছে ছাওয়া ও কাঁটাগাছ আর ছোট ছোট ঝোপঝাড়ে ভরা প্রায় সমতল একটি প্রশস্ত পাথুরে প্রান্তরের পাশ দিয়ে চলেছি আমরা। জায়গাটি দেখতে কিন্তু ভারি সুন্দর।

ম্যানেজার আবার বলে, "বাঁদিকে বনাস নদীর বাঁধ আর ডান দিকে যে সুন্দর সমতলটি দেখছেন, এখানেই সেলিম তাঁর সৈন্যদের নিয়ে ছাউনি ফেলেছিলেন। প্রতাপ সিংহ তাঁর সৈন্যদের নিয়ে পাহাড়ের ওপারে ছিলেন। আর ঐ যে গিরিবর্ত্মের মতো উঁচু এবং সরু জায়গাটি দেখছেন, ওখানেই দু-পক্ষের যুদ্ধ হয়েছিল। ঐ জায়গাটিকেই বলে হলদিঘাটি বা হলদিঘাট। ঘাট মানে গিরিপথ। আর দেখছেন না এখানকার মাটি কি রকম হলুদ।"

সত্যিই তাই, এমন হলদে মাটি বড় একটা দেখা যায় না।

আরাবল্লীর গিরিশিরা দুটি দু-দিক থেকে আমাদের পথের পাশে এসে থমকে দাঁড়িয়ে গিয়েছে। তাদেরই মাঝখান দিয়ে আমাদের পথ। পথ নয় গিরিপথ—হলদিঘাট। হলদিঘাটের ওপর দিয়ে পথ চলেছি আমরা।

আধ মাইলের মতো লম্বা হলুদ রঙের গিরিপথটি পেরিয়ে বাস নেমে এলো আরেকটি প্রশস্ত উপত্যকায়।

ম্যানেজার বলে, "মেবারবাহিনী এখানেই শিবির করেছিলেন। আর ঐ যে জায়গাটি দেখছেন ওখানেই শক্ত সিংহ সেই মূলতানি ও খোরাসানী সৈন্যদের মেরে ফেলেছিলেন। এই নালাটি পেরোতে গিয়েই আহত চৈতক পড়ে গিয়েছিল। সামনে চৈতকের সমাধি দেখা যাচ্ছে। ওখানেই প্রতাপ ও শক্তের মিলন হয়েছিল। নিজের ঘোড়াটি দাদাকে দিয়ে শক্ত খোরাসানীর ঘোড়ায় চেপে ফিরে গিয়েছিলেন সেলিমের শিবিরে।"

ম্যানেজার কর্নেল টড বর্ণিত কাহিনী বলে যাচ্ছে। সবাই তাই করেন। সত্য-মিথ্যে যা-ই হয়ে যাক্, টড এখনও রাজস্থানের সবচেয়ে জনপ্রিয় ঐতিহাসিক। কালিকারঞ্জন কানুনগো কিন্তু এ সম্পর্কে অন্য কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা বাল্যকাল হইতে যে-সমস্ত কথা অবিসংবাদী সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া আসিয়াছি—যথা, প্রতাপ ও শক্ত সিংহের বিরোধ, শক্ত সিংহের নির্বাসন, কুমার মানসিংহের অপমান, "খোরাসানী মূলতানিকা অগ্‌গল," বীর শক্ত সিংহ কর্তৃক প্রতাপের প্রাণ রক্ষা, ভীলদের আশ্রয়ে সপরিবারে প্রতাপের গিরিগুহায় বাস, দারিদ্র্য-পীড়িত ভগ্নহৃদয় প্রতাপের মেবার ত্যাগের সঙ্কল্প, চিতোর-উদ্ধারের জন্য প্রতাপের সন্ন্যাসব্রত ও শপথ ইত্যাদি—সেকালের ভাটচারণের কল্পনামূলক কাব্য নাটকের মনোরম শাখাপল্লব বলিয়া এখন আমাদের সন্দেহ হয়।...মহামতি টডের 'রাজস্থান' ভ্রমপূর্ণ হইতে পারে ; কিন্তু মহারাণা প্রতাপের বীরত্ব, স্বদেশাভিমান ও স্বাধীনতার উপাসনা সীমাহীন কল্পনাপ্রান্তরের সুদূর আলেয়া ভ্রান্তি নহে।'

তাই একটু হেসে আমি বলি, "পাঁচুবাবু, আধুনিক ঐতিহাসিকরা কিন্তু অন্য কথা বলেন।"

"কি বলেন ঘোষদা?"

"তাঁরা বলেন, শক্ত সিংহ হলদিঘাটে উপস্থিত ছিলেন না এবং হলদিঘাটের যুদ্ধের সময় সেলিম হয়তো ফতেপুর সিক্রির অন্দরমহলে কবুতর ওড়াচ্ছিলেন কারণ তখন তাঁর বয়স মাত্র ছ'বছর। আর মহারাণা প্রতাপের প্রিয় ঘোড়াটির নাম চৈতক নয়, চেটক।"

বাস থামতেই নেমে পড়ি। রাস্তার উল্টোদিকে দেওয়াল ঘেরা সুন্দর বাগিচা। একটা নালা পেরিয়ে যেতে হয়। প্রভুকে পিঠে নিয়ে এই নালা পেরোতে গিয়েই শ্রান্ত ও আহত চেটক অন্তিম আঘাত পেয়েছিল। এখন নালার ওপরে পুল তৈরি হয়েছে। সেই পুল পেরিয়ে আমরা বাগিচায় এলাম। বড় বড় গাছে ছাওয়া ছায়াশীতল কানন। তার পরেই একটি সুবিশাল জলাশয়। কাননের ঠিক মাঝখানে মন্দিরাকৃতি শ্বেতপাথরের সমাধি, পাশে আরেকটি মন্দির। দুই ধাপ বেদীর উপরে চারটি স্তম্ভ যুক্ত ছোট একটি দেওয়ালহীন সমাধি-মন্দির, শিখরটি গম্বুজাকৃতি। ছোট হলেও ভারি সুন্দর দেখতে।

শান্ত সুন্দর স্বর্গীয় পরিবেশ। বিশ্রাম নেবার আদর্শক্ষেত্র। তাই তো প্রতাপের প্রাণরক্ষক চেটক এখানে বিশ্রাম নিচ্ছে—শেষ বিশ্রাম। সেদিন নিজের প্রাণের বিনিময়েই সে তার প্রভুর প্রাণরক্ষা করেছিল। আর তারই ফলে মেবারের স্বাধীনতা রক্ষা পেয়েছিল। তাই কৃতজ্ঞ

মেবারবাসীরা তার এই সুন্দর সমাধি-মন্দিরটি নির্মাণ করেছেন। দূর-দূরান্ত থেকে শত-সহস্র ভারতবাসী এখানে এসে চেটকের প্রতি তাঁদের আন্তরিক শ্রদ্ধা জানিয়ে যাচ্ছেন। আমরাও সশ্রদ্ধ চিত্তে চেটকের অমর আত্মার শান্তি কামনা করি।

ম্যানেজার আধঘণ্টা বিশ্রাম মঞ্জুর করেছেন। সহযাত্রীরা গাছের ছায়ায় কিংবা হ্রদের তীরে অবকাশ যাপন করছেন। এই সুযোগে পুণ্যভূমি হলদিঘাটকে একটু ভাল করে দেখে নিলে হতো।

বলি, "আমি এগিয়ে যাচ্ছি, আপনারা আমাকে পথ থেকে বাসে তুলে নেবেন।"

বেরিয়ে আসি চেটকের সমাধিক্ষেত্র থেকে। ক্যামেরা কাঁধে এগিয়ে চলি চড়াই পথে—হলদিঘাটের দিকে। নির্জন পথ। এখানে যে ক্ষেত-খামারে ও লোকালয় কিছুই নেই। মাঝে মাঝে অবশ্য দুয়েকজন নারী-পুরুষের সঙ্গে দেখা হচ্ছে। মেয়েদের পরনে রঙিন ঘাঘরা, গায়ে রঙিন জামা, মাথায় রঙিন ওড়না। হাতে পায়ে কানে নাকে ও কোমরে ভারী ভারী রুপোর গয়না। ছেলেদের পরনে হাঁটুর ওপরে তোলা 'ধোঁচার' বা ধুতি, গায়ে রঙিন কুর্তা, মাথায় লেইরিয়া বা পাগড়ি। কানে সোনার লোঙ, অনেকটা দুলের মতো। তার ঠিক মাঝখানে এক টুকরো উজ্জ্বল পাথর। সবারই মাথায় বোঝা। কেনাকাটা করতে চলেছে।

অবশেষে মহারাণার শিবিরক্ষেত্র ছাড়িয়ে এসে পৌঁছই সেই সংকীর্ণ গিরিসঙ্কটের ওপরে। মাইল আধেক লম্বা ও প্রায় সমতল পথ। পথের দুপাশে কাঁটাগাছ আর ঝোপঝাড়ে ছাওয়া সামান্য উঁচু দুটি পাহাড়।

ধূলিময় পথ—হলুদ রঙের ধূলি। পথের নয়, পুণ্যতীর্থের ধূলি। তাড়াতাড়ি খানিকটা ধূলি তুলে মাথায় দিই। এই পথের বুকেই সেদিন স্বাধীনতা রক্ষার জন্য বুক পেতে দিয়েছিলেন হাজার হাজার রাজপুত। আজও এর ধূলিকণায় মিশে আছে সেই সব শহিদের রক্ত।

সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মহারাণা প্রতাপের সেই প্রথম সংগ্রামের কথা মনে পড়ছে আমার। মনে পড়ছে রাজপুত স্বাধীনতার শ্রেষ্ঠ পূজারী প্রতাপ সিংহের মহাজীবনের কথা—

১৫৪০ খ্রীস্টাব্দের ৯ই মে মহারাণা প্রতাপের জন্ম হয়। জীবনের প্রথম বত্রিশ বছরে অর্থাৎ উদয় সিংহের জীবিতকালে তিনি কিন্তু তেমন কোন বীরত্ব বা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিতে পারেন নি। এই সময়ে তাঁর জীবনের উল্লেখযোগ্য ঘটনা বলতে ইডরের রাও নারায়ণদাস রাঠোরের মেয়ের সঙ্গে বিবাহ এবং প্রথমপুত্র অমর সিংহের জন্ম।

১৫৭২ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি উদয়সিংহ মারা যান। তিনি ছোটরাণীর প্রতি অত্যন্ত বেশি আসক্ত ছিলেন বলে বড়রাণীর বড় ছেলে প্রতাপকে অবজ্ঞা করতেন। উদয় ছোটরাণীর ছেলে জগমালকেই উত্তরাধিকারী নির্বাচিত করে গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে মেবারের সর্দাররা প্রতাপ সিংহকেই গদিতে বসালেন।

সিংহাসনে বসবার মাত্র চার বছর পরেই আকবরের আদেশে মানসিংহ পাঁচ হাজার সৈন্য ও কয়েকটি হাতি নিয়ে মেবার আক্রমণ করলেন। মীরবক্শী আসফ খাঁ নামে একজন সেনাপতি মানসিংহের সহকারী নিযুক্ত হলেন।

মানসিংহ খমনোর ও হলদিঘাটের মাঝামাঝি বনাস নদীর তীরে শিবির প্রতিষ্ঠা করলেন আর প্রতাপ মাইল দুয়েক দূরে পাহাড়ের আড়ালে মোগল আক্রমণের অপেক্ষায় রইলেন।

প্রতাপের ছিল মাত্র তিন হাজার অশ্বারোহী সৈন্য।

১৫৭৬ সালের ১৮ই জুন এখানে, এই হলদিঘাট গিরিপথের ওপরে সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত দু-দলে প্রবল যুদ্ধ হয়েছিল। যুদ্ধে প্রতাপ পরাজিত হলেও এতে মোগলপক্ষই বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হলো।

মোল্লা আবদুল কাদের বদয়ুনী নামে মোগল পক্ষের জনৈক প্রত্যক্ষদর্শী এই প্রসঙ্গে লিখেছেন 'যুদ্ধের পর মোগল-সৈন্য অত্যন্ত ক্লান্ত এবং শত্রুর পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে অসমর্থ হইয়া পড়িয়াছিল ; অধিকন্তু রাণার আক্রমণের ভয়ে বিজেতাদের সোয়াস্তি ছিল না।'

কর্নেল টড হলদিঘাটের যুদ্ধকে লিওনিদাস-য়ের (Leonidas) থার্মোপিলি (Thermopylae) যুদ্ধের সঙ্গে তুলনা করেছেন। থার্মোপিলি ৬ কিলোমিটার দীর্ঘ মধ্য গ্রীসের একটি সঙ্কীর্ণ গিরিপথ। খ্রীস্টপূর্ব ৪৮০ অব্দে স্পার্টার রাজা নিওনিদাস ছোট একটি গ্রীস সেনাদলের সাহায্যে সেখানে পারস্যের এক বিরাট সেনাবাহিনীকে তিন দিন আটকে রেখেছিলেন।

সুতরাং হলদিঘাটের যুদ্ধে মহারাণা প্রতাপ সিংহ পরাজিত হয়েছিলেন, এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া অর্থহীন। প্রতাপ বৃহত্তর স্বার্থের প্রয়োজনে হলদিঘাট থেকে সাফল্যের সঙ্গে পশ্চাদপসরণ করেছিলেন মাত্র।

এই যুদ্ধের পরে প্রতাপ ঠিক করলেন যে তিনি আর কখনও মোগল সৈন্যদের সঙ্গে সামনা-সামনি যুদ্ধ করবেন না। তাই তিনি পার্বত্য প্রদেশে আশ্রয় নিলেন। আরাবল্লীর প্রতিটি গিরিশিখরকে ছোট ছোট দুর্গে পরিণত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন।

হলদিঘাটের যুদ্ধের পরদিন মান সিংহ প্রতাপ পরিত্যক্ত গোগুন্দা শহর দখল করেন। কিন্তু তারপরেই প্রতাপের ঝটিকা আক্রমণে মোগলবাহিনী সেখানে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েন। শুধু আম আর মাংস খেয়ে তাঁদের দিন কাটাতে হয়।

হলদিঘাটের যুদ্ধে জেতার পরেও মেবার পদানত হয় নি শুনে আকবর খুবই বিরক্ত হলেন। ১৫৭৬ সালের অক্টোবর মাসে তিনি আজমীর থেকে গোগুন্দা এলেন। প্রতাপকে বন্দী করার জন্য কুতবউদ্দিন খাঁ, রাজা ভগবানদাস ও কুমার মান সিংহকে নিয়োজিত করলেন। আরাবল্লীর বাঁকে বাঁকে মোগল ও শিশোদিয়ার সংগ্রাম শুরু হলো। কিন্তু প্রতাপকে বন্দী করা তো দূরের কথা, তাঁর গুপ্ত আক্রমণে মোগল সেনাপতিরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলেন। শেষে তাঁরা উদয়পুর ও গোগুন্দার পাট গুটিয়ে চলে যেতে বাধ্য হলেন।

এক বছরে তিনবার অভিযান চালিয়েও প্রতাপকে বন্দী না করতে পারায় সম্রাট যেমন তার সেনাপতিদের প্রতি ক্রুদ্ধ হলেন, তেমনি প্রতাপ সিংহকে তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তারের প্রধান অন্তরায় বলে মনে করতে থাকলেন।

কিন্তু আশাবাদী আকবর নিরাশ হলেন না। পরের বছর (১৫৭৭ খ্রীঃ) সেপ্টেম্বর মাসে বিরাট এক সেনাবাহিনী দিয়ে শাহবাজ খাঁকে কুম্ভলমীর দুর্গ জয় করতে পাঠালেন। কারণ প্রতাপ তখন সেই দুর্গে বাস করছিলেন।

অসংখ্য মোগল সৈন্যের প্রাণের বিনিময়ে শাহবাজ কুম্ভলমীর দুর্গ অধিকার করলেন বটে কিন্তু প্রতাপকে বন্দী করতে পারলেন না। ক্রুদ্ধ শাহবাজ উদয়পুর ও গোগুন্দা ছারখার করলেন। প্রতাপ তবু বশ্যতা স্বীকার করলেন না। রণক্লান্ত শাহবাজ অবশেষে নিরাশ হৃদয়ে মেবার ত্যাগ

করলেন।

শাহবাজ চলে যাবার পরেই প্রতাপ পাহাড়ী ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে এসে আবার অধিকাংশ জায়গা দখল করে নিলেন।

১৫৭৮ সালের ডিসেম্বর মাসে শাহবাজ আবার মেবার আক্রমণ করলেন। কিন্তু চারমাস ধরে বহু চেষ্টা করেও তিনি প্রতাপকে বন্দী করতে পারলেন না।

তারপরে পাঁচ বছর আকবর মেবারে কোন বড় অভিযান চালাতে পারেন নি। কিন্তু তিনি তখনও মেবার জয়ের আশা মন থেকে মুছে ফেলেন নি। তাই ১৫৮৪ সালে তিনি জগন্নাথ কচ্ছবাহের নেতৃত্বে এক বিশাল সেনাবাহিনীকে মেবার জয় করতে পাঠালেন। সম্রাট এবারেও প্রতাপ সিংহকে বন্দী করে দিল্লী নিয়ে যাবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।

বলা বাহুল্য জগন্নাথের পক্ষে সম্রাটের সে নির্দেশ কার্যকর করা সম্ভবপর হয় নি। দু-বছর ধরে যাথাসাধ্য চেষ্টা করেও জগন্নাথ মহারাণাকে বন্দী করতে পারেন নি। তিনিও ব্যর্থতার ডালি বহন করে করে একদিন নতমস্তকে সম্রাটের কাছে ফিরে গিয়েছিলেন।

জগন্নাথ চলে যাবার এক বছরের মধ্যে (১৫৮৬ খ্রীঃ) প্রতাপ চিতোর ও মাণ্ডলগড় ছাড়া সমগ্র মেবার অধিকার করে নিলেন। এবং সম্ভবত ততদিনে বিচক্ষণ আকবর বুঝতে পেরেছিলেন যে মেবার অজেয়, মহারাণা প্রতাপ সিংহ অপরাজেয়। তাই প্রতাপের জীবদ্দশায় তিনি মেবার আর কোন অভিযান পাঠান নি। ফলে জীবনের শেষ এগারো বছর মহারাণা মোটামুটি শান্তিতেই রাজত্ব করেছেন।

প্রতাপ প্রায় সারাজীবন যুদ্ধ করেছেন কিন্তু তাঁর গায়ে কোন অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন ছিল না। মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি বাঘ শিকারের জন্য ধনুতে গুণ পরাতে গিয়ে তলপেটে ও অন্ত্রে আঘাত পান। কিছুদিন কষ্ট পাবার পরে ১৫৯৬ সালের ১৯শে জানুয়ারি ছাপ্পান্ন বছর বয়সে তিনি ইহলোক ত্যাগ করেন। চাবণ্ড থেকে মাইল দেড়েক দূরে বণ্ডোলী গ্রামের কাছে একটি নদীর তীরে ভারতের এই মহাবীরের নশ্বর দেহ পঞ্চভূতে মিলিত হয়।

হলদিঘাটে দাঁড়িয়ে মহারাণা প্রতাপ সিংহের কর্মময় জীবনের কথা ভাবতে গিয়ে আজ আমার বার বার শ্রদ্ধেয় কালিকারঞ্জন কানুনগোর সেই কথাগুলো মনে পড়ছে। তিনি তাঁর 'রাজস্থান-কাহিনী' বইতে লিখেছেন—

'মহারাণার দুর্জয় সঙ্কল্পের সম্মুখে আকবরের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল, মেবার-স্বাধীনতার অনির্বাণ প্রদীপ আরাবল্লী শিখরে জ্বলন্ত রাখিয়া প্রতাপ বীরব্রত উদযাপন করিয়া গেলেন। মহারাণা প্রতাপের ত্যাগ ও বীরত্বে মেবারের নৈতিক প্রভাব সমস্ত রাজপুতানায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বাবরের হাতে পরাজিত হইয়া মহারাণা সংগ্রামসিংহ রাজপুতনার যে রাষ্ট্রীয় সার্বভৌমত্ব হারাইয়াছিলেন। পঁচিশ বৎসর ভারত সম্রাট আকবরের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা রক্ষা করাতে মেবারের সেই প্রনষ্ট অধিরাজত্ব রাজপুত জাতির মনের উপর পুনঃ-প্রতিষ্ঠিত হইল। সপ্তদশ শতাব্দীতে যে বিরাট হিন্দু-জাগরণ মোগল-সাম্রাজ্যকে ধূলিসাৎ করিয়াছিল উহার মূলে প্রতাপের মহান আদর্শের প্রেরণা কম ছিল না। প্রতাপ না জন্মিলে মেবারে মহারাণা রাজসিংহ জন্মিতেন কি-না সন্দেহ। রাজসিংহ না থাকিলে মেবার ও মাড়বারে আওরঙ্গজেবের প্রচণ্ড নীতি প্রতিহত হইত না।'

।। চোদ্দ ।।

একলিঙ্গজী মন্দিরের সামনে এসে বাস থামল। হলদিঘাট থেকে রওনা হয়ে একটানা ঘণ্টাখানেক চলে আমরা কৈলাসপুরীতে পৌঁছলাম।

কৈলাসপুরী! হ্যাঁ, মেবারের মহারাণাদের গৃহদেবতা মঙ্গলময় মহাদেব একলিঙ্গজী রূপে বাস করছেন এখানে। তাই পাহাড়ে ঘেরা এই রমণীয় উপত্যকাটির নাম কৈলাসপুরী। বাপ্পা রাওয়ালের আমল থেকেই গিরওয়া তহশিলের এই ঝরনা-বিধৌত সবুজ গ্রামটি জগৎসংহর্তা বিশ্বেশ্বরের বাসভূমি রূপে সমাদৃত। মহারাণারা যে কোন যুদ্ধযাত্রার আগে এখানে এসে একলিঙ্গরূপী মহেশ্বরের আশীর্বাদ নিয়ে যেতেন। আমরা এখন সেই পরমতীর্থে উপস্থিত হয়েছি।

এখান থেকে উদয়পুরে ২২ কিলোমিটার দক্ষিণে। তার মানে আমরা হলদিঘাট থেকে ৪৪ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছি।

পথের পাশেই সুদৃশ্য মন্দির। ঠাকুরমারা চলেছেন সবার আগে আগে। আমরা তাঁদের অনুসরণ করি। তাঁরা হলদিঘাটে বাস থেকেই নামতে চাইছিলেন না। আর এখানে বাস থামামাত্র নেমে পড়েছেন, সবার আগে এগিয়ে গিয়েছেন। এখানে যে মন্দির রয়েছে।

মন্দির তোরণের সামনে এসে উকিলবাবু সিগারেট ধরালেন। স্ত্রীকে বললেন, "তুমি ভেতরে গিয়ে দেখে এসো, আমি এখানে রয়েছি।"

উকিলবাবু ঠাকুরমাদের ঠিক উল্টো। তিনি তীর্থযাত্রায় এসেও তীর্থদর্শন করছেন না। অথচ ঐতিহাসিক স্থানগুলি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছেন তাঁর এ আচরণ বিস্ময়কর। কারণ, শুনেছি উকিল-মোক্তারদের দেব-দ্বিজে একটু বেশি ভক্তি থাকে। থাকাই স্বাভাবিক, মামলায় হার-জিতের ওপর যে তাঁদের পসার নির্ভর করে। আর তাঁরা এবং তাঁদের মক্কেলরা কিঞ্চিৎ ধার্মিক বলেই প্রতি আদালতে গজিয়ে উঠতে পেরেছে হাইকোর্টেশ্বরের মতো একাধিক মন্দির।

একলিঙ্গজী মন্দিরের চারিদিকে পাথরের পাঁচিল—বেশ উঁচু পাঁচিল। লোহার দরজা। প্রয়োজনেই তৈরি করতে হয়েছিল। হিন্দু মন্দির ধ্বংস করাই যে সেকালে মুসলমান ধর্ম প্রসারের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রক্রিয়া বলে বিবেচিত হতো। ধর্মের নামে জগতে যত অধর্ম হয়েছে, তেমনটি আর কিছুতে হয় নি। তাই দেবালয়কে দুর্গে রূপান্তরিত করতে হয়েছে।

তোরণটি তেমন বড় নয়, কিন্তু ভারি সুন্দর ও মজবুত। পাথরের তোরণ। তার সারা গায়ে খোদাই কাজ। সামনে দুদিকে দুখানি শ্বেতপাথরের শিলালিপি—একখানি হিন্দী ও একখানি ইংরেজী। ইংরেজীতে লেখা।

'SHRI EKLINGJI PRABHU
Personal Deity Temple
of
'Aryakul Kamal Diwakar
Hindu Surya Medpateswar
Maharana of Mewar
Vikram Sambat 791 (734 A. D.)'

তোরণ পেরিয়ে ভেতরে আসি। এটি মন্দিরের বহিরাঙ্গন। লাল ও কালো পাথর বাঁধানো মসৃণ ও সুন্দর আঙ্গিনা। কয়েক পা হেঁটে আরেকটি তোরণের সামনে আসি। কাঠের দরজাযুক্ত

মজবুত ও সুশ্রী তোরণ।

তোরণের পরে শ্বেত ও কালো মর্মর-পাথরের আরেকটি চমৎকার উঠান। উঠানের চারিপাশেই ছোট ছোট মন্দির। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষ্ণুর উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত মীরাবাঈয়ের মন্দিরটি।

উঠানের ঠিক মাঝখানে রাণা রাজবংশের আদিপুরুষ বাপ্পা রাওয়ালের দণ্ডায়মান মূর্তি। তিনি হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রয়েছেন। কথিত আছে বাপ্পাই নাকি অষ্টম শতাব্দীতে প্রথম এখানে মন্দির নির্মাণ করেন। বলা-বাহুল্য পরধর্মদ্বেষীদের কবলে পড়ে সে মন্দির বহুকাল আগেই ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। সেই একই জায়গাই বর্তমান কাঠামোতে প্রথম মন্দির তৈরি করেন মহারাণা রায়মল (১৪৭৩—১৫০৯ খ্রীঃ)। তারপরে যুগে যুগে সে মন্দিরের সংস্কার সাধিত হয়েছে।

বাপ্পার পেছনে পাথরের বেদির ওপরে শিব-বাহন নন্দীর মূর্তি। কষ্টিপাথরের ভারি সুন্দর মূর্তি। হিমাচল-কৈলাস গিরিতীর্থ-মণিমহেশে যাবার পথে চাম্বার প্রাচীন রাজধানী ভারমৌর ছাড়া এমন সুন্দর নন্দীমূর্তি আর কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ছে না আমার।

নন্দীমূর্তি দর্শন করে এগিয়ে চলি মন্দিরের দিকে। কয়েক ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে মন্দিরে উঠতে হবে। সিঁড়ির দুপাশে দুটি হাতীর মূর্তি।

সম্পূর্ণ মন্দিরটি শ্বেতপাথরের তৈরি। গড়নেরও একটা বিশেষত্ব রয়েছে। সাধারণত হিন্দু মন্দির যেমন হয়, ঠিক তেমনটি নয়। দু-তলা মন্দির। ওপরের দিকটা পিরামিডের মতো। শিখর উঁচু এবং মহিমান্বিত। প্রচুর পরিশ্রম করে নির্মিত।

ওপরে উঠে প্রথমেই নাট-মন্দির। এমন প্রাচুর্যপূর্ণ মনোরম মন্দির খুব কমই দেখেছি। বুঝতে পারছি মেবারের মহারাণারা তাঁদের গৃহদেবতার মন্দিরকে আকর্ষণীয় করে তুলতে কোন কার্পণ্য করেন নি।

চৌকোনা নাট-মন্দির। কয়েকসারি কারুকার্যখচিত চৌকো স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে তার কারুকার্যময় গম্বুজাকৃতি সুউচ্চ সিলিং।

গর্ভ-মন্দিরের সামনে রুপোর পাতে মোড়া রেলিং, তার সারাগায়ে অপরূপ খোদাই কাজ। কবাটজোড়াও রুপোর পাতে আচ্ছাদিত। রুপোর একটি ঘণ্টা ঝুলছে দরজার সামনে।

মন্দিরের মধ্যস্থলে কষ্টিপাথরের—বেশ বড় লিঙ্গমূর্তি 'শিবলিঙ্গ'। মাঝখানে চারিপাশে চারটি শিবের মুখ খোদিত। ওপরে সোনার ছত্র ও কলস। কলসী থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে জল পড়ছে শিবের মাথায়।

আমাদের ভাগ্য ভাল বলতে হবে, পুজোর সময় মন্দিরে এসেছি। প্রণাম করে সারি বেঁধে দাঁড়াই। শ্রদ্ধাবনত চিত্তে দেবাদিদেব মহাদেবের মহা পূজা দেখতে থাকি।

সহসা সানাই বেজে উঠল, বেজে উঠল কাঁসর ও ঘণ্টা। পূজারী প্রদীপ হাতে উঠে দাঁড়ালেন। শুরু হলো আরতি—পশুপতিনাথের আরতি।

আমি অপলক নয়নে মঙ্গলময় মৃত্যুঞ্জয় ত্রিলোচন মহেশ্বরের কাছে শ্রী ও মানসীর কল্যাণ কামনা করি। বিরুপাক্ষ ব্যোমকেশকে বলি—ঠাকুর তুমি মানসীকে শান্তি দাও আর শ্রীকে সুস্থ করে তোলো। আজ উদয়পুরে গিয়ে যেন দেখতে পাই—তার জ্বর কমে গিয়েছে। সে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে উঠেছে।

আরতি শেষ করে পূজারী আমাদের গায়ে আবির ছিটিয়ে দিলেন। তারপরে প্রসাদ ও

চরণামৃত বিতরণ করলেন।

পূজারীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বেরিয়ে আসি মন্দির থেকে। মনে মনে তাঁর কথাই ভাবতে ভাবতে পথ চলি। বাপ্পার আমল থেকেই মেবারের মহারাণা এই মন্দিরের দেওয়ান। তিনি যোগ্যতা বিচার করে পূজারী নিয়োগ করেন। একলিঙ্গজীর প্রধান পুরোহিত উদয়পুরের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। কেবল মহারাণা দর্শন করতে এলে তিনি বেকার হয়ে পড়েন। কারণ তখন মহারাণা নিজেই একলিঙ্গজীর সেবা-পূজা করেন। সাধারণত শিবরাত্রির সময় রাণা সপরিবারে এখানে আসেন। তখন বেশ বড় মেলা হয়। অন্তত হাজার পনেরো মানুষ আসেন এখানে।

সহযাত্রীদের সঙ্গে বেরিয়ে আসি পথে। পথ চলতে চলতে শঙ্করী জিজ্ঞেস করে, "ঘোষদা, এখানে নাকি সুন্দর একটা লেক আছে?"

"হ্যাঁ কাছেই।"

"আমরা দেখতে যাবো না মামু?" বিউটি প্রশ্ন করে।

"না।" ম্যানেজার পেছন থেকে উত্তর দেন, "দেড়টা বাজে। আর দেরি করা উচিত হবে না। তাছাড়া তোমরা উদয়পুরে অনেক ভাল লেক দেখতে পাবে।"

আমি চুপ করে থাকি। জানি সময়াভাবের জন্য অনেক কিছুই অদেখা রয়ে গেল। আমরা যেতে পারলাম না নাগদা। এখান থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার। সেখানে মেবারের প্রাচীনতম রাজপ্রাসাদের ভগ্নাবশেষ রয়েছে। রয়েছে খ্রীস্টীয় একাদশ শতকে নির্মিত দুটি মন্দিরের কিছু কারুকার্যময় নিদর্শন। বলা বাহুল্য মুসলমান আক্রমণেই সে প্রাসাদ ধ্বংস হয়েছে।

সুতরাং হ্রদ অদর্শনের জন্য অনুশোচনা না করে, সহযাত্রীদের সঙ্গে এসে বাসে উঠি। বাস এগিয়ে চলে উদয়পুরের পথে।

"মামু মামু! ঐ দেখুন ময়ূর।"

বিউটির ডাক শুনে পাশে তাকাই। সে ঠিকই বলেছে, পথের পাশে গাছের শাখায় ময়ূরের মেলা বসেছে। আমরা দেখি, দু-চোখ ভরে সেই সুন্দরী শিল্পীদের দর্শন করি। তারপরেই মনে পড়ে ওর কথা—শ্রীর কথা। এত ময়ূর একসঙ্গে দেখতে পেলে সে না জানি কতই খুশি হতো।

বাস এগিয়ে চলেছে। কিছুক্ষণ বাদেই আমরা উদয়পুরে পৌঁছব। পূর্ণিমা অনেকক্ষণ আগেই অসুস্থ শ্রীকে নিয়ে পৌঁছে গিয়েছে উদয়পুর সিটি রেলস্টেশনে।

শ্রী এখন কেমন আছে? তার জ্বর কমেছে কি? নিশ্চয়ই কমেছে। মা-সাবিত্রী দয়া না করতে পারেন কিন্তু ভোলানাথ? তিনি তো শুনেছি কখনও কারও প্রার্থনা অপূর্ণ রাখেন না। আমি যে একলিঙ্গজীর কাছে শ্রীর আশু আরোগ্য কামনা করেছি।

সহসা ম্যানেজার গিয়ে ড্রাইভারের পেছনে দাঁড়ায়। নিশ্চয়ই কিছু বলবে। আমরা তার দিকে তাকাই। পাঁচুবাবু বলতে শুরু করে, "মা ঠাকুরমা দিদিমা পিসিমা মাসিমা, জেঠা কাকা ও দাদা এবং দিদিরা! কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা ভারতের সবচেয়ে 'রোমান্টিক সিটি' উদয়পুরে পৌঁছব। উদয়পুরকে বলা হয় স্বপ্নপুরী ও সূর্যোদয়ের শহর। বলা হয় 'Venice of the East' সম্ভবত ১৫৫৯ খ্রীস্টাব্দে রাণা উদয় সিংহ এই শহরের পত্তন করেছিলেন। ১৫৬৭ সালে আকবরের চিতোর আক্রমণের পরে তিনি এখানে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। উদয় সিংহকে মেবারের মানুষ যতই অপদার্থ বলুক, আমরা কিন্তু উদয়পুর প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁকে ধন্যবাদ না

দিয়ে পারব না।...”

“এক মিনিট ম্যানেজারবাবু!” শঙ্করীর কথায় থামতে হয় পাঁচুবাবুকে। শঙ্করী আমার দিকে ফিরে গম্ভীর স্বরে বলে, “ঘোষদা, চট করে উদয়পুরের অবস্থান, আয়তন ও জনসংখ্যাটা বলে দিন তো!”

প্রতিবাদ করে লাভ নেই, সহযাত্রীরা সবাই তাকিয়ে রয়েছেন আমার দিকে সুতরাং শুরু করি, “২৪°৩৫´ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৭৩°৪২´ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত এই নগরী। ১৯৭১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী শহরের আয়তন ৫৯.২১ বর্গ কিলোমিটার। ৩১,৫০২টি বাড়িতে ৩২,৪৭৮টি পরিবার বাস করেন। মোট জনসংখ্যা ১,৬১,২৭৮ জন।”

“তাঁদের মধ্যে কতজন নারী ও কতজন পুরুষ?” আমি থামতেই বৌদি প্রশ্ন ছোড়েন।

হেসে বলি, “১৯৭১ সালের জনগণনা অনুযায়ী উদয়পুরে ৮৭,৪৪১ জন পুরুষ এবং ৭৩,৮৩৭ জন নারী বাস করেন।”

“থ্যাঙ্ক ইউ ঘোষ, এবারে ম্যানেজার বল দেখি কি বলছিলে?” দাদা বলেন।

ম্যানেজার শুরু করে, “আরাবল্লীর একটি নিচু গিরিশিরার ঢালে এই শহরটি অবস্থিত। উচ্চতা সমুদ্রসমতা থেকে ৫৭৭ মিটার। গিরিশিরাটির শিখরে রাণা রাজপ্রাসাদ—উদয়পুরের রাজমুকুট। প্রাসাদের অলিন্দ থেকে উদয়পুরের দৃশ্য যেমন মনোমুগ্ধকর, তাকে তেমনি মনোরম দেখায় পিচোলা হ্রদের বাঁধের ওপর থেকে।”

“পিচোলা কি কৃত্রিম হ্রদ?” ম্যানেজার থামতেই বিউটি জিজ্ঞেস করে।

হ্যাঁ।” ম্যানেজার বলে, “চতুর্দশ শতাব্দীতে একটি বাঁধ দিয়ে এই হ্রদটি প্রথম সৃষ্টি হয়েছিল। তারপরে উদয় সিংহ সেই বাঁধকে আরও উঁচু করেছেন।”

“হ্রদের আয়তন কত?” সাহাবাবু প্রশ্ন করেন।

“১০ বর্গকিলোমিটারের মতো।” একবার থেমে ম্যানেজার আবার বলে “এই হ্রদেরই পুবদিকে মহারাণা সজ্জন সিংহ স্থাপিত খাস ওদি।”

সেটা আবার কি?” দাদা প্রশ্ন করেন।

“রাজকীয় শুটিং বকস্। ওখানে আপনারা সজ্জন নিবাস গার্ডেন থেকে মোটরে চড়েও যেতে পারেন আবার মোটরবোটে করেও যেতে পারেন।”

“আমরা যাবো না।” আমি মাঝখান থেকে বলি উঠি।

সবাই আমার দিকে তাকান। শঙ্করী জিজ্ঞেস করে “কেন যাবো না ঘোষদা?”

“যাবো না কারণ শুটিং বক্সের শুটিং বলতে পাখি শিকার বোঝায়, যে নৃশংসতার প্রতিবাদ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ উদয়পুর হ্রদ দর্শন করেন নি।”

“ঘটনাটা একটু খুলে বলুন না মামু?” আমার কলেজে পড়া ষোড়শী ভাগনী রীতিমত কৌতূহলী হয়ে উঠেছে।

অতএব বলতে হয়, “রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন হ্রদনগরী উদয়পুর দেখতে। কর্তৃপক্ষ তাঁকে হ্রদ দেখাতে নিয়ে গেলেন। হ্রদের তীর দিয়ে যাবার সময় সহসা কবির নজর পড়ল একটি প্রস্তর ফলকের দিকে। দেখলেন কোন্ বড়লাট কবে উদয়পুর হ্রদে কত-হাজার জলচর পাখি মেরেছেন, তার হিসেব রয়েছে সেই শিলালিপিতে। বড়লাটদের সেই অসাধারণ কীর্তির প্রশস্তি মহাকবির প্রশস্ত বুকে শেলের মতো আঘাত করল। হ্রদ দর্শন অসমাপ্ত রেখেই রবীন্দ্রনাথ

উদয়পুর থেকে ফিরে গেলেন।"*

"শাব্বাশ! এই না হলে কলির বাল্মীকি।" দাদা উচ্ছ্বসিত।

ম্যানেজার আবার বলতে শুরু করেন, "পিচোলা হ্রদের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় একটি বনময় পাহাড়ী দ্বীপ আছে। মহারাণা দ্বিতীয় জগৎ সিংহ ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দে সেখানেই নির্মাণ করেছেন জগ-নিবাস প্রাসাদ। এই গ্রানাইট এবং মার্বেল পাথরের প্রাসাদটি প্রায় ১·৬ হেক্টর জায়গা জুড়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। প্রাসাদে অনেকগুলি স্বয়ংসম্পূর্ণ কক্ষ ও দরবার গৃহ রয়েছে। রয়েছে ফোয়ারা এবং বাগান। বড়ীমহল, খাসমহল, দিলারাম, সজ্জন-নিবাস ও চন্দ্র-প্রকাশ প্রভৃতি একে ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীপ-প্রাসাদে পরিণত করেছে। এটি এখন 'লেক প্যালেস' হোটেল।"

"আচ্ছা জগ-মন্দিরটা কি ঐ একই দ্বীপে?" উকিলবাবু বই দেখে প্রশ্ন করেন।

"না।" ম্যানেজার উত্তর দেয়, "জগ-মন্দিরও পিচোলা হ্রদের আরেকটি দ্বীপ-প্রাসাদ। সেটি হ্রদের দক্ষিণ সীমায় অবস্থিত। ১৬১৫ সালে মহারাণা প্রথম অমর সিংহ ঐ প্রাসাদ তৈরি করতে আরম্ভ করেন। শেষ করেন মহারাণা করণ সিংহ ১৬২২ সালে। কিন্তু তাঁর ছেলে মহারাণা প্রথম জগৎ সিংহ সামান্য কিছু সংস্কার সাধন করে নিজের নামে প্রাসাদটির নাম রাখেন জগমন্দির। হ্রদের তীরভূমি থেকে জগ-মন্দির ৮০০ ফুট ওপরে অবস্থিত। ওখানে একটি চমৎকার ফল ও ফুলের বাগান আছে। আছে একখানি পাথর থেকে তৈরি এক আশ্চর্য-সুন্দর সিংহাসন।"

"সম্রাট শাহজাহান নাকি ঐ প্রাসাদে বাস করে গিয়েছেন?" ম্যানেজার থামতেই সামন্তবাবু প্রশ্ন করেন। তিনিও গাইড বুক কিনেছেন।

"হ্যাঁ।" ম্যানেজার উত্তর দেন। বলেন, "সম্রাট তখন যুবরাজ খুরম্। বাবার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তিনি এসে আশ্রয় নিয়েছিলেন ওখানে। মহারাণা অবশ্য তাঁকে একটি হলুদ বেলেপাথর ও শ্বেতপাথরের বাসগৃহ বানিয়ে দিয়েছিলেন। ফার্গুসান এই ঘরখানিকে ভারতের সবচেয়ে সুন্দর কক্ষ বলে বর্ণনা করেছেন। তাজমহল নির্মাণের সময় শাহজাহান নাকি এই কক্ষটির স্থাপত্যকলার কথা সর্বদা স্মরণ করতেন।"

ম্যানেজার থামতেই উকিলবাবু বলে ওঠেন, "এই দ্বীপ প্রাসাদ দুটি সম্পর্কে ফার্গুসান বলেছেন..." তিনি হাতের বই থেকে পড়তে শুরু করেন, 'Of these two islands Fergusson writes that the only objects in Europe that can be compared with them, are the Borromean Islands in the Lago Maggiore, but I need scarcely say their Indian rivals lose nothing by the comparison ; they are as superior to them as the Duomo at Milan is to Buckingham Palace. Indeed, I know nothing that will bear comparison with them any where.'

ফতেপুরা ছাড়িয়ে এগিয়ে চলেছে বাস। এটি উদয়পুর শহরের শহরতলি। সহেলীয়াঁ কি-বাড়ি ডানদিকে ও পঞ্চবটীকে বাঁদিকে রেখে বাস এগিয়ে চলল। হাসপাতাল রোড পেরিয়ে হাতিপোল দিয়ে আমরা শহরে ঢুকলাম—উদয়পুর শহরে। রাজস্থানী ছ'টি বড় শহরের অন্যতম

* অনেকের মতে এই ঘটনাটি উদয়পুরের নয়, ঘটেছিল ভরতপুরে।

এই নগরী ভারতের একটি সবচেয়ে সুন্দর শহর। ১৯২১ সালে ইংলন্ডের প্রিন্স অব্ ওয়েলস উদয়পুর দেখে বলেছিলেন—'There is nothing between Madras and northern passes quite like Udaipur.'

হাতিপোল এই প্রচীর পরিবেষ্টিত নগরীর চারটি প্রধান তোরণের একটি। এটি উত্তর দ্বার। অপর তিনটি হলো—পূর্বে সূরযপোল, পশ্চিমে ব্রহ্মাপোল ও দক্ষিণে কৃষ্ণপোল।

হাতিপোল রোড ধরে খানিকটা দক্ষিণ-পশ্চিমে এগিয়ে আমরা এখন পুবদিকে চলেছি। পুবেই যেতে হবে। এ যাত্রার আমাদের 'কেয়ার অব্' রেলস্টেশন। স্টেশনটি শহরের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত।

না, আবার ডাইনে অর্থাৎ দক্ষিণে বাঁকতে হলো। টাউন-হলকে বাঁয়ে রেখে এগিয়ে চলেছে বাস। খানিকটা এগিয়েই কিন্তু আবার বাঁয়ে মোড় ফিরে পূবদিকে চলতে শুরু করল।

ম্যানেজার ভরসা দেয়, "প্রায় এসে গেছি, স্টেশন রোড শুরু হয়ে গিয়েছে। আর খুব বেশি হলে দু-কিলোমিটার। ঐ তো ডানদিকে রেল লাইন দেখা যাচ্ছে। বাঁয়ে একটু বাদেই পড়বে এ্যাগ্রিকালচার‍্যাল কলেজ ও মহারাণা ভূপাল কলেজ। তারপরেই অহর নদী পেরিয়ে রেলস্টেশন।"

"আচ্ছা মামু, উদয়পুর জেলার তো পিচোলা ছাড়া আরও অনেক হ্রদ আছে?"

"হ্যাঁ ফতেসাগর, রাজসামান্দা, উদয়সাগর, জয়সামান্দা বা ধেবর হ্রদ প্রভৃতি।"

"সবচেয়ে বড় কোন্‌টি?" শঙ্করী জিজ্ঞেস করে।

উত্তর দিই, "ধেবর হ্রদ। এটি বিশ্বের বৃহত্তম কৃত্রিম হ্রদগুলির অন্যতম। ১৪ কিলোমিটার লম্বা এবং ৯·৬ কিলোমিটার চওড়া। পরিধি প্রায় ৪৮ কিলোমিটার মতো।"

"উদয়পুর থেকে দূরত্ব কত?" বৌদি জিজ্ঞেস করেন।

হেসে বলি, "কেন যাবেন নাকি?"

"না। এমনি জিজ্ঞেস করলাম আর কি।"

"উদয়পুরের ৫১ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত এই হ্রদ। এই বাঁধটির দৈর্ঘ্য ৩৬৬ মিটার এবং প্রস্থ ৩৫ মিটার। ১৬৮৫ থেকে ১৬৯১ সাল, এই ছ'বছর ধরে মহারাণা জয় সিংহ এটি নির্মাণ করেন।"

স্টেশনে ঢুকতেই দেখা হলো বাণেশ্বরের সঙ্গে। সে স্নান করে গাড়িতে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করি, "শ্রী কেমন আছে?"

"না ঘোষদা, ভাল নেই। এখানে এসে একজন ডাক্তার ডেকে এনেছিলাম।"

"কি বললেন তিনি?" শঙ্করী উৎকণ্ঠিতা।

"তাঁর নাকি টাইফয়েড বলে মনে হচ্ছে।"

"টাইফয়েড।"

"হ্যাঁ দিদি! তিনি তাই বললেন।"

"আমারও কিন্তু গোড়া থেকে তাই মনে হচ্ছিল।"

উকিলবাবুর মন্তব্যকে আমল না দিয়ে আমি বাণেশ্বরকে জিজ্ঞেস করি, "গাড়ি কোথায় রেখেছে?"

"সাইডিংয়ে! কিন্তু পূর্ণিমাদি গাড়িতে নেই।"

"কোথায় সে?" মাসিমা জিজ্ঞেস করেন।

বাণেশ্বর বলে, "আজ্ঞে, তিনি ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিং রুমে রয়েছেন। গাড়িতে দুপুরবেলা বড্ড গরম। শ্রী ছটফট করছিল। তাই আমরা স্টেশন মাস্টারকে বলে ওখানে তার থাকার ব্যবস্থা করে দিয়েছি। আসুন আমার সঙ্গে।"

বেহুঁশের মতো পড়ে রয়েছে শ্রী।

পূর্ণিমা বলে, "ডাক্তরবাবু টাইফয়েড বলে সন্দেহ করছেন। ক্লোরোমাইসিটিন খাওয়াতে বলে গিয়েছেন। কিন্তু রক্ত পরীক্ষা না করে খাওয়ানো উচিত হবে কি?

"এখানে রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই?" ম্যানেজারকে জিজ্ঞেস করি।

"থাকবে না কেন? কিন্তু আজ রাতেই যে গাড়ি ছাড়ছে। এক বেলার মধ্যে রিপোর্ট পাওয়া যাবে কি? দেখি চেষ্টা করে।"

"ওষুধ খাওয়াবার কি করব ঘোষদা? আপনাকে তো বলেছি, আমার মেয়ে হোমিওপ্যাথিক ওষুধ খায়। অসুখ সম্পর্কে নিশ্চিত না হয়েই ওকে এত কড়া ওষুধ খাওয়াবো?"

কি বলব বুঝতে পারছি না।

সাহাবাবু জিজ্ঞেস করেন, "ওষুধ আনিয়েছিস?"

"হ্যাঁ।"

"তাহলেও থাক্।" শঙ্করী বলে, "দেখা যাক না রক্তটা পরীক্ষা করা যায় কি না। তারপরে যা হয় করা যাবে।"

"তাই ভাল।' আমি শঙ্করীকে সমর্থন করি। দাদা এবং সরকারদাও মাথা নাড়েন।

খাওয়া-দাওয়ার পরে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে আমরা বেরিয়ে পড়ি পথে। এবারে আর বাস নয়, টাঙ্গা।

চড়াই উৎরাই হলেও মসৃণ পথ। পথের দুধারে বাড়িঘর ও দোকানপাট। রুপোর গয়না, কাঠের খেলনা ও লাক্ষার চুড়ির অসংখ্য দোকান। পূর্ণিমা বলে, "ঘোষদা, ফেরার পথে কিন্তু একবার বাজারে নামতে হবে। মেয়ের জন্য খেলনা ও চুড়ি কিনব।"

ঠিক কথা। পূর্ণিমা এবেলা আমাদের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছে। মাসিমা রয়েছেন শ্রীর কাছে।

প্রথমেই এলাম জগদীশ মন্দিরে। এটি বিষ্ণু মন্দির। মহারাণা প্রথম জগৎ সিংহ পনেরো লক্ষ টাকা খরচ করে ১৬৫১ সালে এই মন্দির তৈরি করেছেন। তোরণের দু-পাশে দুটি সুবিরাট পাথরের হাতি। শ্রী দেখলে না জানি কতই খুশি হতো। আমার জন্যই আজ সে এমন সুন্দর হাতি দুটি দেখতে পেল না।

সাড়ে সাত মিটার উঁচু আয়তক্ষেত্রাকায় একটি প্লাটফর্মের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে ২৪ মিটার উঁচু মন্দিরটি। বত্রিশখানি সিঁড়ি বেয়ে আমরা মন্দিরে উঠে আসি। সামনেই একটি পেতলের গরুড় মূর্তি।

ইন্দো-আর্য্য স্থাপত্যকলায় নির্মিত চমৎকার মন্দির। সারি সারি সুদৃশ্য স্তম্ভে সুসজ্জিত মণ্ডপ। তারপরে গর্ভ-মন্দির। মন্দিরের চূড়ায় শিখর কলস। গর্ভ-মন্দিরের মেঝে ও দেওয়ালে

চমৎকার খোদাই কাজ। ভেতরে কষ্টিপাথরের বিষ্ণু বিগ্রহ। মণ্ডপের দেয়ালে ১৬৫১ সালের একটি শিলালিপি রয়েছে। শিলালিপিতে মহারাণা জগৎ সিংহের রাজত্বকালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস খোদিত।

বিশ্বম্ভর চতুর্ভুজ পদ্মনাভকে প্রণাম করে সহযাত্রীদের সঙ্গে নেমে আসি পথে। টাঙ্গা এগিয়ে চলে উদয়পুর প্রাসাদের দিকে।

উদয়পুর শহরের উচ্চতম স্থানে এসে টাঙ্গা থামল। এটি শহরের দক্ষিণসীমা। এর পরেই পিচোলা হ্রদ—যে পিচোলার একঢোক জল পেটে পড়লেই তাকে নাকি আবার ফিরে আসতে হয় উদয়পুরে। আমিও কি কোনদিন আবার আসব উদয়পুরে!

নিশ্চয়ই আসব। অন্তত রণকপুর দেখার জন্য আমাকে আবার আসতেই হবে উদয়পুরে। এবারে উদয়পুর থেকে আমরা আবু রোডে যাবো কিন্তু যাওয়া হবে না রণকপুর : অথচ আবু রোডের পথে ফালনা রেলস্টেশনে থেমে সেখান থেকে বাসে করে অনায়াসে রণকপুর দেখে নেওয়া যেতো। উদয়পুর থেকে বাসে করেও যাওয়া যায় রণকপুর। ফেরার পথে ফালনার বাস ধরতে পারতাম। বাসে উদয়পুর থেকে রণকপুর যেতে ঘণ্টা পাঁচেক সময় লাগে।

শুনেছি রণকপুরে শ্বেতপাথরের চমৎকার জৈন মন্দির আছে। সে মন্দির মাউন্ট আবুর দিলওয়ারা মন্দিরের চেয়ে বয়সে ছোট হলেও কারুকার্যে খাটো নয়। সুতরাং রাজস্থানের অবশ্য দর্শনীয় মন্দিরসমূহের অন্যতম।

উদয়পুর থেকে রণকপুর যেতে যেমন অসুবিধে নেই, তেমনি সেখানে কোন অসুবিধে নেই থাকা-খাওয়ার। খুবই ভালো ধর্মশালা রয়েছে এবং সেখানে দর্শনার্থীদের অবারিত দ্বার।

তবু এ-যাত্রায় আমার যাওয়া হবে না রণকপুর। কারণ রণকপুর এই ভ্রমণসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয়। আর তাই আমাকে আবার আসতে হবে উদয়পুরে। অতএব উদয়পুরের প্রসঙ্গেই ফিরে আসা যাক। ভাবা যাক এই উদয়পুর রাজ-প্রাসাদের কথা।

একটি নয়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মহারাণার নির্মিত কয়েকটি বাড়ি নিয়ে উদয়পুরের এই প্রধান প্রাসাদ। বিভিন্ন সময়ে নির্মিত হলেও বাড়িগুলির মধ্যে একটি আশ্চর্য-সুন্দর মিল রয়েছে।

তোরণের সামনে টাঙ্গা থেকে নামি। বিস্ময়ে ও আনন্দে হতবাক হয়ে যাই। সারা শহর ও পিচোলা হ্রদকে একখানি রঙিন ছবির মতো মনে হচ্ছে এখান থেকে।

ত্রিপোলিয়া তোরণ দিয়ে প্রাসাদ এলাকার ভেতরে আসি। এখানে পর পর আটটি ধনুকাকৃতি কারুকার্যময় তোরণ রয়েছে। গাইড বলে, "সেকালে রাজ্যে কোন অমঙ্গলের আশঙ্কা দেখা দিলে মহারাণা এখানে সোনা-রূপা দিয়ে নিজের ওজন নিতেন। তারপরে সেই সোনা এবং রূপা দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করতেন।"

শ্রীর রক্ত পরীক্ষা করার চেষ্টা করবেন বলে ম্যানেজার আসতে পারেন নি সঙ্গে। আর তাই আমাদের একজন গাইডকে সঙ্গে নিতে হলো। আমরা গাইডের সঙ্গে প্রাসাদে প্রবেশ করি। পথ চলতে চলতে গাইড বলতে থাকেন, "এই চতুষ্কোণ প্রাসাদটি উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত। এর দৈর্ঘ্য ৪৫৭ মিটার এবং কোথাও কোথাও ২৪৪ মিটার পর্যন্ত প্রশস্ত। ফার্গুসান এই প্রাসাদকে রাজপুতানার বৃহত্তম রাজপ্রাসাদ বলে বর্ণনা করেছেন।"

গাইড বলেন, "এই জায়গাটিকে বলে রাজ-অঙ্গন। এটি প্রসাদের প্রাচীনতম অংশ। মহারাণা উদয় সিংহ তৈরি করেছেন।

"আপনাদের হাতে সময় কম। কাজেই আমরা সব না দেখে শুধু বড়ীমহল, দিলখুস-মহল, মোতি-মহল ও মোর-চৌক দেখব।"

প্রথমেই বড়ী মহলে এলাম। গাইড বলেন, "এর আরেক নাম 'গার্ডেন প্যালেস'। এটি ১৬৯৮ থেকে ১৭১০ সালের মধ্যে নির্মিত।"

দিলখুশ-মহলের অপর নাম 'জোভিয়াল প্যালেস।' ১৬২০ থেকে ১৬২৮ সালের মধ্যে নির্মিত। এই প্রাসাদে কিছু অপরূপ 'ফ্রেসকো' চিত্র রয়েছে।

মোতি-মহলটি সত্যই দেখবার মতো। দেয়ালে রঙিন কাচের অবিস্মরণীয় শিল্পচাতুর্য।

মোর-চৌকে যে আরও বড় বিস্ময় অপেক্ষা করছিল, গাইড তা আগে বলেন নি। হয়তো ইচ্ছে করেই বলেন নি। রঙিন কাচের পাঁচটি জীবন্ত ময়ূরের মূর্তি রয়েছে এখানে।

প্রধান প্রাসাদ থেকে এলাম সজ্জন-নিবাস উদ্যানে। এর আরেক নাম গুলাব-বাগ। বড় বড় গাছে ছাওয়া সুবিশাল ছায়া ঘেরা কানন। এটি একটি ছোট চিড়িয়াখানাও বটে। মসৃণ বাঁধানো পথ দিয়ে 'টয়'-ট্রেনের স্টেশনে এলাম। সামন্তবাবুর ছোট ছেলে বায়না ধরল রেলে চড়বে। অনেক কষ্টে তাকে বিরত করা গেল। শ্রী এলেও বোধহয় চড়তে চাইত এই খেলার রেলগাড়িতে।

বাগিচা দেখে এলাম ভিক্টোরিয়া হল মিউজিয়ামে, বর্তমান নাম প্রতাপ সংগ্রহশালা। এটি সম্ভত রাজস্থানের প্রাচীনতম সংগ্রহশালা। ১৮৮৭ সালে মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিরক্ষার উদ্দেশে স্থাপিত হয়েছে।

সংগ্রহশালাটি প্রধান তিনটি বিভাগে বিভক্ত—প্রত্নতাত্ত্বিক, স্থানীয় ও বিবিধ। প্রথম বিভাগে রয়েছে প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রার এবং ভাস্কর্য-শিল্পের প্রস্তর ও ধাতব মূর্তি। রয়েছে খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীস্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর বিচিত্র লিপিমালার অসংখ্য নিদর্শন। সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দী, উর্দু ও ফারসী ভাষার লিপিমালা। যে লিপিটি আমাদের সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেটি হলো খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০ অব্দের একটি সংস্কৃত লিপি। লিপিমালা নিয়ে যাঁরা গবেষণা করেন তাঁদের পক্ষে এই সংগ্রহশালা অবশ্য দর্শনীয়।

স্থানীয় বিভাগে উদয়পুরের বয়ন শিল্পের বহু বিচিত্র-সুন্দর নিদর্শন রয়েছে। এগুলি রাজপুতনার লোকশিল্পের গৌরব বৃদ্ধি করছে।

অবশেষে এলাম স্থানীয় বিভাগে। এখানে রয়েছে, রাজপুত ও মোগল চিত্রকলার কিছু স্মরণীয় নিদর্শন। হস্তীদন্ত, দারু ও ধাতুশিল্পের মনোরম সব শিল্প সংগ্রহ। বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় সংরক্ষিত জীব-জন্তু ও পাখির দেহাবশেষ। রয়েছে মহারাণাদের ছবি এবং পোশাক।

এই বিভাগে যে জিনিসটি আমাদের সবচেয়ে বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করল সেটি হলো যুবরাজ খুরমের পাগড়ি। ভ্রাতৃত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি মহারাণার সঙ্গে পাগড়ি বিনিময় করেছিলেন। উদয়পুরের মহারাণাই তাঁকে শাহজাহান উপাধিতে ভূষিত করেন।

দুর্ভাগ্যের কথা মেবারের সেই পরম বন্ধুর পুত্র আওরঙ্গজেবের হিন্দু-বিদ্বেষী ও অদূরদর্শিতার ফলে রাজপুত ও মোগলের সেই মধুর সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী হয় নি। আর তাই মহারাণা রাজ সিংহ সেই 'নিষ্ঠুর, কপটাচারী, ক্রূর, দাম্ভিক, আত্মমাত্রহিতৈষী এবং প্রজাপীড়ক' মোগল সম্রাট আওরঙ্গজেবকে চরম আঘাত হেনেছিলেন। ভাবতেও ভাল লাগছে যে সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র যাঁকে 'দেশহিতৈষী ধর্মাত্মা বীরপুরুষ' বলে অবহিত করেছেন, আমি

এখন সেই মহারাণা রাজ সিংহের উদয়পুর পরিক্রমা করছি।

ফতেসাগরের তীর দিয়ে টাঙ্গা চলেছে ছুটে। এটি উদয়পুরের 'মেরিন ড্রাইভ।' শান্ত সুনীল জলরাশির তীর ছুঁয়ে আঁকাবাঁকা মসৃণ ও সমতল পথ। পথের একপাশে দেওয়াল। তারপরে সবুজ গাছপালা, শ্যামল প্রান্তর আর রঙিন বাড়ি-ঘর। আরেকপাশে সাদা রেলিং আর নীল জল। বাকি তিন দিকেই ধূসর পাহাড়। আর দূরে, হ্রদের প্রায় প্রান্তে, জলের মাঝখানে ছবির মতো একটি বাগান। টাঙ্গাওয়ালা বলেছে, ওটি নেহেরু পার্ক। আমরা ওখানেই চলেছি। চলেছি—সহেলীয়াঁ-কি বাড়ি এবং মহারাণা প্রতাপ স্মারকে।

পিচোলার উত্তরে আরেকটি কৃত্রিম হ্রদ ফতেসাগর। পিচোলা থেকে খাল কেটে উভয় হ্রদের মাঝে যোগসাধন করা হয়েছে। ১৬৭৮ সালে মহারাজা জয় সিংহ দুটি পাহাড়ের মাঝে বাঁধ দিয়ে প্রথম এই হ্রদটি সৃষ্টি করেন। পরবর্তীকালে একবার প্রবল বৃষ্টি হওয়ায় বাঁধটি ভেঙে যায়। হ্রদটিও ধ্বংস হয়।

মহারাণা ফতে সিংহ ছ'লাখ টাকা খরচ করে আবার বাঁধ এবং বাঁধের ওপরকার এই পথটির সংস্কার সাধন করেন। তারপর থেকেই এই কৃত্রিম হ্রদের নাম হয়েছে ফতেসাগর। ফতে সিংহের অনুরোধে 'ডিউক অব্ কনট্' ১৮৮৯ সালে সেই সংস্কারকার্যের শুভ-উদ্‌বোধন করেন। তাঁরই নামে এই বাঁধের নাম রাখা হয়।

ফতেসাগর খুব বড় এবং গভীর নয়। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ২·৪ এবং ১·৬ কিলোমিটার। গভীরতা ৮ মিটারের মতো আর আয়তন ৪ বর্গকিলোমিটার। ফতসাগরের ছায়াশীতল তীরভূমি চড়ুইভাতির আদর্শ স্থান। তার তীরভূমিতে পদচারণা যে-কোন পথিকের পরম প্রত্যাশা।

মহারাণা প্রতাপ স্মারকের সামনে এসে টাঙ্গার শোভাযাত্রা থামল। আমরা টাঙ্গা থেকে নেমে পড়লাম। চমৎকার পরিবেশ। ডানদিকে রাণা প্রতাপ স্মারক—অনেকটা ঝুলন্ত উদ্যানের মতো। বাঁদিকে শান্ত ও সুনীল ফতেসাগর। একটু পেছনে নেহেরু পার্ক।

আমরা প্রতাপ স্মারক দেখে মোটর-বোটে চড়ে নেহেরু পার্কে যাবো। ১৯৬৭ সালের ১৪ই নভেম্বর রাজস্থানের রাজ্যপাল সর্দার হুকুম সিংহ ঐ দ্বীপ-উদ্যানের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। নির্মাণকার্য শেষ করতে তিনবছর সময় লেগেছে। খরচ হয়েছে ছ'লাখ টাকা।

প্রায় সাড়ে চার একর জায়গা নিয়ে উদ্যানটি। মহীশূরে বৃন্দাবন গার্ডেনসয়ের মতো ওখানেও অনেকগুলি ফোয়ারা আছে। আছে সবুজ ঘাসে ছাওয়া 'লন' ও একটি পুলের ধারে নৌকোর আকারে চমৎকার রেস্তোরাঁ।

আছে রঙিন আলো আর একটি 'জেট ফাউন্টেন'—দেড়শ' ফুট উঁচুতে জল ছিটে উঠছে। ভরতে আর কোথাও এত উচু ফোয়ারা নেই।

নেহেরু উদ্যান থেকে আমরা যাবো সহেলীয়াঁ-কি বাড়ি মানে সখীদের বিশ্রাম কাননে। ফতেসাগর বাঁধের নিচেই এই রমণীয় কানন। কথিত আছে মহারাণা দ্বিতীয় সংগ্রাম সিংহকে দিল্লীর তৎকালীন সম্রাট কয়কজন পরিচারিকা উপহার পাঠিয়েছিলেন। তাঁদেরই সম্মানে মহারাণা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই অপরূপ উদ্যানটি নির্মাণ করেছেন।

মহারাণা ফতে সিংহ সেখানে কারুকার্য শোভিত একটি কৃত্রিম জলাশয়, কোমল কষ্টিপাথরে চিত্র শোভিত চারটি ছত্রী এবং ফোয়ারা নির্মাণ করেছেন। ওখানে জলপদ্মে পরিপূর্ণ আরেকটি কৃত্রিম জলাশয়ও আছে। তার তীরে চারটি শ্বেতপাথরের হাতী রয়েছে। প্রতিটি হাতী একখানি

পাথর থেকে তৈরি। শুনেছি যখন ফোয়ারায় জল পড়ে, তখন নাকি ঐ উদ্যানের আবহাওয়া শীতল হয়ে ওঠে। মনে হয় বৃষ্টি নেমেছে।

কিছুক্ষণ ফতেসাগরের তীরে পায়চারি করে আমরা এসে দাঁড়াই রাণাপ্রতাপ স্মারকের সামনে। পথ থেকে অনেকটা উঁচুতে একটি অনিন্দ্যসুন্দর উদ্যান।

সিঁড়ি বেয়ে উঠে আসি ওপরে। সামনেই মোতি মগড়ি পাহাড়ের চূড়া, যেন আমাদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে—অতীত থেকে বর্তমানের দিকে। কথিত আছে পৌত্র অমর সিংহের জন্মতিথি উপলক্ষে মহারাণা উদয় সিংহ চিতোর থেকে সপরিবারে একলিঙ্গজীকে পুজো দিতে এসেছিলেন। পথে এই পাহাড় আর সুবিস্তীর্ণ ও শ্যামল সমতল জায়গাটি দেখে তাঁর বড়ই পছন্দ হয়। তিনি বুঝতে পারেন প্রতিরক্ষার দিক থেকে জায়গাটি যেমন নিরাপদ, তেমনি এখানে রয়েছে অঢেল জল। আবহাওয়াও ভাল। তাছাড়া জায়গাটা মোগল-ছাউনি আজমীর থেকে অনেক দূরে। তিনি তখুনি এখানে নগর নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন। প্রথমে এই পাহাড়ের উপর মোতি-মহল তৈরি করেন।

আজ উদয় সিংহের সে প্রাসাদ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। কিন্তু ধ্বংসস্তূপ সহ গোটা মোতি মগড়ি পাহাড়টাই মেবারবাসীদের কাছে পুণ্যতীর্থে পরিণত। কারণ এখানেই মহারাণা প্রতাপ যৌবনে কতকগুলো বছর কাটিয়েছেন। আর তাই এই পাহাড়েই নির্মিত হয়েছে তাঁর স্মৃতিমন্দির।

শ্বেতপাথরের বাঁধানো আঙ্গিনায় শ্বেতপাথরের বেদির ওপরে অশ্বপৃষ্ঠে প্রতাপের বিশাল ব্রোঞ্জমূর্তি। কোমরে তলোয়ার, হাতে বল্লম, গায়ে বর্ম ও মাথায় শিরস্ত্রাণ। চেটকের তিনটি পা বেদিতে, একটি পা শূন্যে—চলমান চেটক। মেবারবাসীরা তাঁদের প্রিয় চেটককেও নানা আবরণে সজ্জিত করেছেন।

সারা বাগানটিতে অসংখ্য ছোট-বড় সবুজ গাছ আর রঙিন ফুলের মেলা। পাথর বাঁধানো পথের পাশে পাশে কৃত্রিম ঝরনা আর ফোয়ারার কলতান। নানা রঙের আলোয় ঝলমল করছে কাননটি। তার পবিত্র-সুন্দর পরিবেশে আমরা নিজেদের যেন হারিয়ে ফেলেছি।

এখান থেকে সমস্ত উদয়পুর শহরটিকে ছবির মতো মনে হচ্ছে। সত্যই এই স্মরণী একটি 'Supreme Beauty Spot.'

ভারতগৌরব রাণা প্রতাপকে প্রণাম করে আমরা তাঁর পায়ের কাছে বসে পড়ি। তাঁকে বলি—হে মহাবীর, তুমি আবার আবির্ভূত হও এই হতভাগ্য দেশে। সত্য ন্যায় ও স্বাধীনতার মহামন্ত্রে তুমি পুনরায় আমাদের দীক্ষা দান করো। আমাদের মানুষ করে তোলো—

'তোমার আসন শূন্য আজি, হে বীর পূর্ণ করো'—

।। পনেরো ।।

আজ আমাদের সারাদিন গাড়িতে থাকতে হবে। ঠিক ছিল গতকাল বিকেল পাঁচটার ট্রেন ধরে মাওলী ও মাড়ওয়ার জংশনে ট্রেন বদলে আজ সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ আবু-রোডে পৌঁছব। কিন্তু উদয়পুর পৌঁছতে দেরি হয়ে যাওয়ায় আমাদের পক্ষে গতকাল বিকেলের ট্রেন ধরা সম্ভব হয় নি। ফলে কাল রাতটা উদয়পুরেই কাটাতে হয়েছে। আজ সকাল ছ'টায় ট্রেন ছেড়েছে। এখন মাড়ওয়ার জংশন থেকে সময়মত ট্রেন পেলেই আগামীকাল সকালে আবু-রোড পৌঁছতে পারব। নইলে আরও দেরি হয়ে যাবে।

উদয়পর থেকে আবু-রোড মোটরপথে ২৯৪ কিলোমিটার কিন্তু রেলপথে ৩৫৬ কিলোমিটার। কারণ সোজাসুজি রেল যোগাযোগ নেই। সাধারণত এ পথে সবাই বাসে যান। কিন্তু আমাদের যে রেল ছাড়া গতি নেই।

আবু-রোড উদয়পুরের সোজা পশ্চিমে, আর আমরা এখন পুবে চলেছি। ফিরে চলেছি মাওলী জংশনে। সেখান থেকে উত্তরে মাড়ওয়ার জংশনে। মাড়ওয়ার থেকে দক্ষিণ পশ্চিমে দীর্ঘপথ পাড়ি দিয়ে তবে পৌঁছব আবু রোড—মাউন্ট-আবুর রেলস্টেশন।

জানালার পাশে বসে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছি। গাড়ি এগিয়ে চলেছে মন্থর গতিতে। রেল-লাইনের দু-পাশেই কাঁটাগাছে ছাওয়া রুক্ষ প্রান্তর—দিগন্ত পর্যন্ত প্রসারিত। মাঝে মাঝে অবশ্য দু-একটি যবের ক্ষেত চোখে পড়ছে। আর স্টেশন এলে কিছু বড় বড় গাছ দেখতে পাচ্ছি।

প্যাসেঞ্জার ট্রেন, কাজেই কিছুক্ষণ বাদে-বাদেই স্টেশন আসছ। একে তো এ অঞ্চলে দ্রুতগামী গাড়ির সংখ্যা কম, তার ওপরে সে-সব ট্রেনের সঙ্গে আবার ট্যুরিস্ট কোচ জুড়বার নিয়ম নেই।

স্টেশনগুলো কিন্তু বেশ বড় বড়, দেখতেও সুন্দর। তবে যাত্রী প্রায় নেই বললেই চলে। আজ আমাদের 'অভিশপ্ত চম্বল' উপত্যকার ওপর দিয়ে যেতে হবে।

কাশির শব্দটা কানে আসে, শ্রী কাশছে। তার জ্বর ছাড়ে নি। উপরন্তু আজ সকাল থেকে কাশিটা বেড়েছে।

গতকাল উদয়পুরে বহু চেষ্টা করেও তার রক্ত পরীক্ষা করানো যায় নি। বাধ্য হয়ে কাল রাত থেকে আমরা ক্লোরোমাইসিটিন খাওয়াচ্ছি।

হঠাৎ কথাটা মনে পড়ে যায়—আমার কাছে 'কাফ্ সিরাপ' রয়েছে। তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে শিশিটা বের করে পাশের খোপে আসি। পূর্ণিমাকে বলি, "এর দু-চামচ ওষুধ ওকে খাইয়ে দাও, কাশিটা কমে যাবে।"

পূর্ণিমা নিঃশব্দে আমার কথা রাখে। আজ সকাল থেকেই তাকে বড় বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। শুধু সে নয়, মাসিমা সেজদি শঙ্করী বিউটি এবং সাহাবাবুও শব্দহীন।

মাসিমা আমাকে বসতে বলেন। তিনি একটু সরে বসেন। আমি শ্রীর মাথার কাছে বসে তার চুলে আঙুল বুলিয়ে দিতে থাকি।

শ্রী আমার দিকে তাকায়। ওর দৃষ্টিটা বড়ই করুণ। তিন-চারিদিনের জ্বরে মেয়েটা যেন বড় বেশি দুর্বল হয়ে পড়েছে। মুখের হাসিটি পর্যন্ত গিয়েছে হারিয়ে।

ছোট হাত দুখানি দিয়ে সে আমার একখানি হাত আঁকড়ে ধরে। ক্ষীণস্বরে ডাকে, "মামু!"

"কি বলছ মা?" আমি তার মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ি।

সে বলে, "তুমি কি আমাদের সঙ্গে কলকাতায় ফিরবে, না আবার বৃন্দাবনে চলে যাবে?"

পূর্ণিমা একটু হাসে। অসহায় ও করুণ হাসি।

"কি কথা বলছ না কেন?" শ্রী তাগিদ দেয় আমাকে।

তাড়াতাড়ি বলে উঠি, "সেদিন আগ্রাফোর্ট স্টেশনে বসে তো বলেছি মা—এ যাত্রায় আমি আর কখনও তোমাকে ছেড়ে যাবো না।"

"সত্যি বলছ?"

"হ্যাঁ।"

শ্রী আমার কোলে মুখ লুকোয়। আমি সস্নেহে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে থাকি।

কেউ কোন কথা বলছে না। একটা অসাড় নীরবতা যেন আক্টোপাসের মতো বন্দী করেছে আমাদের।

পাশের খোপ থেকে দাদা উঠে এলেন এখানে। পূর্ণিমা বলে, "বসুন। অসুস্থ শরীর নিয়ে আপনি আবার এলেন কেন?"

আজ সকাল থেকেই দাদার শরীরটা ভাল নেই। সত্তর বছরের প্রবীণ যুবা এ-ক'দিন আমাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমানে ছুটোছুটি করেছেন, তার ওপরে আগামীকাল দোল-পূর্ণিমা। শরীরটা একটু রসস্থ হতেই পারে। তাই বলে তিনি কোন ওষুধ খান নি। বলেছেন—আমি ন্যাচারাল ট্রিটমেন্ট্ করি। তার মানে আজ সকাল থেকে জল ছাড়া আর কিছুই খান নি এবং এতক্ষণ শুয়েই ছিলেন।

পূর্ণিমার প্রশ্নের উত্তরে দাদা বলেন, "তোমাকে একটা কথা বলতে এলাম।"

"কি কথা?"

"সংসারে মা হবার মতো জ্বালা আর কিছুতে নেই। মা-কে শুধু কর্তব্যপরায়ণা হলেই চলে না, তাকে হতে হয় ধৈর্যশীলা ও সংযত-মনা। মনকে শক্ত করে ভগবানে বিশ্বাস রাখো, তোমার মেয়ে সুস্থ হয়ে উঠবে।"

বেলা আড়াইটার সময় ট্রেন মাড়ওয়ার জংশনে পৌঁছল। ম্যানেজার কাগজপত্র নিয়ে স্টেশনে নেমে গেল।

কিছুক্ষণ বাদে ম্যানেজার ফিরে এলো। আর এসেই দুঃসংবাদটা দিলো—যে ট্রেনটির আমাদের আবু-রোডে নিয়ে যাবার কথা, সেটি কয়লার অভাবে সাময়িকভাবে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে। রাত সওয়া তিনটের আগে আর কোন গাড়ি নেই। অতএব আরও একটি দিন নষ্ট হয়ে গেল।

সংবাদটি শুনে সবাই অসন্তুষ্ট শুধু ঠাকুরমাদের মাঝে কোন চিত্তচাঞ্চল্য লক্ষ্য করছি না। কয়েক মিনিট বাদেই তাঁরা কয়েক বালতি নোংরা জামা-কাপড় নিয়ে ওয়েটিংরুমের উদ্দেশে রওনা হলেন।

কয়লার ইঞ্জিনে জামা-কাপড় খুবই নোংরা হচ্ছে। কিন্তু গাড়িতে জলাভাব। তাই আজ এখানে থাকতে হবে শুনে ঠাকুমারা সম্ভবত খুশিই হয়েছেন। তাঁরা কাপড়-চোপড় কেচে ফেলতে পারবেন।

আমারও আজ স্নান করা হয়ে ওঠে নি। সুযোগ যখন পাওয়া গেছে, একবার স্টেশনে নেমে দেখলে হতো, জল পাওয়া যায় কি না।

স্নান সেরে গাড়িতে ফিরে আসতেই সরকারদা বললেন, "আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, শ্রীর টাইফয়েড হয় নি।"

"তাহলে!"

"আমার মনে হচ্ছে ওর হাম উঠবে, ক্লোরোমাইসিটিন খাওয়াবার জন্য হামটা উঠতে পারছে না।"

সরকারদা ডাক্তার নন, তবে তিনি হোমিওপ্যাথি চর্চা করেন। সুতরাং তাঁর কথাটা উপেক্ষা করবার মতো নয়।

"এক কাজ করুন", বৌদি বলেন, "এখানকার বাজারে গিয়ে দেখুন, মেথি পাওয়া যায় কি না। পেলে, আজ ওকে খানিকটা মেথি-ভেজানো জল খাইয়ে দিন। হাম উঠবার হলে, কালই উঠে যাবে।"

"রক্ত পরীক্ষা না করে আর ক্লোরোমাইসিটিন খাওয়াবেন না।" সরকারদা যোগ করেন।

বাজারে মেথি পাওয়া গেল। রেল-লাইনের ওপারেই বাজার। শাক-সবজি মুদি ও মনোহারীর কয়েকটি দোকান নিয়ে ছোট বাজার। কিন্তু তারই ভেতরে একখানি ঝক্‌ঝকে বিলেতী মদের দোকান রয়েছে। দিশি জিনিসের ক'টি দোকান আছে বুঝতে পারলাম না।

আগামীকাল দোল পূর্ণিমা হলেও, এখানকার হোলি শুরু হয়ে গিয়েছে। বাজারে বেশ রং খেলা চলেছে, মদের দোকানেও ভিড় জমে উঠেছে। তবে আশ্চর্য, আমাদের কেউ রং দিল না—এমন কি মদের দোকান থেকে বেরিয়ে এসেও নয়।

স্টেশনে ইংরেজি খবরের কাগজ পাওয়া গেল। গতকাল ও পরশু রাজ্য সরকারের পতনের দাবিতে গুজরাতের বিভিন্ন জায়গায় প্রচণ্ড হাঙ্গামা হয়েছে—গোলাগুলি চলেছে। আমরা মাউন্ট-আবু থেকে গুজরাত যাবো। স্বভাবতই দুশ্চিন্তায় পড়েছি।

জনৈক আর. পি. এফ্‌ সাব-ইন্সপেক্টার অবশ্য অভয় দিলেন। বললেন—আপনারা ভয় পাচ্ছেন কেন, আমেদাবাদ এবং বড় বড় শহর ছাড়া কোথাও বড় একটা হাঙ্গামা হয় নি। আপনারা তো শুধু তীর্থস্থানে ঘুরে বেড়াবেন। তাছাড়া আপনারা রেলে যাতায়াত করছেন, থাকবেন স্টেশনে স্টেশনে। এদিককার আন্দোলনকারীরা রেলের ওপর কখনও হামলা করে না।

আজ বসন্ত উৎসব। গোপাল বেশ বহাল তবিয়তে রয়েছে। সমানে দোল খেলছে সখাসখীদের সঙ্গে। স্বভাবতই সকাল থেকে উমাদি তাঁর গোপালকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত।

যথা সময়ে গোপালের প্রসাদ পাওয়া গেল আর তারপরেই শুরু হলো আমাদের হোলি। চলমান গাড়ির এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত পর্যন্ত সবাই একসঙ্গে আবীর-উৎসবে মেতে উঠেছেন।

কিন্তু যার আজ সবচেয়ে বেশি উচ্ছল হয়ে উঠবার কথা, সে-ই এ আনন্দ যজ্ঞের শরিক হতে পারল না। সারা গাড়িতে শ্রী শুধু শুয়ে আছে একা। সরকারদার সন্দেহ সত্য হয়েছে। আজ ওর হাম উঠেছে।

বেলা পৌনে এগারোটার সময় আমরা আবু-রোড পৌঁছলাম। আবু রোডের আরেক নাম খারারী। জেলা-সদর সিরোহির দক্ষিণে ও বনাস নদীর বাঁ তীরে অবস্থিত এই ছোট শহরটি। অবস্থান ২৪°২৯´ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৭২°৪৭´ পূর্ব দ্রাঘিমাংশে। এখান থেকে দিল্লী ৭৫০ কিলোমিটার আর আমেদাবাদ হয়ে বম্বে ৬৭৯ কিলোমিটার।

আবু-রোডের প্রথম পরিচয় সে মাউন্ট-আবুর সিংহদ্বার—রেলপথের প্রান্তসীমা। তাহলেও এটি একটি তহশিল-সদর ও পঞ্চায়েত সমিতির প্রধান কর্মকেন্দ্র। এখানে স্কুল হাসপাতাল সিনেমা বাজার বিশ্রাম-ভবন, ধর্মশালা ও থানা—সবই আছে। আছে ছোট একটি

মিউনিসিপ্যালিটি। ১৯৭১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী আবু-রোডের আয়তন ২·৫৮ বর্গকিলোমিটার, জনসংখ্যা ২৫,৩৩১ জন। তাঁদের মধ্যে ১৩,২৮৬ জন পুরুষ ও ১২,০৪৫ জন নারী। ৪৭৯৮ টি বাড়িতে ৪৮৫৮ টি পরিবার নিয়ে এই শহর। জনসংখ্যা মাউন্ট-আবুর প্রায় তিনগুণ। এখান থেকে মাউন্ট-আবু ২৯ কিলোমিটার।

ম্যানেজার স্টেশন থেকে ফিরে এসে যে সংবাদটি পরিবেশন করলো, তাকে কোনমতেই শুভ বলা যেতে পারে না। সে জানালো, "আবু-রোড এবং মাউন্ট-আবুতেও কলকাতার মতো একবেলা দোল। সুতরাং আর ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই রঙের মাতা-মাতি শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে বিকেল পাঁচটার আগে বাস কিংবা ট্যাক্সি চলবে না। ততক্ষণে দিলওয়াঁরা মন্দির বন্ধ হয়ে যাবে। কাজেই আজ মাউন্ট-আবু যাওয়া বৃথা।

এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই, মাউন্ট-আবু একটি সুন্দর শৈল-শহর। কিন্তু ভারতের অধিকাংশ শৈলপুরী দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছে আমার। সুতরাং আমার কাছে মাউন্ট-আবুর সর্বশ্রেষ্ঠ আকর্ষণ দিলওয়ারা মন্দির। আর এ আকর্ষণ অনুভব করছি প্রায় একযুগ থেকে। কথাটা মনে পড়ে যায়।

১৯৬৩ সালের কথা—সবে লেখক হয়েছি—'বিগলিত করুণা জাহ্নবী-যমুনা' প্রকাশিত হয়েছে। এই সময়ে কাকাবাবুর (শ্রদ্ধেয় সুসাহিত্যিক শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র) নির্দেশে স্বামী দিব্যাত্মানন্দের 'পুণ্যতীর্থ ভারত' বইখানি গ্রন্থনার দায়িত্ব নিতে হলো। তখনি আমি ভারতের দুটি শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় স্থলের কথা প্রথমে জানতে পারি—একটি গিরিতীর্থ-মণিমহেশ, অপরটি—দিলওয়ারা মন্দির।

মণিময়-মণিমহেশের অসীম করুণায় আমার মণিমহেশ দর্শনের সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু দিলওয়ারা-মন্দির এখনও দেখা হয় নি। বড় আশা ছিল আজ দর্শন করব, সে আশাও পূর্ণ হলো না।

সত্যেনদা ও সাহাবাবুর সঙ্গে আমিও ওয়েটিংরুম থেকে স্নান সেরে এলাম। খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়তে চাইলাম কিন্তু পারলাম না। অমিয়বাবু প্রশ্ন করে বসলেন, "ঘোষদা কি দিবানিদ্রার আয়োজন করছেন নাকি?"

"না।" তাড়াতাড়ি বলতে হয় আমাকে। জিজ্ঞেস করি, "কেন বলুন তো?"

"না তাহলে ঐ বইখানি থেকে 'অবুর্দা দেবী' পরিচ্ছেদটা একটু পড়ে শোনাতেন আমাদের।"

বই মানে 'পুণ্যতীর্থ ভারত'। আমি সঙ্গে নিয়ে এসেছি। বলি, "বেশ তো, নিন না, পড়ুন বসে বসে।" বালিশের তলা থেকে বইখানি বের করি।

"তাতে আমাদের কি লাভ হবে?" দাদা মাঝখানে থেকে সমস্যাটাকে তুলে ধরেন। সমাধানও নিজেই করেন, "তার চেয়ে তুমি পড়, আমরা শুনি।"

হেসে বলি, "কলেজে পড়া নাতনী পাশে থাকতে হঠাৎ আমাকে কেন এ আদেশ করছেন দাদা?"

"ঠিকই বলেছো?"—দাদা আমার প্রস্তাব অনুমোদন করেন। বিউটিকে বলেন, মামু যে জায়গাটা দেখিয়ে দিচ্ছে, ঐ বই থেকে সেটুকু আমাদের একটু পড়ে শোনাও তো।"

বিউটি আপত্তি না করে পড়তে শুরু করে, 'আবু পাহাড়ের শুদ্ধ নাম অর্বুদ পবত। এই

পর্বতের একটি গুহার মধ্যে অর্বুদাদেবী বিরাজমানা (অধবর দেবীও বলা হয়)। দেবীর নাম হইতেই পাহাড়ের নাম হইয়াছে অর্বুদা পর্বত। কেহ কেহ বলেন, যেমন শরীরের যে কোন স্থানে বর্ধিত মাংসপিণ্ডকে আব (টিউমার) বলা হইয়া থাকে, সেইরূপ রাজস্থানে মরুভূমিতেও এই পাহাড়টি অস্বাভাবিকভাবে সৃষ্ট হইয়া আবের মতো দেখায় বলিয়াই ইহার না অর্বুদ পর্বত।...

'আবু পাহাড়' সম্বন্ধে একটি ইতিবৃত্ত আছে।

'পুরাকালে ঐ অঞ্চল ছিল সমতল। এইখানে অনেক মুনিঋষিদের তপোভূমি ছিল। পাহাড়ের তি' মাইল দূরে ছিল বশিষ্ঠদেবের আশ্রম। একবার বশিষ্ঠদেবের প্রিয় কামধেনু নন্দিনী আশ্রমের কিয়দ্দূরে একটি গর্তে পড়িয়া যায়।... নন্দিনী বলিল, "প্রভো! আপনি সরস্বতীর বন্দনা করুন। তিনি আসিলেই আমি উদ্ধার পাইব।"

'বশিষ্ঠদেব সরস্বতীর স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। দেবী তাঁহার স্তুতিতে সন্তুষ্ট হইয়া গর্তে প্রবেশ করিলেন। নন্দিনী উদ্ধার হইল বটে কিন্তু সরস্বতী আর উঠিতে পারিলেন না, ঐ গর্তেই আবদ্ধ রহিলেন। সরস্বতী তখন ঋষিবরকে বলিলেন, "আপনি আমাকে উদ্ধার করুন।... হিমালয়ের এক ছেলে এখানে আসিলেই আমি উঠিতে পারিব।"

'মুনিবর হিমালয়ের নিকট সব ঘটনা ব্যক্ত করিয়া তাঁহার এক ছেলের জন্য প্রার্থনা করিলেন।...একমাত্র ছোট ছেলে নন্দিবর্ধন বলিল, "প্রভু, আমি আপনার কাজের জন্য প্রস্তুত আছি, তবে আমি পঙ্গু।...আশ্রমের নিকটে নাগরাজ নামে আমার বিশেষ বন্ধু একজন সদাশয় রাজা আছেন। তাহাকে বলিলেই তিনি আমাকে কাঁধে করিয়া লইয়া যাইবেন।"

"বশিষ্ঠ নাগরাজের নিকট আসিয়া সকল ইতিবৃত্ত জ্ঞাপন করিলে নাগরাজ বলিলেন, "ঋষিবর আপনার কাজের জন্য আমি সর্বদাই প্রস্তুত। আমি হিমালয়ের ছেলেকে কাঁধে করিয়া...গর্তে প্রবেশ করিলেই সরস্বতী উদ্ধার হইবেন নিশ্চিত কিন্তু তাহাতে আমার মৃত্যু অনিবার্য। সুতরাং আমার বর্তমানে আমার ছেলেদের একটা ব্যবস্থা করিলেই আপনার আদেশ পালন করিতে পারি।"

'বশিষ্ঠদেব বলিলেন, "হাঁ, তাহার ব্যবস্থা হইবে।"

'অতঃপর নাগরাজ হিমলয়ের ছেলেকে আনিয়া গর্তে প্রবেশ করাইলেন। সরস্বতী মুক্ত হইয়া কচ্ছভুজের দিকে সমুদ্রাভিমুখে চলিলেন। কিয়দ্দূর যাওয়ার পর মরুভূমির বালুকারাশিতে তিনি মিশিয়া গেলেন। অদ্যাবধি তাহার নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এদিকে গর্ত ভরিয়া কেবলমাত্র নন্দিবর্ধনের নাকটি জাগিয়া রহিল। ঐ নাকই বর্তমান আবু পাহাড়।

'নাগরাজের মৃত্যু হওয়ার পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে বশিষ্ঠদেব নাগরাজের চারিপুত্রকে একটি যজ্ঞে ক্ষত্রিয়ত্বে দীক্ষিত করিয়া ঐ নূতন রাজ্য তাঁহাদের মধ্যে ভাগ করিয়া দিলেন। পরিহর, শোলাঙ্কি, পরমার ও চৌহান—এই চারিজন নাগরাজের পুত্র। ইঁহারাই রাজপুতগণের পূর্বপুরুষ। ইঁহারা ঋষিদের যজ্ঞানল হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়াই অগ্নিকুল নামে পরিচিত।'

বিউটি পড়া থামায়। আমি বলি, "থামলে কেন? পড়ে যাও।"

"আরও পড়তে হবে?" বিউটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়ে। বুঝতে পারছি—আজকাল ছেলে-মেয়েদের দ্রুত-পঠনের অভ্যেস করানো হয় না, ওর কষ্ট হচ্ছে।

বইখানা পাশে রেখে বলতে থাকি, "বশিষ্ঠদেব তখন আবু পাহাড়ে আশ্রম তৈরি করে

সহযোগী ঋষিদের শান্তিতে জপতপ করতে থাকলেন। কিছুকাল পরে ঋষিরা একদিন তাঁকে বললেন—এখানে ফুল-ফলের বড়ই অভাব, আমরা হিমালয়ে গিয়ে তপস্যা করব স্থির করেছি।

"বশিষ্ঠ আবু পাহাড়কে হিমালয়ের মতো ফুল ফলে পরিপূর্ণ করে তুললেন। ঋষিদের কিন্তু তাতেও মন ভরল না। তাঁরা বললেন—এখানে শিব নেই। হিমালয় শিবালয়, আমরা সেখানেই যাবো।

"অগত্যা বশিষ্ঠ মহাদেবের কাছে গেলেন। তাঁর স্তবে তুষ্ট হয়ে শিব বললেন—আমি যখন তাণ্ডব-নৃত্য করব, তখন আবু পাহাড়ের চূড়ায় আমার পায়ের গোড়ালি পড়বে।

"দিব্যাত্মানন্দ বলেছেন," আমি বই খুলে পড়তে থাকি, 'এই ঘটনা হইতেই অচলেশ্বর শিবের প্রতিষ্ঠা হয়। শিবের নাম হইতেই ঐ স্থানের নাম হয় অচলগড়। ইহা আবু বাজার হইতে পাঁচ মাইল দূরে অবস্থিত।'

একবার থেমে বইখানি আবার বিউটির হাতে দিয়ে বলি, "এখান থেকে আবার পড়ো।"

"কোন্‌খান থেকে?" বিউটি বইখানি হাতে নেয়।

আমি জায়গাটা দেখিয়ে দেই। বিউটি পড়তে শুরু করে, 'ঋষিগণ অর্বুদ পর্বত শিখরে তপস্যা করিতেন। তাঁহারা বনের ফল-মূলে জীবন ধারণ করিতেন। দৈত্যগণ তাঁহাদের তপস্যার বিঘ্ন ঘটাইতেন। তাহাদের অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য ঋষিগণ....হোমানল জ্বালিয়া শিবধ্যানে রত রহিলেন। ঐ হোমানল হইতে এক সুপুরুষের আবির্ভাব হইল। ঋষিগণ তাঁহার নাম রাখিলেন—পরিহর। তাঁহাকে প্রহরীর কার্যে নিযুক্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহার দ্বারা কাজ হইল না। পর পর আরও দুই ব্যক্তির আবির্ভাব হইল। তাঁহাদের নাম হইল শোলাঙ্কি ও পরমার। ...কিন্তু তাঁহাদের কেহই ঋষিদের এই বিপদ হইতে মুক্তি করিতে সমর্থ হইল না।

উপায়ন্তর না দেখিয়া বশিষ্ঠদেব বেদমন্ত্রোচ্চারণ পূর্বক হোমানলে আহুতি প্রদান করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে শস্ত্রধারী এক বীরপুরুষ আবির্ভূত হইল। ঋষিগণ তাহাকে উপযুক্ত ব্যক্তি মনে করিয়া চৌহান নামকরণে শত্রুনিধনে আদেশ করিলেন ও কালিকাদেবীর স্তব করিতে লাগিলেন। মা স্তুতিতে সন্তুষ্টা হইলেন এবং সিংহবাহিনীরূপে আবির্ভূতা হইয়া অভয়বাণী প্রদানপূর্বক তিরোধান করিলেন। মহামায়ার শুভাশীর্বাদে চৌহান দৈত্যগণকে নিহত করিয়া শান্তি স্থাপন করিল। ঐ চারপুরুষের...বংশধরগণ রাজপুত....আর ঐ দেবীই অর্বুদা দেবী।

'সেই অবধি পরমার রাজগণ এই আবু পাহাড়ে রাজত্ব করিতেছিল।... অনন্তর তাঁহাদের রাজশক্তির হ্রাস হয়। ...গুজরাতের জৈনধর্মালম্বী রাজার মন্ত্রী এই পার্বত্য রাজ্য অধিকার করেন।... মন্ত্রী অর্বুদাদেবী মন্দিরের নিকটে জৈন মন্দির নির্মাণ করিলেন। উহাই বর্তমানে দিলবারা মন্দির নামে বিখ্যাত।...

'আবু রোড-স্টেশন হইতে সিদ্ধপুর প্রায় ত্রিশ মাইল। ঐ স্থানেই অম্বাদেবীর আদি মন্দির ছিল। এক সময়ে দেশে শান্তি রক্ষার জন্য পূজারী ব্রাহ্মণগণ মায়ের সম্মুখে যজ্ঞ করিতেছিলেন। সেই সময় মুসলমানগণ আক্রমণ করে। পূজারীদের মধ্যে কেহ কেহ মায়ের উৎসব বিগ্রহসহ পলায়নপূর্বক ঘোর জঙ্গলে আশ্রয় লইয়া স্বধর্ম রক্ষা করে এবং পাহাড়ের গুহায় মায়ের পূজাঅর্চনা করিতে থাকে। এই মূর্তিই অম্বাদেবী (ভবানী) নামে বর্তমানে পূজিত ও খ্যাত। এই দেবীস্থান আবু-রোড স্টেশন হইতে প্রায় বারো মাইল দূরে, বাসে যাইতে হয়..'

"আপনারাও তাই যাবেন।" হঠাৎ ম্যানেজার বলে ওঠে।

"কোথায়?" বৌদি প্রশ্ন করেন।

"অম্বাজী। আজ যখন মাউন্ট-আবু যাওয়া হচ্ছে না, তখন বিকেলটা নষ্ট না করে অম্বাজী দর্শন করে আসুন। চা খেয়েই বেরিয়ে পড়ুন। আমি বাস ঠিক করে দিচ্ছি।"

সবাই ম্যানেজারের প্রস্তাব সমর্থন করে। তারপরে অমিয়বাবু আমাকে বলেন, "আপনি তো কিছু বলছেন না দাদা!"

"কি বলব, আপনারা না গেলেও আমি অম্বাজীকে দর্শন করে আসব।"

"না, না, অম্বাজীর কথা নয়।"

"তাহলে?"

"মাউন্ট-আবুর কথা কিছু বলুন।"

বাধ্য হয়ে শুরু করতে হয়, "প্রখ্যাত ভৌগোলিক নন্দলাল দে তাঁর 'The Geographical Dictionary of Ancient and Mediaeval India' বইতেও আবু পাহাড়কে 'অর্বুদা' বলেছেন।"

"কি বলেছেন তিনি?" সাহাবাবু জিজ্ঞেস করেন।

একটু ভেবে নিয়ে বলতে থাকি, 'It was the hermitage of Rishi Vasishtha. The Rishi is said to have created out of his fire-pit in the mountain a hero named Paramara to oppose Visvamitra while he was carrying away his celebrated Kama-dhenu. Paramara became the progenitor of the Paramara clan of Rajput. Mount Abu contains the celebrated shrine of Amba Bhavani. It contains the celebrated Jaina temples dedicated to Rishbha Deva and Neminatha. It is one of the five sacred hills of the Jainas, Which are Satrunjaya, Samet Sikhar, Arbuda, Girnar Chandragiri.'

এক সময় আমাদের আলোচনা শেষ হয়। তারপরেই কথাটা মনে পড়ে আমার—শ্রীর রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে।

সাহাবাবুকে নিয়ে নেমে আসি গাড়ি থেকে। স্টেশনে এসেই আলাপ হলো আবু-রোড নিবাসী দুজন বাঙালি যুবকের সঙ্গে। বলতে গেলে তাঁরা নিজেরাই সেধে আলাপ করলেন। নাম বিমল সরকার ও সরোজ সরকার। দুজনেই আবু রোড স্টেশনের টি.সি। হাওড়া ও বর্ধমানের ছেলে। আশ্চর্য যোগাযোগ।

সব শুনে তাঁরা আমাদের অভয় দিলেন। বললেন, "কাল সকালেই রেলওয়ে হাসপাতাল থেকে ওর রক্ত পরীক্ষা করিয়ে দেবো। বেলা দশটার মধ্যে রিপোর্ট পেয়ে যাবেন। যদি দরকার হয় ডাঃ ভাদুড়ীকে 'কল্' দেওয়া যাবে।"

"আরেকটা কথা", সবিনয়ে সাহাবাবু বলেন, "ঐ মেয়েটি ও তার মা কি কালকের দুপুরটা একটু ফার্স্ট ক্লাস ওয়েটিংরুমে থাকতে পারবে? মানে গাড়িতে দুপুরবেলা বড্ড গরম কিনা!"

"বেশ তো।"

বিমলবাবু বলেন "কাল সকালেই নিয়ে আসবেন, আমি সব ব্যবস্থা করে দেবো। দরকার হলে উনি রিটায়ারিং-রুমেও থাকতে পারেন। এখানে বেশ ভাল রিটায়ারিং রুম রয়েছে।"

বিমলবাবু ও সরোজবাবুকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ হৃষ্টচিত্তে ফিরে আসি গাড়িতে।

কিছুক্ষণ বাদেই দল বেঁধে বাস-ডিপোয় এলাম। শুধু মাসিমা পূর্ণিমা ও শ্রী আসে নি।

বিকেল সাড়ে পাঁচটায় বাস ছাড়ল। মিনিট দশেক বাদেই আমরা রাজস্থান-গুজরাত সীমান্তে উপনীত হলাম। তে-রাস্তার মোড়ে পুলিশ চেক্‌পোস্ট। পাকা বাড়ি নয়, গুটি ছয়েক তাঁবু। পথের পাশে আম ও খেজুর গাছ। তারপরে ক্ষেত আর ছোট পাহাড়।

কয়েক মিনিট বাদেই বাস ছাড়ল। অম্বাজী গুজরাতে—এখান থেকে ১৯ কিলোমিটার। আমরা এখন আর রাজস্থানে নেই, গুজরাতের মাটিতে পা দিয়েছি। এক সপ্তাহ ধরে রাজস্থানের নিরবচ্ছিন্ন সাহচর্য লাভের পরে আজ তার কাছ থেকে সাময়িক বিদায় নিতে হলো।

পথের পাশে কিন্তু এখনও রাজস্থানিদের দেখতে পাচ্ছি, অন্তত রাজস্থানের পোশাক-পরিহিত নর-নারী দেখা যাচ্ছে। তবে এঁরা গুজরাতীও হতে পারেন। কারণ সীমান্ত-অঞ্চলের অধিবাসীদের পোশাক দেখে অথবা ভাষা শুনে ঘরের খবর জানা যায় না।

পাহাড়ী পথ ধরে আমরা দক্ষিণদিকে চলেছি। একটা নদী। পুলটা ভেঙে গেছে। কিন্তু নদীতে জল নেই। নদীর বুকের ওপর দিয়ে বাস এপারে চলে এলো।

পথের দুপাশে বনময় পাহাড়, মাঝে মাঝে ঝরনা। কিছুদূর এসে আবার একটি জলহীন নদী। এরও পুলটি গত বন্যায় বিধ্বস্ত হয়েছে, এখনও সারানো হয় নি। আমরা তেমনি নদীগর্ভের ওপর দিয়েই অপর পাড়ে এলাম।

ছ'টা নাগাদ বাস অম্বাজী বাসস্ট্যান্ডে পৌঁছল। পশ্চিম-ভারতের বিকেল ছ'টা, এখনো রোদ রয়েছে—সন্ধে হতে অনেক দেরি।

অম্বাজী ছোট শহর কিন্তু বাসস্ট্যান্ডটি বেশ বড়। শহরটিও সুন্দর। বাঁধানো পথের দুদিকে বাড়ি-ঘর, দোকান-পাট আর ধর্মশালা। তীর্থকেন্দ্রিক শহর। প্রতিদিন অসংখ্য তীর্থযাত্রী আসেন। দেড়শো ধর্মশালা নাকি আছে এখানে।

কলকাতার মতো এখানেও একবেলা দোল। কিন্তু হোলির মাতন হয় নি শেষ। হয়তো আজ সারারাত ধরেই চলবে। পথের মাঝে নাচের আসর বসেছে। ছেলে-মেয়েরা ঢোল ও বাঁশি বাজিয়ে হাত ধরাধরি করে নাচগান করছে।

শঙ্করী সহসা বললো, "ঘোষদা, আজ কিন্তু আপনি অম্বাজী সম্পর্কে কিছুই বলেন নি?"

আমি কিছু বলতে পারার আগেই বিউটি জিজ্ঞেস করে, "অম্বা মানে কি মামু?"

"মা। সতী, কালী কিম্বা দুর্গা।" উত্তর দিই। বলি, "আমাদের কাছে শব্দটি অপরিচিত হলেও দক্ষিণ ভারতের বহু গ্রামে নিয়মিত ভাবে অম্বাদেবীর পুজো হয়। তবে সেখানে তিনি অম্বা নন, অম্মা। তাঁর বহু নাম—অম্মনী অম্মা, অম্মল অম্মান, মং-কালী অম্মা, পুনী অম্মা, কানী অম্মা, মতিয়া অম্মা, পলেরী অম্মা প্রভৃতি। মহারাষ্ট্রের কোন কোন গ্রামেও অম্বাদেবীর পূজার প্রচলন রয়েছে। তবে সেখানে তাঁর নাম অম্লা।

"মহারাষ্ট্র ও দক্ষিণ ভারতে অম্বাদেবীর কিন্তু কোন নির্দিষ্ট মূর্তি নেই। পূজারীরা সাধারণত একখানি পাথরে সিঁদুর মাখিয়ে অম্বাদেবীর পুজো সেরে থাকেন। কলেরা অথবা বসন্ত মহামারী আকারে দেখা দিলে ঘটা করে তাঁর পুজো করা হয়। পুজোতে পাঁঠা কিংবা মোষ বলি দেওয়া হয়।"

"ওকি থামলেন কেন?" শঙ্করী বলে ওঠে।

বাধ্য হয়ে আমাকে আবার আরম্ভ করতে হয়, "চারিদিকে পাহাড়ের ঘেরা এই জায়গাটির প্রাচীন নাম অরাসুর। এটি ব্রিটিশ আমলে মাহি-কান্তা এজেন্সির অন্তর্গত ছিল। আরাবলী পর্বতমালার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত সরস্বতী নদীর উৎস এখান থেকে খুবই কাছে। প্রাক্তন দেশীয় রাজ্যের রাজধানী দান্তা এখান থেকে মাত্র ২৪ কিলোমিটার দক্ষিণে।

"এই তীর্থের উৎপত্তি সম্পর্কে আজ কোন সঠিক সিদ্ধান্ত হয় নি, তবে অনেকে অনুমান করেন যে অম্বাদেবী অনার্য ঈশ্বরী। পরবর্তীকালে আর্যরা তাঁকে দেবীর মর্যাদা দিয়ে অম্বা-ভবানী নামে অভিহিতা করেছেন। আজও তিনি সেই নামেই পরিচিতা।

"কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী রুক্মিনী একবার যখন সখীদের সঙ্গে অম্বা ভবানীর পুজো দিয়ে বনপথে দ্বারকায় ফিরে যাচ্ছিলেন, তখন চেদিরাজ শিশুপাল তাঁর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন। অসহায় রুক্মিনী স্বামীকে স্মরণ করতেই সর্বজ্ঞ শ্রীহরি সেখানে উপস্থিত হয়ে শিশুপালকে সমুচিত শিক্ষা দেন।"

"শিশুপাল রুক্মিনীর প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, তাই না?" সেজদি প্রশ্ন করেন।

উত্তর দিই, "হ্যাঁ। তিনি রুক্মিনীকে বিয়ে করতে চেয়েছিলেন কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ তাঁর সে আশা পূর্ণ করতে দেন নি।"

"শ্রীকৃষ্ণই তো শিশুপালকে বধ করেছিলেন।"

"হ্যাঁ, যুধিষ্ঠিরের অভিষেক দিবসে তিনি সভামধ্যে শ্রীকৃষ্ণকে অপমান করেন। তখন মধুসূদন বাধ্য হয়ে সুদর্শনচক্র দিয়ে শিশুপালের মাথা কেটে ফেলেন।"

আমরা বাজারের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলেছি। পথের দুপাশে কাপড়-চোপড়, বাসন-পত্র ও মনোহারী দোকান। ঝক্‌ঝকে দোকানের সামনে সারি বেঁধে বসে আছে ভিক্ষুকের দল। খানিকটা দূরে মন্দির তোরণ দেখা যাচ্ছে।

"তাহলে তো আম্বাজী খুবই প্রাচীনতীর্থ?" সত্যেনদা জিজ্ঞেস করেন।

"হ্যাঁ। কথিত আছে মা-যশোদা নাকি মানত রক্ষা করতে একবার শিশুকৃষ্ণকে এখানে এনে মস্তক-মুণ্ডন করিয়েছিলেন।"

"এ সম্পর্কে ইতিহাস কি বলে?" শঙ্করী জিজ্ঞেস করে।

ঐতিহাসিকদের মতে বল্লভীদের আমলে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকেই অম্বা-ভবানী একটি জনপ্রিয় তীর্থ রূপে পরিচিত।"

"এখানে উৎসব হয় কখন?" বৌদি জিজ্ঞেস করেন।

"বছরে তিনবার উৎসব হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি পুণ্যার্থীর সমাগম ঘটে নবরাত্রির সময়ে, মানে সেপ্টেম্বর মাসে। তখন দেবীর জন্মতিথি উপলক্ষে হাজার হাজার পুণ্যার্থী এখানে আসেন। আগে নবরাত্রির অষ্টম রাতে দান্তার রাণা নিয়মিত এই মন্দিরে আসতেন। তিনি ঘোড়ার লেজের পাখা দিয়ে অম্বাজীকে হাওয়া করতেন। যজ্ঞের সময়ে রাণা সামনে উপস্থিত থাকতেন। যজ্ঞশেষে বলি এবং মা-কে মদ নৈবেদ্য দেওয়া হতো। রাণা নিজে উপস্থিত থেকে পুণ্যার্থীদের মাঝে মিষ্টান্ন বিতরণ করতেন। তখন দলে দলে ভীল সেই উৎসবে যোগ দিতেন।"

"আচ্ছা ঘোষদা, এখান থেকে সরস্বতীর উৎস কতদূর?" শঙ্করী জিজ্ঞেস করে।

উত্তর দিই, "মাত্র সাত কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে। সেখানে কোটেশ্বর মহাদেবের মন্দির

আছে। সাধারণত যে-সব পুণ্যার্থী এখানে আসেন, তাঁদের প্রায় সকলেই সেখানে যান।"

"কেবল আমরা যাচ্ছি না।"

"হ্যাঁ। আমরা যে পুণ্যার্থী নই।"

"আমরা তা হলে কি?"

"আমরা শখের তীর্থযাত্রী।"

তোরণ পেরিয়ে মন্দির এলাকায় প্রবেশ করি। বেশ মজবুত এবং সুদৃশ্য তোরণ। চারিদিকে প্রাচীর পরিবেষ্টিত অনেকটা জায়গা জুড়ে মন্দির এলাকা। তোরণ থেকে মন্দিরদ্বার পর্যন্ত সুবিস্তীর্ণ অঙ্গনটি বাঁধানো। আঙ্গিনার দুপাশেও কিছু দোকান পাট—বই থেকে শুরু করে পুজোর উপকরণ ও প্রসাদের দোকান। নারিকেল, নকুলদানা, মিছরি, আবীর, লালসুতো ও রেশমী রুমাল সবই পাওয়া যাচ্ছে। পুণ্যার্থীরা মায়ের পায়ে রুমাল ছুঁইয়ে ঘরে ফিরে মনস্কামনা সিদ্ধ না হওয়া পর্যন্ত রুমালখানি গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখেন।

আচ্ছা, আমারও কি কোন কামনা আছে? আছে বৈকি। শ্রীর আরোগ্যলাভ ও মানসীর শান্তিলাভ। তাহলে কি আমিও দুখানি রুমাল কিনব? থাক্‌গে, দর্শনের সময় মাকে মনে মনে আমার কামনার কথা বলব। দেখি, অন্তর্যামী মা-ভবানী আমার মনস্কামনা পূর্ণ করেন কি না?

শুধু দোকান নয়, কয়েকজন ভিক্ষুক এবং সাধুও রয়েছেন এখানে। সাধুরাও পয়সা চাইছেন।

মন্দির এলাকার ভেতরেই পূজারী ও সেবকদের বাড়ি এবং যাত্রীদের জন্য ছোট একটি ধর্মশালা। মন্দিরটি তেমন বড় নয়, তবে মর্মর পাথরে তৈরি।

এখন মন্দির বন্ধ, কিছুক্ষণ বাদেই খুলবে। তাই পুণ্যার্থীরা সারি বেঁধে চত্বরে বসে আছেন। দুটি সারি—একটি ছেলেদের, একটি মেয়েদের। আমরা সারিতে সামিল হই।

একটু বাদে দাদাকে জায়গা রাখতে বলে আমি ও সত্যেনদা মন্দিরের দপ্তরে আসি। আলাপ হয় মন্দির কমিটির ইন্‌সপেক্টার শ্রী এ. এম. পাটানের সঙ্গে। তিনি জানান—কিছুদিন হলো রাজ্যসরকার এ মন্দিরের পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। একজন ডেপুটি কালেক্টর এখন মন্দিরের পরিচালক।

কথায় কথায় শ্রীপাটান আমাদেন অম্বাজী মন্দির ও শহর সম্পর্কে বহু খবর দিলেন। বললেন—অম্বাজী একটি প্রাচীন জনপদ আবু-রোডের ২৪ কিলোমিটার দক্ষিণে ২৪°১২´ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৬৫°৫০´ পূর্ব দ্রাঘিমায় অবস্থিত। উচ্চতা ৫৪৮.৬৪ মিটার। স্থায়ী জনসংখ্যা চার হাজারের কিছু বেশি। তবে বছরে প্রায় ছ'লক্ষ দর্শনার্থী এখানে আসেন।

অম্বাজী সিদ্ধক্ষেত্র—শক্তিপীঠ। সতীর হৃদয়ের বামাংশ এখানে পড়েছে। মাতৃতীর্থ বলে অম্বাজী সকল ধর্মের পুণ্যক্ষেত্র। আদিবাসী ভীল থেকে শুরু করে পার্শী, এবং জৈন ভক্তরা সবাই নিয়মিত মা-কে দর্শন করতে আসেন। মেলার সময় ভীলদের লোকনৃত্য অম্বাজীর প্রধান আকর্ষণ।

কথিত আছে—দিলওয়ারায় মন্দির নির্মাণের আগে ভক্ত-জৈন বিমলা শাহ নাকি এখানে এসে মায়ের আশীর্বাদ নিয়ে গিয়েছিলেন। সম্ভবত সপ্তম শতাব্দী থেকেই অম্বাজী পুণ্যতীর্থ রূপে পরিচিত। বর্তমান মন্দিরটি দান্তার রাণা ষোড়শ শতাব্দীতে তৈরি করে দিয়েছেন।

শ্রীপাটান আরও জানালেন—মন্দিরের সামনে এই প্রশস্ত চত্বরকে বলে চক্। চকের

চারকোণে গণপতি, বরাহ, শিবশঙ্কর ও দত্তাত্রেয় মন্দির রয়েছে। ছোট হলেও মন্দিরগুলি শ্বেতপাথরের। কারণ অম্বাজীর চারিদিকের পাহাড়গুলিতে প্রচুর শ্বেতপাথর পাওয়া যায়।

সন্ধ্যারতির সময়েই নাকি অম্বাজীর মন্দিরে সবচেয়ে বেশি ভক্তের সমাগম হয়। মন্দিরে মায়ের মূর্তি এমন ভাবে স্থাপিত যে দর্শনমাত্র হৃদয়ে ভক্তির সঞ্চার হয়। মায়ের সাজ-সজ্জাও নাকি দেখবার মতো। তিন বেলা তাঁকে তিনভাবে সাজানো হয়—সকালে বালস্বরূপা, দুপুরে যুবতীজায়া ও সন্ধ্যায় বৃদ্ধা-বিনোদিনী। পুজোর সময় প্রতিদিন মায়ের বাহন পাল্টানো হয়—রোববারে বাঘ, সোমবারে নন্দী, মঙ্গলবারে সিংহ, বুধে ঐরাবত, বৃহস্পতিতে গড়ুর, শুক্রতে হংস এবং শনিবারে হাতি।

গর্ভমন্দিরেই অহোরাত্র ঘৃতপ্রদীপ জ্বলে। মন্দিরের ভেতরে একটি যজ্ঞশালা এবং বাইরে পরিক্রমার পথ রয়েছে।

ঘণ্টার শব্দ শুনে তাড়াতাড়ি দপ্তর থেকে বেরিয়ে আসি, লাইনে দাঁড়াই। মন্দিরদ্বার উন্মুক্ত হলো। পুণ্যার্থীর প্রবাহ এগিয়ে চলল।

কিন্তু বেশিদূর এগোতে পারি না। ছোট মন্দির, আজ দোলপূর্ণিমা বলে খুবই ভিড় হয়েছে। কিছু যাত্রী প্রবেশ করার পরেই আবার দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

তৃতীয়বারে আমার পালা এলো। পনেরো ধাপ শ্বেতপাথরের সিঁড়ি বেয়ে আরেকটি তোরণে আসি।

তোরণ পেরিয়ে শ্বেতপাথরের বাঁধানো ছোট একফালি উঠোন। তারপরে মন্দির—ছোট চৌকো মন্দির। শ্বেতপাথরের দেওয়াল। নানা রঙের কাচ বসানো। সামনের দেওয়ালে দুখানি দুর্গার ছবি—ব্যাঘ্রবাহিনী দুর্গা।

চারধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে মন্দিরে উঠে আসি। প্রথমে নাট-মন্দির তারপরে গর্ভ-মন্দির। নাট-মন্দিরে কয়েকটি সিঁদুরলিপ্ত সিংহ, বরাহ ও ব্যাঘ্র প্রভৃতির মূর্তি। দেবীর ভক্তরা দেবীর বাহনদেরও আরতি করছেন।

গর্ভ-মন্দিরটি খুবই ছোট, নিচু ছাদ। রুপোর পাতে মোড়া দরজা। ভেতরে সিংহের ওপরে মা বসে আছেন। মহিষাসুরমর্দিনী হলেও মা-জগদম্বার মূর্তিটি বড়ই স্নেহশীলা। তাঁর মাথায় ছত্র, কানে কুণ্ডল, নাকে নথ—সর্বাঙ্গেই মূল্যবান অলঙ্কার ও বস্ত্রসম্ভার। কাঁসর ও ঘণ্টা সহযোগে আরতি চলেছে। ভক্তরা সমবেত কণ্ঠে শিবানন্দ স্বামী রচিত সেই বিখ্যাত গুজরাতী গান গেয়ে চলেছেন—'জয় আদ্যাশক্তি মা, জয় আদ্যাশক্তি অখণ্ড-ব্রহ্মাণ্ড উপজাব্যা

পড়বে পন্থকমা।

জয় জয় মা জগদম্বে।।...'

ভীষণ ভিড়। কয়েকবার চেষ্টা করেও মায়ের কাছে এগোতে পারলাম না। অগত্যা ভুবন-মনমোহিনী দিব্যভূষণ-ভূষিতা কমনীরা কান্তিধারিণী মহাদেবীকে দূর থেকেই প্রণাম জানিয়ে বলি—মা! তুমি শ্রীকে ভাল করে দাও মা!

।। ষোল ।।

কাল সারা রাত ঘুমোতে পারে নি মেয়েটা। যেমন জ্বর, তেমনি কাশি। হামও খুব উঠেছে। বন্ধ গাড়িতে বড্ড কষ্ট পেয়েছে শ্রী। পূর্ণিমা, শঙ্করী ও মাসিমার কথা বাদই দিলাম, আমাদেরও

ঠিক ঘুম হয় নি।

সকালে চা খেয়েই স্টেশনে এলাম। দেখা হলো বিমলবাবুর সঙ্গে। তিনি রেলওয়ে হাসপাতালে ফোন করে শ্রীর রক্ত পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন। তারপরে বললেন, "ওদের নিয়ে আসুন ফার্স্ট ক্লাশ ওয়েটিং-রুমে। আমি বেয়ারাকে বলে দিচ্ছি।"

পূর্ণিমা, মাসিমা ও শ্রীকে নিয়ে এলাম স্টেশনে। বিমলবাবু নিজে 'ডিভ্যান'-এর ওপরে শ্রীর বিছানা পেতে দিলেন।

ঝড়ের বেগে সহসা শঙ্করী এসে হাজির হলো।

মাসিমা বললেন, "তুই তৈরি না হয়ে এখন আবার এলি কেন?"

"আমি মাউন্ট-আবু যাবো না!"

"কেন?"

"আমার ভাল লাগছে না। আমি ন'দির সঙ্গে থাকছি, তুমি যাও, দিলওয়ারা দেখে এসো।"

"আমার সঙ্গে কাউকেই থাকতে হবে না। বাণেশ্বর, জ্ঞান ওরা রয়েছে, বিমলদারা আছেন, তোরা দুজনেই দিলওয়ারা দেখে আয়।"

বিমলবাবু বলেন, "এখানে তো আমরাই রয়েছি। রক্ত নিয়ে গেছে, ঘণ্টা দুয়েকের ভেতরে রিপোর্ট পেয়ে যাবো। ডাঃ ভাদুড়ীকে কল্ দিয়েছি, উনিও এসে যাবেন। আপনারা দিলওয়ারা দেখে আসুন না।"

কিন্তু কারও কোন যুক্তি শঙ্করীকে টলাতে পারল না। শেষ পর্যন্ত পূর্ণিমার সঙ্গে শঙ্করীকেও আবু-রোডে রেখে আমরা রওনা হলাম মাউন্ট-আবুর পথে। আমার ঘড়িতে এখন সাড়ে এগারোটা।

স্টেশন থেকে ১০ কিলোমিটার প্রায় সমতল পথ পেরিয়ে বাস চড়াই ভাঙতে শুরু করল।

এ জায়গাটার নাম তালেহটি। আঁকাবাঁকা মসৃণ ও প্রশস্ত পথ। পথের দু-পাশেই ঘনবন।

১৯৬০-৬১ সালে রাজ্য সরকার এই অঞ্চলের ১১২.৬৪ বঃ কিঃ মিটার এলাকাকে সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বলে ঘোষণা করেছেন। এখানে একটি অভয়ারণ্য গড়ে তুলেছেন।

আগে এ অঞ্চল বন্যপ্রাণীর জন্য বিখ্যাত ছিল। এখন বাঘ ও সিংহ নেই। গুটিকয়েক চিতাবাঘ আর ভালুক, সম্বর, শুয়োর, সাপ, বনমোরগ প্রভৃতি এই অভয়ারণ্যের প্রধান প্রাণী।

পথের প্রকৃতি সত্যই সুন্দর। বারবার আমাকে হিমালয়ের পথের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে। মরুভূমির দেশ রাজস্থানে যে এমন সবুজের সমারোহ দেখতে পাবো, তা ভাবতেই পারি নি।

কিন্তু মনোরম প্রাকৃতিক পরিবেশ আজ আমার মনকে ভরে তুলতে পারছে না। মনটা যে বড়ই ভারী হয়ে আছে। শ্রীর ব্লাড-রিপোর্ট এসে পৌঁছবার আগেই আমাদের মাউন্ট-আবু রওনা হতে হয়েছে। হাম উঠে গেছে সত্যি, কিন্তু জ্বরটা কমছে না কেন? শুনেছি হাম থেকে কঠিন রোগ হতে পারে। একটা কথা যে কিছুতেই ভুলতে পারছি না, শ্রীর এই কষ্টের কারণ আমি। আমারই অবিমৃষ্যকারিতার জন্য এই নিরপরাধ শিশু আজ এমন দুঃসহ যন্ত্রণা ভোগ করছে। আর তার খেসারত দিতে হচ্ছে পূর্ণিমা ও শঙ্করীকে। আবু-রোডে এসেও তারা দিলওয়ারা দেখতে পেল না।

চমৎকার একটি জায়গায় এসে বাস থামল। পায়লট একেবারে ইঞ্জিন বন্ধ করে দিলেন। ম্যানেজার জানায়, "এ জায়গাটির নাম ছিপাবেরি। উচ্চতা ৫৮১.৫৬ মিটার। এখান থেকে

আজমীর ৩৫১ কিলোমিটার আর আমেদাবাদ ২০৬ কিলোমিটার। ইঞ্জিন ঠাণ্ডা করবার জন্য বাস ওখানে পনেরো মিনিট থামবে। আমরা আবু-রোড থেকে ১৫ কিলোমিটার অর্থাৎ অর্ধেকের একটু বেশি পথ এসেছি। আবু রোড থেকে মাউন্ট-আবু ২৯ কিলোমিটার। আপনারা ইচ্ছে করলে নেমে হাত পা খেলিয়ে নিতে পারেন।"

ম্যানেজারের পরামর্শ অমান্য করা উচিত নয়। সুতরাং নেমে পড়ি। জায়গাটি ভারি সুন্দর। প্রশস্ত ও সমতল। পথের পাশে বিরাট একটি বটগাছ। প্রায় 'বনস্পতির বৈঠক' বলা যেতে পারে। তার শীতল ছায়ায় পথটি পান্থনিবাসে পরিণত। পথের একদিকে একটি দরগা—সঈদ সুদম শাহ্র দরগা। আরেকদিকে গুটিকয়েক চা ও শীতল পানীয়ের দোকান।

আমরা তৃষ্ণার্ত কিন্তু শীতল পানীয়ের দোকানে না গিয়ে শীতল জলের জালার কাছে এলাম। দরগার পাশেই সেই জলপাত্র। দুটি তরুণী শ্রান্ত পথিকদের তৃষ্ণা মেটাচ্ছে। তারা আঁজলা করা হাতে জল ঢেলে দেয়—ঠাণ্ডা ও মিঠে জল। আমার আকণ্ঠ তৃষ্ণা দূর হলো।

গাছের শাখায় শাখায় শাখামৃগের মেলা বসেছে—অসংখ্য বানর ইতস্তত ঘোরা-ফেরা করছে। আজ শ্রী থাকলে না জানি কত খুশি হতো। সেদিন জয়পুরে গোবিন্দজীর মন্দিরে হনুমান দেখে সে আনন্দে চিৎকার করে উঠেছিল। সেদিন শ্রী, বিউটি এবং শঙ্করী চানা দিয়ে রামভক্তদের সেবা করেছিল। আজও নিশ্চয়ই তারা সুগ্রীবের বংশধরদের সেবা করার চেষ্টা করত। কিন্তু আজ কোথায় শ্রী, কোথায় শঙ্করী? আর বিউটি? সে যেন থেকেও নেই। বাস থেকেই নামে নি! বোধহয় শ্রীর কথাই ভাবছে বসে বসে।

হর্ন শুনে বাসের কাছে আসি। নামার সময় খেয়াল করি নি, এখন দেখছি, পথের পাশে বেশ বড় বড় কয়েকখানি সাইন বোর্ড রয়েছে। মাউন্ট-আবুর বিভিন্ন হোটেলের বিজ্ঞাপন।

হোটেল নয় অন্য একটি বিজ্ঞাপন আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেটিকে অবশ্য বিজ্ঞাপন না বলে নিমন্ত্রণ পত্র বলাই উচিত হবে। রাজস্থানের বন-বিভাগ আমাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন—

'Spend some time with us too. Visit Mt. Abu Wild Life Sanctuary. Contact Wild Life Ranger.'

বেলা ঠিক একটার সময় আমরা মাউন্ট-আবু শহরের উপকণ্ঠে উপস্থিত হলাম। চুঙ্গি বা অক্‌ট্রয় ট্যাক্স দেবার জন্য বাস থামাতে হলো। শহরের দু-দিক থেকে দুটি পথ এসে মিশেছে এখানে। পথের পাশে খাড়া পাহাড়ের ঢাল আর তারই বুক জুড়ে অসংখ্য খেজুর গাছ। পাথরেও যে খেজুর গাছ জন্মায় জানা ছিল না এতদিন।

পাহাড়ের ওপরে উঠে এলাম। পৌঁছলাম শৈলপুরীতে। চারিদিকে পাহাড়ে ঘেরা চমৎকার শহর। শঙ্করী সঙ্গে এলে নিশ্চয়ই বলে বসত—ঘোষদা, চুপ করে রয়েছেন কেন? মাউন্ট-আবুর কথা বলুন।

আজ কেউ আমাকে জিজ্ঞেস করছেন না। অগত্যা মাউন্ট-আবুকে দেখতে দেখতে আমি আপন মনে তারই কথা ভেবে চলি—

আবু-পাহাড়ের ওপর নাম 'অর-বুধা' বা জ্ঞানের পাহাড়। মহাভারতের বনপর্বে এই পাহাড়কে বলা হইয়াছে 'অর্বুদ-তীর্থ'। বলা হয়েছে—'হিমবৎসুত অর্বুদ-তীর্থে গমন করিবে;

পূর্বে যে স্থানে পৃথিবীর ছিদ্র ছিল ও যে স্থানে মহর্ষি বশিষ্ঠের ত্রিলোকবিশ্রুত আশ্রম, তথায় একরাত্রি বাস করিলে সহস্র গো দানের ফল লাভ হয়। জিতেন্দ্রিয় ও ব্রহ্মচারী হইয়া পিঙ্গ তীর্থে স্নান করিলে শত-কপিলাদানের ফল লাভ হয়।'

প্লিনী (Pliny) অবশ্য তাঁর প্রাকৃতিক ইতিহাসে (৬৫ খ্রীঃ) আবু পাহাড়কে বলেছেন *'Mons Capitalia'* অর্থাৎ চরম শাস্তিদানের পাহাড়। মনে হয় সেকালে কেউ কোন গর্হিত অন্যায় করলে, তাকে হিংস্র শ্বাপদ পরিপূর্ণ আবু পাহাড়ে নির্বাসন দেওয়া হতো।

টলেমী (Ptolemy—A D 150) আবু পাহাড়কে বলেছেন 'Appocopi montes' বা অসুন্দরের পাহাড়।

য়ুয়ান চোয়াং (৬২৯-৬৪৫ খ্রীঃ) তাঁর বর্ণনায় আবু পাহাড়ের উল্লেখ করেছেন। তবে তিনি পাহাড়ে আরোহণ করেন নি, পাদদেশ দিয়ে গিয়েছেন।

যদিও এ পাহাড়কে আরাবল্লী পর্বতশ্রেণীর অন্যতম বলে বিবেচনা করা হয় তবু প্রকৃতপক্ষে এটি আরাবল্লী থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন একটি পৃথক পাহাড়। আরাবল্লী এবং আবু-পাহাড়ের মাঝখানে রয়েছে ১০ কিলোমিটার দীর্ঘ সংকীর্ণ পশ্চিম-বনাস উপত্যকা। তাই আবু পাহাড়ের অবস্থান সম্পর্কে ১৯০৮ সালে প্রকাশিত ইম্পিরিয়াল গেজেটিয়ারে বলা হয়েছে, 'it rises suddenly from the flat plain like a rocky island lying off the sea-coast of a continent.'

ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত আবু পারমার রাজবংশের স্বাধীন রাজ্য ছিল। এই বংশের শেষ স্বাধীন রাজার নাম ধরবর্ষা (১২৬৮ খ্রীঃ)। তারপরে দেওরা-চৌহান বংশীয় রাজারা আবু পাহাড় অধিকার করে নেন। এই অধিকার করার ইতিহাস বড়ই বৈচিত্র্যময়।

আবু পাহাড়কে পারমাররা তখন দুর্ভেদ্য দুর্গে পরিণত করে তুলেছেন। দেওরা-চৌহানরা জানতেন, পাহাড়ে উঠে পারমারদের পরাস্ত করা সম্ভব নয়। কাজেই তাঁরা কৌশলের আশ্রয় নিলেন। পারমারদের কাছে প্রস্তাব পাঠালেন—বৈবাহিক সম্পর্কের মাধ্যমে আমরা আপনাদের সঙ্গে আত্মীয়তা স্থাপন করতে চাই। আপনারা যদি বারোজন কুমারীকে নিয়ে পাহাড়ের পাদদেশে নেমে আসেন, তাহলে বিবাহ অনুষ্ঠানটি সুসম্পন্ন হতে পারে।

প্রস্তাবটি পারমারদের পছন্দ হলো। মহাসমারোহে শোভাযাত্রা সহকারে দ্বাদশটি কুমারীকে নিয়ে তাঁরা নেমে গেলেন পাহাড়ের পাদদেশে। সঙ্গে সঙ্গে সশস্ত্র চৌহানরা ঝাঁপিয়ে পড়লেন নিরস্ত্র পারমারদের ওপরে। তাঁরা আবু পাহাড় অধিকার করে নিলেন।

দেওরা-চৌহান রাজা রাও লুম্ভা নিজেই এই অভিনব অভিযানের নেতৃত্ব করেছিলেন। তাঁর বংশধরগণ প্রায় একশ' বছর এখানে রাজত্ব করেছেন। তারপরে ১৪০৫ খ্রীস্টাব্দে তৎকালীন আবুর রাজা সিরোহিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ফলে এই রমণীরা স্থানটি কালক্রমে জনহীন হয়ে পড়েছিল। কর্নেল টড একে আবার জনপ্রিয় করে তোলেন। তিনি তাঁর 'Travels in Western India' বইতে এ সম্পর্কে বলেছেন, 'the discovery was my own. To Abu I first asigned a local habitation and a name when all those regions were a *terra* incognita to my countrymen.'

মহামতি টডের সেই প্রথম দর্শন অর্থাৎ ১৮২২ সালে জুন মাস থেকে ১৮৪০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত আবু পাহাড় ছিল সিরোহি রাজ্যের ব্রিটিশ পলিটিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট্ এবং যোধপুর রাজ্যের উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের গ্রীষ্মনিবাস। ১৮৪০ সালে এটি যুদ্ধে পঙ্গু ব্রিটিশ সৈন্যদের

গ্রীষ্মাবাসে পরিণত হয়।

১৮৪৫ সালে একটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র নির্মাণের জন্য সিরোহির রাজা কয়েকটি সর্তে এখানকার কিছু জমি ব্রিটিশ সরকারকে দান করেন। সেই সর্তগুলির মধ্যে একটু ছিল—এখানে গোহত্যা কিংবা গোমাংস ভক্ষণ করা চলবে না। বলা বাহুল্য সেদিনকার ব্রিটিশ সরকার যেমন সে সর্ত পালন করেন নি, আজকের জাতীয় সরকারও তার কোন মর্যাদা দিচ্ছেন না। নইলে জৈনতীর্থ আবু-পাহাড়ে মদ্যপানের এমন ঢালাও ব্যবস্থা থাকবে কেন? শুনেছি আবু-পাহাড় ধনী গুজরাতীদের কাছে এত জনপ্রিয় হবার কারণ, গুজরাতে মদ্যপান নিষিদ্ধ এবং এটি গুজরাত সীমান্তের রাজস্থানি শহর।

একটি তে-রাস্তার মোড়ে এসে বাস বাঁয়ে বাঁক নিল। বাঁকের মুখে ইংরেজিতে লেখা—দিলওয়ারা মন্দির ২ কিলোমিটার। দুপুর ১২টা থেকে বিকেল ৬টা পর্যন্ত মন্দির খোলা থাকে।

আর মাত্র দু'কিলোমিটার। তার মানে কয়েক মিনিট বাদেই আমরা পৌঁছব সেই বিশ্ববিখ্যাত মন্দিরের তোরণে।

বাস ছুটে চলেছে। হঠাৎ বাঁদিকের পাহাড়টি দেখিয়ে ম্যানেজার বলে ওঠে, "এরই চূড়ায় অর্বুদা মায়ের মন্দির অথবা কন্দর আশ্রম।"

"কন্দর কেন? ওখানে কোন গুহা আছে নাকি?" বিউটি জিজ্ঞেস করে।

ম্যানেজার উত্তর দেয়, "হ্যাঁ। একটা গুহার ভেতরে দেবী অম্বিকা অধিষ্ঠিতা। হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়। গুহার গায়ে দেবীমূর্তি খোদিত। স্বপ্নাদেশে আবিষ্কৃত এই অর্বুদাদেবী থেকেই আবু নামটি এসেছে।" থামে ম্যানেজার। একবার বাইরে তাকায়। তারপরেই আবার বলে ওঠে, "আমরা এসে গিয়েছি।"

বাস থামে। একে একে সবাই নেমে আসি পথে। সামনেই মন্দির-তোরণ।

মন্দির যতই বিখ্যাত হোক্, তোরণ দেখছি মোটেই দর্শনীয় নয়। তাছাড়া এখানে যে মন্দির আছে, তা বাস থেকে নেমেও বুঝতে পারছি না। মনে হয় নির্মাতারা ইচ্ছে করেই তাঁদের এই অপরূপ সৃষ্টিসম্ভারকে পাহাড়ের আড়ালে লোকচক্ষুর অন্তরালে নির্মাণ করেছিলেন। আর তাই হয়তো আজ দিলওয়ারা মন্দির দর্শনের সৌভাগ্য হচ্ছে আমাদের। দিলওয়ারা পরধর্মদ্বেষী সুলতান ও সম্রাটদের নজরে আসে নি।

মন্দির এলাকায় প্রবেশ করি। পথের দুদিকে দুটি মন্দির। বাঁদিকেরটি চৌমুখা মন্দির, ডানদিকেরটি পিত্তলহর মন্দির। পিত্তলহর উঁচু পাঁচিলে ঘেরা, দেখা যাচ্ছে না। দেখা যাচ্ছে চৌমুখা মন্দিরকে।

আমরা সেদিকেই যেতে চাই। ম্যানেজারই বাধা দেয়। বলে, "এটি পরেশনাথের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত অসম্পূর্ণ মন্দির। সময় হাতে থাকলে যাবার পথে দেখে যাবেন একবার।" একটু থামে ম্যানেজার, তারপরেই চেঁচিয়ে বলতে থাকে, "মা-ঠাকুরমা, দাদা-দিদি-বৌদি, কাকা-জেঠা ও মামা-মাসিরা, আমরা এখন আবু-পাহাড়ের দিলওয়ারায় এসেছি। এখানে মোট পাঁচটি মন্দির আছে—পরেশনাথ বা চৌমুখা মন্দির, পিত্তলহর, খার্তার-বসাহি এবং বিমলা বসাহি ও লুনা-বসাহি। এর মধ্যে দেখবার মতো হলো শেষের মন্দির দুটি। কাজেই আমরা প্রথম সেই দুটি মন্দির দেখে নেব। তারপরে হাতে সময় থাকলে, অন্য তিনটি মন্দির দেখব, না থাকলে দেখব না। কারণ বিমলা-বসাহি ও লুনা-বসাহি দর্শন করলেই দিলওয়ারা দর্শন করা হয়ে যায়।"

আমরা আর একটি তোরণে আসি। একটিও ছোট তোরণ। তোরণের সামনে মন্দিরের অফিস ও জুতো রাখবার জায়গা। এখান থেকেও বোঝা যাচ্ছে না যে সামনে কোন মন্দির আছে।

দারোয়ানের নির্দেশে নির্দিষ্ট স্থানে জুতো রেখে দিই। দারোয়ান বলে—এখানে ছবি তোলা নিষেধ নয়। তবে ক্যামেরা ভেতরে নিতে হলে দুটি টাকা মাশুল দিতে হবে।

তাও ভাল, দু'টাকার বিনিময়ে বিশ্ববিখ্যাত মন্দিরের ছবি তোলা যাবে। তাড়াতাড়ি অফিসে গিয়ে টাকা জমা দেই। দাদা এবং সরকারদাও তাই করলেন।

আমরা তোরণ পেরিয়ে ভেতরে আসি।

কয়েক পা হেঁটেই মন্দির—বিমলা-বসাহি। গুজরাতের প্রথম শোলাঙ্কি রাজা ভীম দেবের জৈনমন্ত্রী বিমলা শাহ ১০৩১ খ্রীস্টাব্দে এই মন্দিরে নির্মাণ করান। মন্দিরটি প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথের পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। খুব সাধারণ ঘরে জন্মগ্রহণ করেও বিমলা শাহ আপন শৌর্য ও কর্মক্ষমতায় তৎকালীন চালুক্য সাম্রাজ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি বলে স্বীকৃত হয়েছিলেন। তাঁর গুরুদেব জৈন সন্ন্যাসী এবং মহাপণ্ডিত ধর্ম ঘোষ সুরির নির্দেশে তিনি এই জগদ্বিখ্যাত মন্দিরটি তৈরি করিয়েছেন।

তোরণের পরে একফালি ফাঁকা জায়গা পেরিয়ে মন্দিরদ্বারে এলাম। খুবই সাধারণ একটি দ্বার, কিন্তু ভেতরে প্রবেশ করেই অসাধারণত্বের সম্মুখীন হলাম। এতক্ষণে আমরা মন্দির চত্বরে প্রথম অংশে উপস্থিত হয়েছি। পূর্বমুখী মন্দিরের এই আচ্ছাদিত চৌকো চাতালে রয়েছে বিশটি শ্বেতপাথরের হাতি। তারা বিমলা শাহ এবং তাঁর পরিবারবর্গকে শোভাযাত্রা সহকারে মন্দিরে নিয়ে চলেছে। প্রতিটি মূর্তি যেমন নিখুঁত, তেমনি সুন্দর।

নির্মাতাকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানিয়ে একটি অর্ধচন্দ্রাকার তোরণের সামনে আসি। দেওয়ালে ভৈরবের ছবি। তাঁর হাতে নরমুণ্ড, পেছনে কুকুর। বিচিত্র ব্যাপার, জৈন মন্দিরে এমন ছবি!

আমরা তোরণ পেরিয়ে মন্দিরের সামনে উপস্থিত হলাম। বিস্ময় ও আনন্দে হতবাক হয়ে গেলাম। শুধু অনিন্দ্যসুন্দর কারুকার্যের জন্য নয় শ্বেতপাথর ছাড়া অন্য কোন পাথর ব্যবহার করা হয় নি বলে। অথচ পণ্ডিতরা অনুমান করেন ১১২৭ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত জাওয়াইয়া (মাকরাণা) থেকে এই সব পাথর আনা হয়েছে।

আজ থেকে প্রায় এক হাজার বছর আগে, যখন মানুষ স্টিম অথবা বিদ্যুতের ব্যবহার জানত না, যখন ছিল না রেল ট্রাক ক্রেন্ কিংবা বুল্-ডজার, তখন কেমন করে সাতশ' মাইল দূর থেকে এই সব পাথর এখানে বয়ে আনা হলো, কেমন করেই বা চড়াই ও বনময় পাকদণ্ডী পেরিয়ে এগুলিকে চার হাজার ফুট ওপরে তোলা হলো!

জানি এ প্রশ্নের উত্তর কেউ কোনকালে দেবে না আমাকে। ইলোরায় কৈলাস মন্দির কিম্বা খাজুরাহের বিভিন্ন মন্দিরের সামনে দাঁড়িয়েও এই একই প্রশ্ন করেছি, উত্তর পাই নি। কারণ যে আমার এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে, সেই ইতিহাস যে একেবারেই মূক এবং বধির। ভারতে প্রাচীন কীর্তি আছে অসংখ্য, কিন্তু প্রাচীন ইতিহাস নেই একখানিও।

বিমলা-বসাহি মন্দির নির্মাণের কৌশল আমরা জানতে পারি নি। কিন্তু জেনেছি এর নির্মাতার নাম এবং ব্যয়ের একটা হিসেব। মন্দির নির্মাণের সময় ভক্ত-জৈন বিমলা শাহ কোন কার্পণ্য করেন নি। তিনি শ্রমিক ও শিল্পীদের উপযুক্ত পারিশ্রমিক দিয়েছিলেন। কথিত আছে,

এই মন্দিরটি নাকি এক প্রাচীন শিবমন্দিরের জায়গায় তৈরি করা হয়েছে। জায়গাটি ছিল স্থানীয় পারমার রাজার। স্বভাবতই তিনি এটি হাতছাড়া করতে রাজি হন নি। কিন্তু জায়গাটি বিমলা শাহর এতই পছন্দ হয়ে গিয়েছিল যে তিনি এই মন্দিরের জন্য প্রয়োজনীয় ভূখণ্ডকে রুপোর টাকা সাজিয়ে ঢেকে দিয়ে তাবপরে রাজাকে বলেছিলেন—মহারাজ, এই টাকাগুলো আপনার কিন্তু জমিটা আমার।

বলা বাহুল্য রাজা আর কোন আপত্তি করতে পারেন নি। আর তারই ফলে তখনকার দিনেও, মানে হাজার বছর আগেও, ওই মন্দিরটি তৈরি করতে আঠারো কোটি তেপ্পান্ন লক্ষ টাকা হয়েছিল।

সহযাত্রীরা এগিয়ে গিয়েছেন। সুতরাং ভাবনার যতি টেনে মন্দিরের দিকে নজর দিই। কৃষ্ণপাথরে বাঁধানো একটি চৌকোনা চাতালের ঠিক মাঝখানে শ্বেতপাথরের মন্দির—নাট-মন্দির ও গর্ভ-মন্দির। চাতালের চারিদিক পাঁচিল ঘেরা। তিনদিকে শ্বেতপাথরের বারান্দা। সামনের দিকে দেওয়াল নেই, সারি সারি কারুকার্য খচিত শ্বেতপাথরের স্তম্ভের ওপর ছাদটি দাঁড়িয়ে রয়েছে। বারান্দার শেষে ছোট ছোট কুঠরি। শুনেছি বাহান্নটি কুঠরি আছে এখানে। প্রত্যেকটিতে রয়েছে তীর্থঙ্করের ধ্যানমৌন মূর্তি।

কয়েক ধাপ সিঁড়ি পেরিয়ে নাট-মন্দিরে উঠে আসি। নাট-মন্দিরের তিনদিক খোলা, একদিকে গর্ভ-মন্দির। আটচল্লিশটি স্তম্ভের ওপর দাঁড়িয়ে আছে ছাদটি। সিলিং এবং স্তম্ভের সর্বত্র অনিন্দ্যসুন্দর কারুকার্য—কঠিন পাথরের বুকে কোমল মনের সৌন্দর্য-স্বপ্ন রূপায়িত।

নাট-মন্দিরের ঠিক মাঝখানে আটটি স্তম্ভ একটি অষ্টভুজের সৃষ্টি করেছে। তারই ওপরে এক অপরূপ গম্বুজ। গম্বুজের গোলাকার বেষ্টনী ও দোলকটি (পেন্‌ড্যান্ট্) দেখবার মতো—স্থাপত্যশিল্পের এক অনবদ্য নিদর্শন।

স্তম্ভগুলি নাট-মন্দিরের সিলিংকে এগারোটি বৃত্তাকার অংশে বিভক্ত করেছে। প্রত্যেক অংশ একখানি শ্বেতপাথরে তৈরি। তার ওপর অপূর্ব সুন্দর সব খোদাই কাজ। কোথাও মানুষের মূর্তি, কোথাও হাতির শোভাযাত্রা, কোথাও বা অন্যান্য পশু-পাখি।

বৃত্তের পাথরগুলি বহন করবার জন্য প্রতি স্তম্ভশীর্ষ থেকে চারিদিকে চারটি প্রলম্বিত আলম্ব (ব্র্যাকেট) প্রসারিত। সেগুলিও কারুকার্যহীন নয়। সেই নাগদণ্ডগুলির ওপরে মহাবিদ্যা মানে ভগবতীর দশ মূর্তি খোদিত। দশ মহাবিদ্যা ষোড়শী ভুবনেশ্বরী শুধু ভৈরবী ছিন্নমস্তা নন, তিনি জ্ঞানদায়িনী। অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে সমাজকে জ্ঞানের আলোয় নিয়ে আসার জন্যই তো মন্দির। তাই বিমলা শাহ জৈন মন্দিরে শাক্ত হিন্দুদের পরমারাধ্য মূর্তিসমূহ খোদাই করিয়েছেন।

নাট-মন্দির ছাড়িয়ে গর্ভ-মন্দিরের সামনে এসে দাঁড়াই। ছাদটি পিরামিডের মতো। চারিদিকে প্রায় সওয়া এক মিটার উঁচু নয়টি শ্বেতপাথরের হাতি দিয়ে ঘেরা। মন্দিরের মধ্যস্থলে একটি বেদির ওপরে প্রথম জৈন তীর্থঙ্কর আদিনাথের বিশাল বিগ্রহ। তিনি পদ্মাসনে সমাসীন। মূর্তিটি পেতলের। তবে শুনেছি তাঁর চোখ দুটিতে মণি বসানো—সত্যিই জ্বল জ্বল করছে।

আমরা তাঁকে প্রণাম করি। মনে মনে বলি—হে মানুষের ভগবান, তোমারই অকৃপণ করুণায় আজ এই অনিন্দ্যসুন্দর মন্দির দর্শনের সৌভাগ্য হলো আমার। তুমি আমার সকৃতজ্ঞ চিত্তের সশ্রদ্ধ প্রণাম গ্রহণ করো। আশীর্বাদ করো, আমরা যেন এই হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীর বুকে শাশ্বত শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারি, জগতের সকল প্রাণীকে সমানভাবে ভালোবাসতে পারি।

মন্দির ও নাট-মন্দির দর্শন করে নেমে আসি চত্বরে। কয়েক পা হেঁটে উঠে আসি বারান্দায়। শুনেছি এই বারান্দাগুলি পরবর্তীকালে নির্মিত। এরও সিলিং অপরূপ শিল্পকলায় সজ্জিত। জৈন জনশ্রুতি ও হিন্দু পুরাণের বিভিন্ন কাহিনীকে শিল্পীরা শ্বেতপাথরের বুকে রূপদান করেছেন। তাঁরা খোদাই করেছেন শত্রুঞ্জয় মাহাত্ম্যের কাহিনী, রাম লক্ষ্মণ ও সীতার বনগমন, শ্রীকৃষ্ণের কালীয় দমন এবং নৃসিংহদেবের হিরণ্যকশিপু বধ প্রভৃতি। প্রতিটি মূর্তি যেমন জীবন্ত, তেমনি নিখুঁত, মার্জিত এবং সুন্দর।

বারান্দার পাশে পাশে ছোট ছোট কুঠরি। তার প্রত্যেকটিতে তিনধাপ বেদির ওপরে জৈন তীর্থঙ্করদের মূর্তি। মূর্তিগুলোর অবয়ব ও গড়ন মোটামুটি একই রকম। তাঁদের পায়ের কাছে পৃথক প্রতীকচিহ্ন না থাকলে বোঝাই যেতো না, এগুলি ভিন্ন তীর্থঙ্করদের প্রতিমূর্তি।

তীর্থঙ্কদের দর্শন করে আমরা আসি মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিমদিকে, অম্বাজীর মূর্তির সামনে। জৈনধর্ম গ্রহণ করার আগে যে অম্বাদেবী ছিলেন বিমলা শাহর পরমারাধ্যা। তাই তিনি ধর্ম ছাড়লেও, অম্বাজীকে ছাড়তে পারেন নি।

যত দেখছি, তত বিস্মিত হচ্ছি। আর ভাবছি সেই সব বিস্মৃত শিল্পীদের কথা। তাঁদের উদ্দেশে বার বার আমার মাথা নত হয়ে আসছে—কি আশ্চর্য শিল্পবোধ ছিল তাঁদের? কি প্রচণ্ড পরিশ্রম করতে পারতেন তাঁরা? কি বিস্ময়কর সূক্ষ্মতা ও সুরুচির অধিকারী ছিলেন সেই সব পরিচয়হীন শিল্পীরা?

বিমলা-বসাহি মন্দিরের হাতিখানা দেখে আমরা লুনা-বসাহি মন্দিরে এলাম। প্রায় পাশাপাশি মন্দির। এটি আগেরটির উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত। এর আরেক নাম তেজপাল মন্দির। এটি শোলাঙ্কি স্থাপত্যকলায় নির্মিত শেষ বড় মন্দির।

গুজরাতের রাজা বীরধ্বলার দুই মন্ত্রী বাস্তুপাল এবং তেজপাল ১২৩১ খ্রীস্টাব্দে এই মন্দির নির্মাণ করেছেন। তাঁরা দু ভাই পোরওয়াধ জৈন সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। বাস্তুপালের জীবনচরিতে অবশ্য এই মন্দির নির্মাণের সমস্ত কৃতিত্ব দেওয়া হয়েছে তেজপালের স্ত্রী অনুপমাদেবীকে। প্রধানত তাঁরই ইচ্ছায় এই মন্দির নির্মিত হয়। তিনি নিয়ম করে দিয়েছিলেন যে শ্রমিক এবং শিল্পীরা দৈনিক দু'শিফ্‌টয়ে কাজ করবেন। তিনি নিজে তাঁদের খাবারের ব্যবস্থা করতেন।

শিল্পীদের উৎসাহিত করবার জন্য তেজপাল ঘোষণা করেছিলেন, খোদাই কাজ করবার সময় সে পাথরকুচি (Scrap) বের হবে, শিল্পীরা যেন সেগুলি যত্ন করে রেখে দেন। কাজ হয়ে যাবার পরে তিনি নিজে কারুকার্য দেখবেন। যে-সব শিল্পীর কাজ তাঁর পছন্দ হবে, তাঁদের ঐ পাথরকুচির সমান ওজনের রুপো দেওয়া হবে। আর কাজ পছন্দ না হলে কিছুই পাবেন না। ফলে শিল্পীরা তাঁদের মনের সমস্ত মাধুরী মিশিয়ে এই অপরূপ মন্দিরটি নির্মাণ করে গিয়েছেন।

বলা বাহুল্য শিল্পীরা তেজপালকে তুষ্ট করা পেরেছিলেন। আর তিনিও তাঁদের রুপোর পরিবর্তে সোনা দিয়ে এই বিস্ময়কর সৃষ্টির স্বীকৃতি জানিয়ে ছিলেন। তারপরে এক পুণ্যতিথিতে অনুপমাদেবীর ইচ্ছা অনুসারে বাস্তুপাল ও তেজপাল বিশ্বের বিস্ময়স্বরূপ এই মন্দিরটিকে দ্বাবিংশ তীর্থঙ্কর নেমীনাথের পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করেছিলেন।

তেজপাল মন্দিরের গঠনশৈলী মোটামুটি বিমলা-বসাহি মন্দিরের মতোই। তবে এর

শিল্পকার্য আরও সূক্ষ্ম, আরও সুন্দর। বিশেষ করে অষ্টস্তম্ভের উপরে স্থাপিত গম্বুজের দোলকটি। আমরা শুধু মুগ্ধ আবেশে চেয়ে আছি সেদিকে। অবিকল একটি অর্ধস্ফুটিত পদ্ম। পাপড়িগুলো এত স্বচ্ছ ও সূক্ষ্ম যে মনেই হয় না শ্বেতপাথরের। মনে পড়ছে ফার্গুসানের সেই উক্তি—'hangs from the centre more like a lustre of crystal drops than a solid mass of marble' সার্থক উক্তি।

গম্বুজটির বাইরের দিকে ব্র্যাকেটের ওপরে চক্রাকারে ষোলটি রমণীয় নারীমূর্তি খোদিত। বলা বাহুল্য মূর্তিগুলি বিদ্যাদেবীর। বিমলা বসাহির মতোই এরও সিলিং জুড়ে অপরূপ শিল্পকলা। আরও সুন্দর, আরও নিখুঁত, আরও জীবন্ত। এবং জনৈক বিদেশী পর্যটক বলেছেন, 'And here exuberance knows no bounds. It attains the Zenith of Indian inventive genius in the art of decoration.'

নাট-মন্দির পেরিয়ে গর্ভ-মন্দিরের দ্বারে আসি। শ্রীকৃষ্ণের সমসাময়িক জৈন তীর্থঙ্কর নেমীনাথের বিশাল মূর্তির সামনে দাঁড়াই। শান্ত সৌম্য সুন্দর মূর্তি। বেদির ওপরে বসে রয়েছেন। বেদির গায়ে নেমীনাথের প্রতীকচিহ্ন শঙ্খ খোদিত।

মহান তীর্থঙ্করের কাছে শ্রী ও মানসীর মঙ্গল কামনা করে বেরিয়ে আসি বাইরে। ঘুরে ঘুরে স্তম্ভ-সজ্জিত বারান্দা ও সংলগ্ন কক্ষগুলি দর্শন করি। স্তম্ভগুলিতে নেমীনাথের জীবনালেখ্য খোদাই করা রয়েছে। এর মধ্যে তাঁর সন্ন্যাস গ্রহণের কাহিনীটিও রয়েছে।

গির্ণার রাজার মেয়ে রাজিমতীর সঙ্গে নেমীনাথের বিয়ে ঠিক হয়েছিল। তিনি বরবেশে গির্ণার পৌঁছেও গিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর আর রাজপ্রাসাদ পর্যন্ত যাওয়া হয়ে ওঠে নি।

গির্ণারের রাজপথে এক জায়গায় কতগুলো গোরু দেখতে পেয়ে নেমীনাথ কন্যাপক্ষীয় একজনকে জিজ্ঞেস করলেন—এদের এভাবে কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে?

—আজ্ঞে, রাজবাড়িতে।

—কেন?

একটু অমায়িক হেসে ভদ্রলোক উত্তর দিলেন—আপনার বিয়ে উপলক্ষে এগুলোকে কাটা হবে, মানে এদের মাংস দিয়ে নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়িত করা হবে আর. কি।

মুহূর্তে নেমীনাথের মনে একটা প্রচণ্ড পরিবর্তন সাধিত হলো। নিজেকে অপরাধী বলে মনে হলো তাঁর। ছি, ছি!' তাঁরই জন্যে এই অবোধ ও নিরপরাধ প্রাণীগুলোকে হত্যা করা হবে? সংসারী হলে তো এমন আরও অসংখ্য পাপ প্রতিনিয়ত করতে হবে তাঁকে। তার চেয়ে যদি সংসার ত্যাগ করে মানুষকে ভালোবাসার মন্ত্রে দীক্ষিত করা যায়? যদি জীব-সেবায় জীবন উৎসর্গ করা যায়? যদি মানুষের মনের আঁধার ঘুচিয়ে জগৎকে আলোময় করে তোলা যায়?

তাই করেছিলেন নেমীনাথ। বরের বেশ ত্যাগ করে সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করেছিলেন তিনি। আর তারই ফলে তাঁর জীবদ্দশাতেই জৈনধর্ম ভারতবর্ষের সবচেয়ে জনপ্রিয় ধর্মে পরিণত হতে পেরেছিল।

লুনা বসাহির বারান্দায় উনচল্লিশটি কুঠরি রয়েছে। প্রত্যেকটিতেই অন্তত একটি করে মূর্তি আছে। আমরা দর্শন করি। সেই সঙ্গে চারিদিকে জালি কাটা শ্বেতপাথরের পরদাগুলো দেখি। পাশ্চত্য পর্যটকরা একে বলেছেন—'marble lacework.' বলেছেন—'they stand by

themselves in the history of stone-carving.'

অবশেষে আমরা লুনা-বসাহির হাতিশালায় আসি। শ্বেতপাথরের দশটি অপরূপ হাতিমূর্তি রয়েছে এখানে। আগে নাকি এদের পিঠে দুই রাণী ললিতা দেবী ও বিরুতা দেবী সহ বাস্তুপাল এবং তেজপাল ও অনুপমাদেবীর মর্মরমূর্তি ছিল। তাঁদের সে মূর্তিগুলি কবে কিভাবে নষ্ট হয়ে গেছে, কেউ বলতে পারলেন না। পারবেন কেমন করে, অজন্তা ও ইলোরার মতো এ মন্দিরও যে বহুকাল লোকচক্ষুর অন্তরালে অনাদৃত অবস্থায় পড়েছিল।

দিলওয়ারা দর্শন করে বাসে চড়ে মাউন্ট-আবু বাসস্ট্যান্ডে এলাম। লাইনের বাসে এলে আমাদের এখান থেকেই হেঁটে দিলওয়ারা যেতে হতো। প্রাইভেট বাস বলে যাতায়াতে ৪ কিলোমিটার পথ না হেঁটে পারা গেল।

কিন্তু এবারে হাঁটতে হবে। কারণ এর পরে আর বাস যেতে দেওয়া হয় না। এখন আমরা নখি লেকে চলেছি।

নখি লেক মাউন্ট-আবুর প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের কেন্দ্রবিন্দু। এটি একটি কৃত্রিম হ্রদ। কিন্তু কথিত আছে—দেবতারা তাঁদের হাতের নখ দিয়ে হ্রদটি খনন করেছেন বলে এর নাম নখি লেক।

বাসস্ট্যান্ডটি মাউন্ট-আবু শহরের সবচেয়ে ঘনবসতি অঞ্চল। চারিদিকেই বাড়ি-ঘর। বড় বড় এবং বেশ উঁচু উঁচু বাড়ি। তাঁদেরই মাঝখান দিয়ে চড়াই পথ। মসৃণ এবং প্রশস্ত পথ বেয়ে সারি বেঁধে এগিয়ে চলেছি আমরা।

মধ্যবিত্ত পর্যটকদের জন্য অধিকাংশ হোটেল এখানে। নিরামিষ হোটেলের সংখ্যাই বেশি। তবে কয়েকটি পাঞ্জাবি আমিষ রেস্তোরাঁও আছে। আর আছে পরিবহণ সংস্থার রিটায়ারিং রুম। চারটি স্যুইট ও একটি সুসজ্জিত রেস্তোরাঁ নিয়ে বড় রাস্তার ধারে চমৎকার বিশ্রাম-ভবন। যেমন সুন্দর অবস্থান, তেমনি চমৎকার ব্যবস্থা। ভাড়াও বেশি নয়। তবে ডিপো ম্যানেজারকে আগে চিঠি লিখে ঘরের ব্যবস্থা করে নিতে হয়। এখানে বন-বিভাগের একটি বিশ্রাম ভবনও আছে। সেখানেও ভাড়া বেশি নয়। তবে সেটি এখান থেকে মাইল দেড়েক দূরে অবস্থিত 'সান-সেট পয়েন্ট'-এ যাবার পথে পড়বে। এবং ডি. এফ. ও-কে আগে চিঠি লিখে 'রিজার্ভেশন' করাতে হয়।

অনেকটা চড়াই ভেঙে সমতল পেলাম। পথের পাশে দোকান-পাট ও হোটেল। কয়েকটি আধুনিক বড় হোটেলও আছে এখানে। তার মধ্যে মাউন্ট হোটেল ও হোটেল যোধপুর বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পর্যটকদের জন্য এখানে বিভিন্ন দপ্তরের ডাক-বংলো এবং বিশ্রাম-ভবন রয়েছে।

মাউন্ট-হোটেলের সামনেই বিউটি ওদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দেয়—সদ্য বিবাহিত এক বাঙালি দম্পতি। ছেলেটি ডাক্তার, বরোদায় থাকে। বিয়ের পরে "হনি মুন" করতে এসেছে। মাউন্ট-হোটেলে উঠেছে।

ম্যানেজার নেমন্তন্ন করে, "চলুন না আমাদের সঙ্গে, নখি লেখে। এক কাপ চা খেয়ে আসবেন।"

ডাক্তার যেন একটু দ্বিধা করছিল কিন্তু তার তরুণী স্ত্রী বলে বসল, "এতে আপত্তি করার কি আছে? আমরা তো বেড়াতেই বেরিয়েছিলাম।" সে আমাদের সঙ্গে পথ-চলা শুরু করে।

বিউটিকে বলে, "বড়ই ভাল হলো আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে। বেশ কিছুক্ষণ বাংলা বলা

যাবে!"

"সত্যি ভাই! হিন্দী বলে বলে হাঁপিয়ে উঠেছি। দু-মাস হতে চলল বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পরে সেই যে বরোদায় এসেছি আর কলকাতা যাওয়া হয় নি। পুজোর আগে আর হবেও না।..."

আর ডাক্তার ম্যানেজারকে বলছে, "আমি আপনাদের অফিসে গিয়েছি। বছর চারেক আগে আমার বাবা-মা আপনাদের সঙ্গে কেদার-বদ্রী বেড়াতে গিয়েছিলেন।..."

আমি কিন্তু ভেবে চলেছি অন্য কথা---আর কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার রাজভূমি-রাজস্থান দর্শন শেষ হয়ে যাবে। কিন্তু আমি তো শুধু রাজস্থানের সবচেয়ে সুন্দর এবং সমৃদ্ধ অঞ্চলটুকুই দর্শন করলাম। যেতে পারলাম না যোধপুর, বিকানীর, রণথম্বর, কোটা, বুন্দি, আলোয়ার, ভরতপুর, ঢোলপুর, শিকার ও জয়শলমীর। তাছাড়া এই মাউন্ট-আবুরও তো অনেক জায়গা অদেখা রয়ে গেল। যাওয়া হলো না অচলগড়, দেখা হলো না গুরুশিখর, দর্শন করতে পারলাম না অর্বুদাদেবীর মন্দির। সুতরাং আগামীকাল সকালে এবারের মতো রাজভূমি রাজস্থানের কাছ থেকে বিদায় নিলেও আবার আমি ফিরে আসব তার বুকে। ভবিষ্যতের সেই মধুর মিলনের কথা ভেবেই আজ আমাকে বিরহবেদনা বিস্মৃত হতে হবে।

বড় রাস্তা থেকে খানিকটা নেমে এসে হ্রদের তীরে পৌঁছলাম। অনেকটা ইংরেজি 'U' আকারের একটি হ্রদ। হ্রদের তিন দিকেই ঘন সবুজ পাহাড়, একদিকে সবুজ সমতল। সবুজ অবশ্য শুধু নখি লেকের তীরেই নয়, মাউন্ট আবুর সর্বত্রই সবুজের সমারোহ। এখানে যে প্রচুর বৃষ্টি হয়। মাউন্ট-আবুর মতো এত শাক-শব্জী রাজস্থানের আর কোথাও জন্মায় না।

কর্ণেল টডের সময় মানে শ' দেড়েক বছর আগে এই হ্রদ ৩৬৫ মিটারের মতো লম্বা ছিল আর এখন এর দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছে ৮০০ মিটার। হ্রদটি বর্তমানে প্রায় পৌনে চারশ মিটার চওড়া। ফার্গুসান নাকি এর চেয়ে রমণীয় স্থান ভারতে আর কোথাও দেখেন নি।

হয়তো তিনি একটু বেশি বলে ফেলেছেন, তাহলেও সত্যি দেখবার মতো। অধিকাংশ তীরভূমি জুড়েই সুন্দর সুন্দর বাড়ি-ঘর। একদিকে বড় বড় গাছে ছাওয়া চমৎকার একটি পার্ক। আমরা সেখানেই এসেছি। গাছের ছায়ায় গোল হয়ে বসেছি। বসে বসে হ্রদ আর তার বুকে নৌকা-বিলাস দেখছি।

কয়েকখানি নৌকা ক্রমাগত হ্রদের বুকে ঘুরপাক খাচ্ছে। এক পাক ঘুরতে জনপ্রতি ৫০ পয়সা লাগে। আর ১৫ টাকায় একখানি নৌকা একঘণ্টার জন্য ভাড়া পাওয়া যায়।

আমার সহযাত্রীরা নৌকা-বিলাসের বিলাসিতায় গা ভাসিয়ে দিতে প্রস্তুত নন। সুতরাং আমাকেও সে আশা পরিত্যাগ করতে হয়।

হ্রদের বুকে শুধু নৌকো নয়, কয়েকটি পাথুরে দ্বীপ দেখতে পাচ্ছি। সেখানে গাছপালাও রয়েছে। শুনেছি পুবদিকে অর্থাৎ বাজারের কাছে হ্রদের গভীরতা খুবই সামান্য কিন্তু পশ্চিমদিকে বাঁধের ধারে হ্রদ প্রায় ৭/৮ মিটার গভীর।

পাঁচু লাড্ডু ও নিমকি পরিবেশন করছে। বরোদার ডাক্তার দম্পতিও বাদ গেলেন না। অহীন স্টোভ জ্বালিয়েছে, একটু বাদেই চা পাওয়া যাবে।

হঠাৎ বৌদি ইসারায় ওদের দেখিয়ে দেন আমাকে। আরে তাই তো, দাদা যে তাঁর নাতনীকে নিয়ে নীরবে সরে পড়েছেন। হ্রদের তীরে একখানি পাথরের ওপর বসে দুজনে নীরবে হ্রদের দিকে চেয়ে রয়েছেন।

বৌদি বলেন, "ঘোষদা প্লিজ, চুপি চুপি গিয়ে ওদের একখানি ছবি তুলে নিয়ে আসুন।"

প্রস্তাবটা মন্দ নয়। ক্যামেরা নিয়ে উঠে দাঁড়াই।

চায়ে শেষ চুমুক দেবার আগেই ম্যানেজার ওপর দিকে ইসারা করে আমাদের 'Toad Rock' দেখায়। দেখবার মতোই বটে। প্রকৃতির কি বিচিত্র সৃষ্টি! মনে হচ্ছে প্রকাণ্ড একটা কোলা ব্যাঙ পাহাড়ের ওপর বসে আছে, এখুনি একলাফে নখি তালাওয়ের জলে পড়বে।

উকিলবাবু তাড়াতাড়ি চায়ের কাপ পাশে রেখে থেকে গাইড-বুক বের করলেন। একবার বই দেখে নিয়ে প্রশ্ন করলেন, "Nun Rock কোথায় ম্যানেজারবাবু?"

"একটু দূরে, এখান থেকে ঠিক দেখা যাচ্ছে না।"

উকিলবাবু বইখানা থলিতে রেখে আবার চায়ের কাপ হাতে তুলে নিলেন।

সামন্তবাবুর ছোটছেলে বিউটিকে জিজ্ঞেস করে, "নান্ কি গো দিদি!"

"সন্ন্যাসিনী। খ্রীস্টান সন্ন্যাসিনীদের নান্ বলে।" বিউটি উত্তর দেয়। কিন্তু তারপরেই সে পাঁচুকে প্রশ্ন করে বসে, "নান্-রক্ কি?"

"এই টোড-রক্'-এর মতোই একখানি প্রকাণ্ড পাথর। দূর থেকে দেখলে মনে হয় যেন ঘোমটা মাথায় দিয়ে একজন 'নান্' দাঁড়িয়ে রয়েছেন।"

হ্রদের পশ্চিম তীরে, পথ থেকে অনেকটা উঁচুতে রঘুনাথজীর মন্দির। সহযাত্রীদের সঙ্গে সিঁড়ি বেয়ে উঠে এলাম সেখানে। ভারি শান্ত সুন্দর ও স্নিগ্ধ পরিবেশ। বেশ ভাল লাগছে।

খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতকে ধর্মগুরু স্বামী রামানন্দ এই মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। মন্দিরের আঙ্গিনায় শ্রীরামানন্দের চরণচিহ্ন খোদিত রয়েছে। আমরা প্রণাম করি।

মন্দিরটিও সুন্দর। শ্বেতপাথরে তৈরি—কারুকার্যময়। গর্ভ-মন্দিরের দরজা রুপোর পাতে মোড়া, সামনে রুপোর রেলিং। ভেতরে রুপোর দানপাত্র ও ঘণ্টা। রুপোর সিংহাসনে কষ্টিপাথরের অপরূপ রঘুনাথ। তাঁর মাথায় রুপোর মুকুট, গায়ে সোনা ও রুপোর অলংকার।

রঘুপতি-রাঘব রাজা-রামকে প্রণাম করে ফিরে আসি নখি লেকে। সহযাত্রীদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এগিয়ে চলি ন্যাশনাল পুলিশ আকাদেমীর দিকে—সেখানকার অ্যাসিস্ট্যান্ট্ ডিরেক্টর শ্রীঅরুণপ্রকাশ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করতে। নিখিলেশ (অনুজপ্রতিম নিখিলেশ দাস, আই. এ. এস) বার বার বলে দিয়েছে, আমি যেন মাউন্ট-আবু এলে অবশ্যই একবার শ্রীমুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা করি। সে তাঁকে চিঠি লিখে দিয়েছে।

সহযাত্রীরা এখান থেকে 'Sun set Point'-এ যাবেন। সূর্যাস্তের দেরি আছে। ইতিমধ্যে আমি শ্রীমুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখাটা সেরে নেবো।

পাছে আমার লেখক পরিচয় প্রকাশিত হয়ে যায়, তাই ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও সহযাত্রীদের কাউকে সঙ্গে নিতে পারি নি। অচেনা পথে একাই পদচারণা করতে হচ্ছে।

মন্দ লাগছে না কিন্তু। আগ্রাফোর্ট থেকে গাড়ি ছাড়ার পরে কখনও এমন একা পথে বের হই নি। পথটিও সুন্দর—ছায়াঢাকা ঝক্‌ঝকে পাহাড়ী পথ। পথচারী প্রায় নেই বললেই চলে। আমি দুচোখ ভরে মাউন্ট-আবুকে দেখছি আর পথ চলছি। মনে মনে মাউন্ট-আবুর কথাই ভাবছি—

মাউন্ট-আবু রাজস্থানের সিরোহি জেলার একটি মহকুমা-সদর। ২৪°৩১´ ও ২৪°৪৩´ উত্তর অক্ষরেখা এবং ৭২°৩৮´ ও ৭২°৫৩´ পূর্ব দ্রাঘিমার মধ্যে অবস্থিত এই পাহাড়টি। আবু-পাহাড়ের

দৈর্ঘ্য প্রায় ১৯ কিলোমিটার এবং প্রস্থ ৫ থেকে ৮ কিলোমিটার। পাহাড়টি গাছ-পালা লতা-পাতা ও ফুল-ফলে পরিপূর্ণ। আবু পাহাড়কে নাকি সবচেয়ে সুন্দর করে সাজায় শরৎকাল।

শৈল-শহর মাউন্ট-আবু সমুদ্র সমতা থেকে ১২১৯ মিটার (৪০০০ ফুট) উঁচু। একটি বিচিত্র মালভূমির ওপরে গড়ে উঠেছে শহরটি। শহরের চারি দিকেই পাহাড়ের চূড়া। তাদের মধ্যে সবচেয়ে উঁচু হলো গুরু-শিখর, উচ্চতা ১৭২২ মিটার (৫৬৫০ ফুট)। এটি হিমালয় এবং নীলগিরির মাঝখানে উচ্চতম শিখর। অন্যান্য উল্লেখযোগ্য চূড়াগুলি হলো—অচলগড় (১৩৮০ মিটার বা ৪৫২৮ ফুট), দিলওয়ারা (১৪৪২ মিটার বা ৪৭৩১ ফুট) এবং ঋষিকেশ (১০১৭ মিটার ৩৩৩৮ ফুট)।

১৯৭১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এই শহরের আয়তন ২১.৪১ বর্গকিলোমিটার। ১৮৪৭টি বাড়িতে ১৮৯০ টি পরিবার এখানে স্থায়ীভাবে বাস করেন। স্থায়ী জনসংখ্যা ৯৮৪০ জন। তাঁদের মধ্যে ৫৪৯০ জন পুরুষ ৪৩৫০ জন নারী।

কিছুকাল আগে ভারত সরকার এখানে ন্যাশনাল পুলিশ আকাদেমী প্রতিষ্ঠা করেছেন। শ্রীঅরুণপ্রকাশ মুখোপাধ্যায় সেখানকারই অ্যাসিস্ট্যান্ট ডাইরেক্টর। আমি তাঁরই বাংলোয় চলেছি।

নিজের রাজ্যে উপযুক্ত পাহাড় নেই বলে গুজরাট সরকার এখানেই তাঁদের মাউন্টেনিয়ারিং ইনস্টিটিউটটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। ভেবেছিলাম একবার গিয়ে দেখে আসব সেই পর্বতারোহণ শিক্ষাকেন্দ্র। কিন্তু সময়াভাবে এ যাত্রায় আর যাওয়া হলো না সেখানে।

ডাকবাংলোর সামনেই দেখা হলো শ্রীমুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। তিনি এবং তাঁর কিশোর পুত্র ফুল-বাগানের পরিচর্যা করছিলেন। নিখিলেশ তাঁকে চিঠি লিখে দিয়েছিল। সুতরাং ধুতি-পাঞ্জাবি পরা দেখেই তিনি আমাকে চিনতে পারলেন, পরিচয় দেবার দরকার হলো না।

পরিচয় হলো তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে। মাত্র আধঘণ্টা থাকব শুনে উভয়েই অসন্তুষ্ট হলেন। তাঁরা জানতেন না আমি কুণ্ডু স্পেশালের সঙ্গে ভ্রমণে বেরিয়েছি। ভেবেছিলেন আমি বেশ কয়েকদিন মাউন্ট-আবুতে থাকব এবং তাঁদের আতিথ্য গ্রহণ করব। তাঁদের অমায়িক ও আন্তরিক ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম। পিতার নির্দেশে পুত্র আলমারি থেকে 'বিগলিত-করুণা জাহ্নবী-যমুনা' বইখানি এনে আমাকে দেখালো।

কথায় কথায় শ্রীমুখোপাধ্যায় বললেন, "এখানে যেমন অ্যাসোসিয়েশনের অভাব, তেমনি অভাব বইয়ের। একেবারেই পড়াশুনা করতে পারি না। নইলে এমনি বেশ ভালই আছি।"

আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানালেন, "না, না, গুজরাতের আন্দোলনে রেলস্টেশনে হাঙ্গামা প্রায় হয় নি বললেই চলে। আন্দোলন মোটামুটি বড় বড় শহরগুলিতেই সীমাবদ্ধ। আপনারা নিশ্চিন্তে তীর্থদর্শন করতে গুজরাত যেতে পারেন।"

সত্যই নিশ্চিন্ত হলাম। এবং এই পরামর্শটি নেবার জন্যেই বিশেষ করে আমি আজ তাঁর কাছে এসেছি। আরও একটি পরামর্শ তিনি আমাকে দিলেন। শ্রীর অসুখের প্রসঙ্গে বললেন, "ডাঃ ভাদুড়ী খুবই ভাল ডাক্তার। তাঁকে দিয়েই চিকিৎসা করান, মেয়েটি ভাল হয়ে যাবে।"

শ্রীমতী মুখোপাধ্যায়ের হাতে তৈরি মিষ্টি ও কফি খেয়ে বেরিয়ে এলাম বাংলো থেকে। আসার সময় মিসেসকে কথা দিতে হলো—মানসীকে নিয়ে আমি অদূর ভবিষ্যতে আসব মাউন্ট-আবুতে। বলা বাহুল্য সেবারে আমাদের তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করতে হবে।

শ্রীমুখোপাধ্যায় আমাকে এগিয়ে দিলেন বড় রাস্তা পর্যন্ত। বিদায় নেবার সময় মৃদু হেসে

বললেন, "তাড়াহুড়া করে চলে যাচ্ছেন বটে, কিন্তু আজ বোধ হয় সূর্যাস্ত দেখতে পাবেন না।"

সবিস্ময়ে প্রশ্ন করি, "কেন বলুন তো?"

"দেখছেন না কি রকম মেঘলা। আকাশে মেঘ থাকলে সূর্যাস্ত দেখা যায় না।"

শ্রীমুখোপাধ্যায়ের ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হয়েছে। সত্যই সূর্যাস্ত দেখা গেল না। তবে দেখতে পেলাম দর্শনার্থীদের। অধিকাংশই আধুনিক পোশাক-পরিচ্ছদে সুসজ্জিত গুজরাতী তরুণ-তরুণী। তাঁদের প্রায় সবারই কাঁধে ক্যামেরা কিংবা বাইনোকুলার। বলা বাহুল্য কেউ কোনটি সদ্ব্যবহারের সুযোগ পেলেন না।

সূর্যাস্ত দেখতে না পেলেও দেখতে পেলাম সূর্যাস্ত দর্শনস্থল। জায়গাটি সত্যই দেখবার মতো। পাহাড়টি এখানে এসে সহসা শেষ হয়ে গিয়েছে। তারই ওপরে ধাপে ধাপে দর্শক-গ্যালারী। তারপরে চারহাজার ফুট নিচে সীমাহীন সমতল। রুক্ষ ও ধূসর প্রান্তর। বহুদূরে একটি আঁকাবাঁকা রূপোলী রেখা—কোন নাম-না জানা নদী। উষর প্রাণহীন প্রান্তরে জীবনের স্পন্দন। পণ্ডিতদের ধারণা ঐ শুষ্ক সমতল এককালে সীমাহীন সমুদ্র ছিল। আর এখন প্রতি সন্ধ্যায় অস্তগামী দিবাকর একটা বিরাট বড় জ্বলন্ত গোলকের রূপ নিয়ে সমতলের বুকে হারিয়ে যায়।

দুর্ভাগ্য আমাদের আজ মেঘের চাদরে মুখ ঢেকে প্রভাকর অস্তমিত হলো। আমরা আশাহত হৃদয়ে বাসস্ট্যান্ডের পথে রওনা হলাম।

রাত ন'টা নাগাদ আবু রোডে ফিরে এলাম। বাস থেকে নামতেই সাহাবাবু বললেন, "চলুন, একেবারে বাজার ঘুরে গাড়িতে ফিরব।"

"কেন বলুন তো?"

"যাবার সময় পূর্ণিমা বলে দিয়েছিল, শ্রীর দুধ গরম করার জন্য একটা 'স্টোভ ও 'সস্‌প্যান' কিনে নিয়ে যেতে। তাছাড়া শ্রীর জন্য কিছু ফলও কেনা দরকার, কাল সারাদিন মেয়েটাকে গাড়িতে থাকতে হবে।"

"বেশ, চলুন।" আমরা বাজারের দিকে চলা শুরু করি। স্টেশনের বাইরেই বাজার, বেশ বড় বাজার।

বাজার থেকে সোজা গাড়িতে আসি। না, শ্রী গাড়িতে নেই তো! ওরা কি এখনও ওয়েটিং-রুমে।

"হ্যাঁ।" ম্যানেজার বলে। "আমি আসার পথে দেখা করে এসেছি। আবার একটু বাদেই যাচ্ছি।"

"রক্ত পরীক্ষার রিপোর্ট পাওয়া গেছে?" সাহাবাবু জিজ্ঞেস করেন।

"হ্যাঁ।" সতেনদা উত্তর দেন।

"কোন খারাপ কিছু নয় তো?" আমি প্রশ্ন করি।

'না। ডাক্তার ভাদুড়ী বলেছেন, চিন্তার কিছু নেই। তবে ওকে কয়েকদিন সম্পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হবে।" সরকারদা বলেন।

হাঁফ ছেড়ে বাঁচি।

কিছুক্ষণ বাদে ম্যানেজার ও সাহাবাবুর সঙ্গে স্টেশনে আসি। ওয়েটিং-রুমে ঢুকে দেখি বিমলবাবু মাসিমা সেজদি শঙ্করী বৌদি বিউটি উমাদি ও দাদা বসে রয়েছেন। দাদা বলে

উঠলেন, "এই যে এসে গিয়েছে।"

মনে হচ্ছে তাঁরা আমাদেরই প্রতীক্ষায় ছিলেন।

শ্রীর সামনে এগিয়ে ওর কপালের উত্তাপ পরীক্ষা করি। এখনও বেশ জ্বর। শ্রী চোখ মেলে একবার আমাকে দেখে, তারপরে আবার চোখ বোজে।

পূর্ণিমাকে জিজ্ঞেস করি, "ব্লাড রিপোর্ট দেখে ডাক্তারবাবু কি বললেন?"

"বললেন, ভয়ের কিছু নেই তবে ওকে কয়েকদিন "complete Bed-rest" দিতে হবে। মানে রেলে চড়াও উচিত হবে না।"

"কিন্তু কাল সকালেই যে আমাদের গাড়ি ছাড়ছে এখান থেকে।"

'আমি কাল আপনাদের সঙ্গে যাবো না ঘোষদা!"

"যাবে না!"

"না।"

"কোথায় থাকবে?"

"বিমলদা ও সরোজদা রিটায়ারিং-রুমের ব্যবস্থা করে দেবেন।"

বিমলবাবু মাথা নাড়েন। বলেন "ঘর খালি আছে, কাল সকালেই ঠিক করে দেব।"

"কিন্তু তুই একটা অসুস্থ মেয়েকে নিয়ে একা একা কেমন করে থাকবি এখানে?" সাহাবাবু জিজ্ঞেস করেন।

পূর্ণিমা কোন উত্তর দিতে পারার আগেই শঙ্করী বলে ওঠে, "আমি ন'দির সঙ্গে এখানে থেকে যাবো জামাইবাবু! আপনারা মাকে নিয়ে যান।"

"তার চেয়ে আমি বলছিলাম" মাসিমা প্রতিবাদ করেন, "তুই বেড়াতে এত ভালোবাসিস, তুই যা ওদের সঙ্গে। আমি এখানে থাকছি।"

"তাই হয় না মা! কত আশা করে তুমি এসেছো, রণছোড়জীকে দর্শন করবে। তুমি যাও, আমি থাকছি।" শঙ্করী মাসিমার প্রস্তাব নাকচ করে দেয়।

পূর্ণিমা কোন প্রস্তাবই মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। সে বলে, "এখানে কারও থাকার দরকার নেই মা! বিমলদা ও সরোজদা রয়েছেন। স্টেশন-মাস্টার অত্যন্ত ভাল লোক, তিনি আমাকে সর্বপ্রকার সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ম্যানেজারবাবু একজন লোক রেখে গেলে, আমি একাই এখানে থাকতে পারব।"

বিমলবাবুও পূর্ণিমাকে সমর্থন করেন। বলেন, "এখানে তো আমরাই রয়েছি। আপনাদের কারও থাকার দরকার নেই।"

কিন্তু আমরা তাকে সমর্থন করতে পারি না। আমরা চুপ করে থাকি।

পূর্ণিমা আবার বলে, "মেয়ে ভাল হয়ে গেলে আমি আমেদাবাদের আপনাদের সঙ্গে যোগ দেব। আর ঠাকুর বিরূপ হলে, এখান থেকেই কলকাতায় ফিরব।"

এবারে আমি কথা বলি, "তুমি কি এখানে সত্যই থেকে যেতে চাইছো?"

"হ্যাঁ, ঘোষদা! ডাক্তারবাবু বার বার বলে গিয়েছেন আমার মেয়ের যা শরীরের অবস্থা, তাতে ওর পক্ষে এখন কয়েকদিন 'ট্রেন-জার্নি' করা একেবারেই উচিত হবে না।"

"তাহলে এক কাজ করুন ম্যানেজারবাবু," আমি বলি, "আমার মালপত্রগুলো কাউকে দিয়ে এখানে নিয়ে আসার ব্যবস্থা করুন। আমি থাকব এখানে। শঙ্করী, মাসিমাকে নিয়ে তুমি নিশ্চিন্তে

গাড়িতে ফিরে যাও।"

"তা হয় না ঘোষদা।" ওরা প্রায় সকলেই একসঙ্গে বলে ওঠে।

"কেন হয় না?" আমি বলি, "আমারই জন্য যে আজ শ্রী অমন অসুস্থ হয়ে পড়েছে।"

"এ আপনার ভুল ঘোষদা!" শঙ্করী বলে, "নিশ্চয়ই আমরা কোন পাপ করেছি, তাই রণছোড়জীর ইচ্ছে নয়, এ-যাত্রায় আমরা তাঁকে দর্শন করি।"

"পাপ-পুণ্যের কথা থাক্ শঙ্করী। তুমি তো জানো, সেদিন আগ্রাফোর্টে আর গতকাল এখানে বসেও শ্রীকে কথা দিয়েছি, এ-যাত্রায় আমি আর কখনো ওকে ছেড়ে কোথাও যাবো না।" শ্রীর দিকে তাকাই, সে চোখ মেলে চেয়ে আছে আমার দিকে।

ছোট একখানি হাত দিয়ে শ্রী ইসারা করে আমাকে। তাড়াতাড়ি করে পাশে আসি।

ক্ষীণকণ্ঠে শ্রী ডাক দেয়, "মামু!"

"কি বলছ মা?" আমি তার মুখের সামনে ঝুঁকে পড়ি।

সে বলে, "মামু তুমি দিদিমাকে নিয়ে রণছোড়জীকে দেখে এসো। আমি তো যেতে পারছি না তাঁর কাছে। তুমি না গেলে, কে ফিরে এসে আমাকে তাঁর গল্প বলবে? আমেদাবাদে আবার দেখা হবে তোমার সঙ্গে।"

তাই হোক্, হে নিষ্ঠুর দ্বারকাধীশ! তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক্।

পূর্ণিমাদের তত্ত্বাবধানের জন্য ম্যানেজার অহীনকে এখানে রেখে যাওয়া সাব্যস্ত করলে। শঙ্করী জিনিসপত্র নেবার জন্য আমাদের সঙ্গে গাড়িতে এলো। আসার সময় বিমলবাবু বার বার আশ্বাস দিলেন, "আপনারা নিশ্চিন্তে চলে যান দাদা! এখানে ওনাদের কোন অসুবিধে হবে না। আপনাদের কথা দিচ্ছি, মেয়েকে সুস্থ করে মা ও মাসির সঙ্গে নির্দিষ্ট দিনে আমেদাবাদে পাঠিয়ে দেব।"

এ আশ্বাসকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই। তবু মনের দ্বিধা ঘোচে না। পূর্ণিমা ও শঙ্করী দুজনেই যুবতী। এর আগে কখনও এখানে আসে নি। তার ওপরে ওদের সঙ্গে কিছু টাকা পয়সা থাকবে।

শঙ্করীকে মালপত্র সহ ওয়েটিং-রুমে পৌছে দিয়ে মাসিমাকে নিয়ে আমি ও সাহাবাবু যখন গাড়িতে ফিরে এলাম, তখন ইংরেজি ক্যালেন্ডারে পরের দিন শুরু হয়ে গেছে। শান্ত সহযাত্রীরা সকলেই নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছেন।

ভোর সাড়ে পাঁচটায় মেহাসোনা প্যাসেঞ্জার আমাদের নিতে আসবে। তার আগে ওয়েটিং-রুমে গিয়ে আরেকবার মেয়েটাকে দেখে আসা দরকার। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়ি।

কিন্তু দু-চোখের পাতা এক করতে পারি না। কেবল ওদের কথাই ভেবে চলি—শ্রী, পূর্ণিমা ও শঙ্করীর কথা। কত আশা করে ওরা রওনা হয়েছিল কলকাতা থেকে। কত অসংখ্য বার ওরা কামনা করেছে—দ্বারকা যাবে, রণছোড়জীকে দর্শন করবে। দর্শন করবে বেট-দ্বারকা, প্রভাস আর সোমনাথের মন্দির। সে কামনা ওদের অপূর্ণই রয়ে গেল।

আর আমরা? দুটি অসহায়া যুবতী ও একটি অসুস্থ শিশুকে অজানা জায়গায় অপরিচিতদের মাঝে ফেলে রেখে, স্বার্থপরের মতো তীর্থদর্শনে চলেছি। এতে আমাদের কোন পুণ্য সঞ্চয় হবে কি? রণছোড়জী কি এই স্বার্থপরতার পরেও আমাদের কৃপা করতে পারবেন?

"জ্যোতি! বাবা উঠবে একবার? আমাকে একটু ওদের কাছে দিয়ে আসবে?"

মাসিমার করুণ আহ্বানে আমার ঘুম ভেঙে যায়। চোখ মেলি। নাইট ল্যাম্পের আলোয় দেখি মাসিমা আমার মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন।

তাড়াতাড়ি উঠে বসি।

তেমনি সকরুণ স্বরে মাসিমা আবার বলেন, "আমাকে একবারটি ওদের কাছে নিয়ে যাবে বাবা?"

বালিশের তলা থেকে ঘড়িটা বের করি। সবিস্ময়ে বলে উঠি, 'মোটে যে তিনটে বাজে!"

"তাই নাকি!" বোধ হয় একটু লজ্জা পান তিনি। তাড়াতাড়ি বলেন, "আমি ভেবেছিলাম ভোর হয়ে এসেছে। তাহলে বরং এখন থাক, তুমি শুয়ে পড়ো বাবা!"

মায়ের মনের আকুলতা আমাকে অভিভূত করে তোলে। পূর্ণিমা একটি মেয়ের জন্যে তার তীর্থযাত্রার যতি টেনেছে, আর তীর্থযাত্রার জন্য মাসিমাকে তাঁর দুটি মেয়েকে এখানে ফেলে যেতে হচ্ছে।

টর্চটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াই। বলি "বাজুক গে তিনটে। আর কতক্ষণই বা আমরা এখানে আছি? চলুন, সে সময়টুকু ওদের সঙ্গেই কাটানো যাক্।"

"তাই চলো বাবা!"

একটু কড়া নেড়ে একবার ডাক দিতেই শঙ্করী সাড়া দেয়, "খুলছি ঘোষদা!"

মনে হচ্ছে সে জেগেই ছিল। ওরাও বোধ হয় ঘুমোয় নি সারারাত। অহীন দরজা খুলে দেয়। আমরা ভেতরে আসি।

কাছে এসে শ্রীকে একবার দেখি। সে নিশ্চিন্তে ঘুমোচ্ছে। ঘুমোক্ শ্রী। কাল রাতের অন্ধকারে বলেছে—তুমি রণছোড়জীকে দেখে এসো। আজ দিনের আলোয় হয়তো বলে বসবে—মামু! আমিও তোমার সঙ্গে যাবো, রণছোড়জীকে দেখব।

তার চেয়ে সে ঘুমিয়ে থাকুক্। হে ঠাকুর, তার ঘুম ভাঙার আগেই আমি যেন আবু-রোড থেকে পালিয়ে যেতে পারি।

করুণাময় কৃষ্ণ আমার এ কামনাটি পূর্ণ করলেন। গার্ডসাহেবকে সবুজ নিশান ওড়াতে দেখে আমরা যখন ছুটে এসে গাড়িতে উঠলাম, তখন ছ'টা বেজে গিয়েছে, চারিদিকে ভোরের আলো পড়েছে ছড়িয়ে কিন্তু শ্রীর ঘুম ভাঙে নি।

মেহাসানা প্যাসেঞ্জার চলতে শুরু করেছে। আমি বিদায় নিচ্ছি রাজভূমি-রাজস্থানের কাছ থেকে—শ্রী, পূর্ণিমা ও শঙ্করীর কাছ থেকে।

পূর্ণিমা প্লাটফর্মে বেরুতে পারে নি। মা সন্তানের শিয়রে ধ্রুবতারার মতো জেগে রয়েছে।

অহীন আর শঙ্করী শুধু দাঁড়িয়ে আছে প্লাটফর্মে।

শঙ্করী হাতে নাড়ছে, আমি হাত নাড়ছি!

আমাদের ব্যবধান বাড়ছে।

শঙ্করী আবছা হয়ে আসছে।

আবু-রোড মিলিয়ে এলো, শঙ্করী হারিয়ে গেল।

হারিয়ে গেল অহীন, পূর্ণিমা এবং শ্রী। সরল শিশু জানতেই পারল না যে তার মামু তাকে ঘুম পাড়িয়ে রেখে স্বার্থপরের মতো পালিয়ে গেল রাজভূমি রাজস্থান থেকে।